দর্শনের ভূমিকা

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী

এ.মু

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

দর্শনের ভূমিকা

(Western Metaphysics in Bengali)

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী, এম. এ., ডি. ফিল.,
দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ,
এবং
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

প্রকাশক
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

সরকারী কাগজে মুদ্রিত

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮২
প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ১৩৬৫

মূল্য টা. ১২·৫০ (বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা) **মাত্র**

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
স্বর্গতা অমিয়বালা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো 'দর্শনের ভূমিকা' বিরাট দর্শনশাস্ত্রের সামান্য ভূমিকা মাত্র। দর্শনের মূল সমস্যাগুলোকে সহজ ও সরল মাতৃভাষায় প্রকাশ করার প্রচেষ্টা থেকেই এর জন্ম। এই ভূমিকা লেখবার সময় সাধারণ পাঠক ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাতৃভাষার কদর বেড়েছে। বিভিন্ন বিষয় মাতৃভাষায় লেখবার জন্য উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ লোক 'দর্শন' বুঝতে চায়। কিন্তু, উপযোগী বই নেই বলে তাদের আশা মিটছে না। এদের মুখ চেয়েই বই লিখতে বসেছি। এই বই লেখার আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। শিক্ষকতা করতে গিয়ে দেখেছি, ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই দার্শনিক-সমস্যা ও তার বিভিন্ন সমাধানের জটিল অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। তাদের পথ-নির্দেশ দেবার চেষ্টাও এই গ্রন্থের লক্ষ্য। এই দুই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি 'দর্শনের ভূমিকা' কোন অংশে সফল হয়ে থাকে তবে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হ'ল বলে মনে করব।

আর একটা কথাও বলে নিচ্ছি। এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ পশ্চিমী দর্শনই আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের দর্শন অন্য গ্রন্থে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

মাতৃভাষায় দর্শনের কোন বই লিখতে গেলেই পরিভাষার প্রশ্ন খুব জটিল হয়ে দেখা দেয়। আমি এবিষয়ে আমার পূর্বসূরীদের যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। যেখানে যে পরিভাষা সুন্দর ও সহজ বলে মনে হয়েছে তা-ই গ্রহণ করেছি। আবার কখনও কখনও নিজেও পরিভাষা সৃষ্টি করেছি। পাঠকদের সুবিধের জন্য পরিভাষার সঙ্গেই বা পাদটীকায় ইংরেজী প্রতিশব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আগে যাঁরা বাংলা ভাষায় দর্শনের আলোচনা করেছেন, আমি পরিভাষা প্রণয়নে কমবেশী তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী। এখানে কোন বিশেষ নাম করলে অন্য নাম বাদ পড়তে পারে ভয়ে কোন নামই করছি না। আমি সাধারণভাবে সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

এই প্রসঙ্গে মাতৃভাষায় দর্শনের আলোচনায় যাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের নাম করি। পরমশ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ, ডক্টর রাসবিহারী দাস, ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডক্টর

অনিলকুমার রায়চৌধুরীর কাছেই আমি এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ঋণী। এঁদের সকলের জন্যই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল।

অধ্যাপক অশোককুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীদীপক চৌধুরী ও বন্ধুবর শ্রীবিনয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের নিত্য উৎসাহ ও নিরলস সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় মাতৃভাষায় দর্শনের গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। সাহিত্যিক বন্ধু নারায়ণ চৌধুরী পুস্তক-প্রকাশের ব্যাপারে যে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই। আমি এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমতী মাধুরী দেবী পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

কৃষ্ণনগর
মহালয়া, ১৩৬৫

নিবেদক—
শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা হয়েছে। আধুনিককালের দুটি বিশিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের বক্তব্যও সংক্ষেপে পরিবেশন করেছি। যাদের জন্য এই গ্রন্থ তারা যদি এই গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পায় তবেই শ্রম সার্থক মনে করবো।

আজাদ কলেজ,
কলিকাতা

নিবেদক—
শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের সংজ্ঞার্থ ও বিষয়বস্তু

দার্শনিকের কাজ

জটিল জগতে আমরা জন্মেছি। এই পৃথিবী আমাদের সৃষ্টি নয়। আমরা জগৎকে এই ভাবেই পেয়েছি। ভদ্রভাবে যাতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি সেই চেষ্টাই আমরা করি। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বিপুলা এ ধরণীর কোন পরিবর্তন-সাধন আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু আমরা সবাই বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছি। সুতরাং জগৎটাকে বোঝবার চেষ্টা আমাদের সকলেরই করা উচিত।

জগৎ ও জীবনকে বোঝবার চেষ্টা এবং পৃথিবীতে নিজের স্থান নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষাই দার্শনিক-জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে। এই দিক থেকে আমরা সবাই দার্শনিক, কারণ জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের সকলের আছে। হয়ত কারও কারও ধারণা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কারও কারও আবার অতি সাধারণ। তাতে দর্শনের মূল্য-বিচারে সব ধারণা নিশ্চয়ই একরকম হবে না, কিন্তু এগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন তা কখনও অস্বীকার করা যাবে না। অবশ্য বিশেষভাবে দর্শন বলি আমরা সেই সমস্ত চিন্তাধারাকেই যা সুসংবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ লোক সাধারণ ভাবে জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করেন, আর দার্শনিক যুক্তি-তর্ক ও বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে দার্শনিকের বোধ হয় এইটুকুই তফাৎ।

দর্শন যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার। জগৎ ও জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখবার চেষ্টা করেন দার্শনিক ; নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে দেন তিনি। অঙ্কশাস্ত্র বা ব্যাকরণ যে অর্থে শেখা যায়, দর্শন কিন্তু সে অর্থে কখনই শেখা যায় না। দর্শন পড়া মানে কতকগুলো নূতন তথ্য জানা নয়। অবশ্য দর্শনে যে আমরা নূতন তথ্য একেবারেই পাই না, এমনও নয়। পুরনো পরিচিত বস্তুকেই নূতন ভাবে দেখতে চেষ্টা করা বিশেষভাবে দার্শনিকের কাজ।

দর্শন কিন্তু শেখানো যায় না। দর্শন করতে হয়। আগেই ত বলেছি, দর্শন চিন্তার ব্যাপার। চিন্তা নিজে নিজেই করতে হয়, অন্য কেউ তা শিখিয়ে দিতে পারে না। দর্শন যে শেখানো যায় না তার অবশ্য আর একটা কারণও আছে। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা বা ইতিহাস শেখানো যায়, কারণ এই সব বিষয়ে সর্বজন-গৃহীত কতকগুলো সিদ্ধান্ত আছে। দর্শনে কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত কোন সিদ্ধান্ত নেই বললেই চলে। একজন দার্শনিক যে কথা বলেন, প্রায়ই দেখা যায় আর একজন দার্শনিক সে-কথা বলেন না। একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যই মতের এরকম গরমিল হয়ে থাকে।

প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা তা সহজে বলা যায় না। দর্শনের ইতিহাসে কেউই সর্বজন-স্বীকৃতির দাবী করতে পারেন না। যাঁর বুদ্ধিতে জগৎ ও জীবনের চেহারা যে ভাবে ধরা দিয়েছে, তিনি তা-ই প্রকাশ করেছেন।

যে জগতে আমরা জন্মেছি তাকে বুঝতে গেলে নানা রকমের জটিলতা এসে দেখা দেয়। পরিচিত জগৎকে রহস্যময় বলে বোধ হয়। দুনিয়ার ব্যাপার যে খুব সহজবোধ্য নয়, এ-জ্ঞান প্রায় সকলেরই আছে। আমাদের জ্ঞান যে কী বস্তু এবং কি করেই বা আমরা জানি—এসব ব্যাপারও কিন্তু কম রহস্যময় নয়। জগৎকে জানতে বা বুঝতে গেলে জানা বা বোঝা যে কী জিনিস তা জানবার প্রয়োজন আছে। দার্শনিক প্রথমেই তা জানতে চেষ্টা করেন।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, দার্শনিকের প্রশ্নগুলি একটু বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যদি প্রশ্ন করা যায়—এই বইটি কি টেবিলের উপরে ছিল, না আলমারিতে ছিল? প্রশ্নের আগে এর উত্তর আমাদের মনেই আসেনি। কিন্তু এমন কতকগুলো প্রশ্ন আছে যা জিজ্ঞেস করার আগেই তাদের উত্তর আমাদের মনে মনে থাকে। জগতের প্রকৃতি, পৃথিবীতে মানুষের স্থান প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্নগুলি এই ধরনের। এই সব প্রশ্ন করার আগেই আমরা প্রত্যেকে এদের কোন না কোন উত্তর ঠিক করে রেখেছি।

একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হল—কাল কি দেশ-নিরপেক্ষ ভাবে পরিমাপ করা যায়? সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ লোকের কাছে প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল বলে মনে হবে। আর সাধারণ লোক এমন ধরনের প্রশ্ন কখনও ভেবেছে কি না তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই যে সাধারণ লোক এরকম ধরনের প্রশ্ন না জেনেই তার উত্তর একটা ধরে নিয়েছে। অনেকেই ত

মনে করেন, দেশ-নিরপেক্ষভাবে কাল পরিমাপ করা যায় না। আমরা সবাই ভাবি, কলকাতা রেডিও স্টেশনে ৪৫ মিনিট ধরে যে নাটক হল মুর্শিদাবাদেও ঠিক ৪৫ মিনিটই সে নাটকটা আমরা শুনব। যদি এর পেছনের যুক্তি জিজ্ঞেস করা হয়, তবে হয়ত অনেকেই আমরা তার সদুত্তর দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিজাত এই বিশ্বাসকেও আমরা সহজে ছাড়তে পারব না।

অন্য আর এক ধরনের বিশ্বাসের উদাহরণও গ্রহণ করা যেতে পারে। শীতের তীব্রতায় যখন আমরা কষ্ট পাই, তখন ভাবি শীতের পরই ত বসন্ত আসবে; তখন আমাদের কষ্ট আর থাকবে না। শীতের পর বসন্ত আসবে—এই বিশ্বাস আমাদের এতই দৃঢ় যে, এর অন্যথা আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে, ঋতু-বিবর্তন চিরকাল একরকম ভাবেই হবে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি? একথা বললে অবশ্য চলবে না যে, শীতের পরেই ত বসন্ত আসে। যা প্রশ্ন তাই ত আবার ঘুরিয়ে এখানে উত্তরে বলা হয়েছে। এ ত আর কোন ব্যাখ্যা হল না। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, ঋতু-বিবর্তন একরকম ভাবেই হবে, এটা আমাদের একটা বিশ্বাস। কিন্তু আমরা জানি না যে, এটা আমাদের বিশ্বাস মাত্র।

অবশ্য সবাই এই বিশ্বাস করবে তার কোন মানে নেই। পর্বতবাসী অরণ্যচারী বহু মানুষের মধ্যেই ঋতু-বিবর্তন সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে, বসন্ত কখনও আসবে না যদি বসন্তের আগমনের কোন ব্যবস্থা তারা না করে। সেজন্যই নানা দেব-দেবীর পুজো আর যাগযজ্ঞ তারা করে থাকে। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বসন্ত আসবে—এই তাদের আশা। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়—আরাধনা না করলে বসন্ত আসে না, একথা তাদের বললে কে?—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা দিতে পারবে না। আসলে এটা তাদের একটা বিশ্বাস।

এসমস্ত উদাহরন থেকে দু'টো কথা খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথমত—আমরা সবাই খুব জটিল বিষয় সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করে থাকি। দ্বিতীয়ত—এসব ধারণা বা বিশ্বাস যে আমাদেরই সৃষ্টি সে সম্বন্ধে প্রায়ই আমরা অবহিত থাকি না।

আমাদের জীবনে এসমস্ত বিশ্বাস বা ধারণা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের সমস্ত কার্যাবলী এসমস্ত ধারণা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে কার্যক্রমেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বন্ধুকে বলা যাবে না যে তুমি দেরি করে এসেছ, যদি আমরা বিশ্বাস না করি যে ভিন্ন ভিন্ন লোক একই

ভাবে সময়ের পরিমাপ করে থাকে। কৃষক তার কৃষিকাজই করতে পারবে না যদি সে বিশেষ রকম ঋতু-বিবর্তন ধারায় বিশ্বাস না করে। সুতরাং আমরা যে নিরুপায়ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণার উপর নির্ভর করে থাকি, তা অস্বীকার করা যাবে না।

আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তবে সেই ধারণানির্ভর কর্ম নিশ্চয়ই সফল হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা যদি ভুল হয় তবে কাজ করতে গিয়ে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। যে কৃষক স্বাভাবিক ঋতু-বিবর্তনে বিশ্বাস করে, সে অতি সহজেই সুফল পেয়ে কৃষিকাজ করে থাকে। কিন্তু যারা মনে করে দেবতাকে তুষ্ট করে ঋতু-বিবর্তন ঘটাতে হয়, তারা এই ভুল ধারণার জন্য অযথা পূজো অর্চনায় খানিকটা সময় নষ্ট করে।

আমরা কিন্তু নিজেদের ধারণা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে খুব কমই অবহিত থাকি। যাঁরা নিজেদের খুব সাংসারিক লোক বলে পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে একথার সত্যতা খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। যদিও তাঁরা বলেন যে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা সাংসারিক জ্ঞান আহরণ করেছেন, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বিশ্বাস বা ধারণা দিয়েই পরিচালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাগুলোকে তাঁরা ভুল করে অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞান বলে মনে করেন। সে জন্যই তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা মুশকিল।

আমরা কি কি ধারণা করেছি বা কোন্ কোন্ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি তা জানা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য। আর তা জানতে গেলে নির্মোহ মন নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এই চিন্তাই ত দার্শনিক চিন্তা।

যতক্ষণ আমরা আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে অবহিত না হই, ততক্ষণ আমরা এদের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হই এবং নানা রকমের অসুবিধা ভোগ করি। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আমাদের মজ্জাগত ধারণার জ্ঞান না থাকলে আমরা কখনই স্বাধীনভাবে কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারি না। সুতরাং সাধারণ লোক যে মনে করে মানুষ নিজ ক্ষমতা ও ভাগ্য অনুসারেই কাজ করে সাফল্য বা অসাফল্য লাভ করে এবং দার্শনিক চিন্তা আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য নয়, তারা কিন্তু ভুল করে থাকে। চিন্তা করে কাজ করলেই সহজে সাফল্য আসে। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব যখন না ভেবেচিন্তেই কাজ করি তখন কিন্তু আমরা আমাদেরই অপমান করি, আমাদের বুদ্ধির শক্তিকে অশ্রদ্ধা করি। আমাদের এরকম ব্যবহার কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

চিন্তা করে কাজ করি না বলে প্রায়ই আমাদের অনুশোচনা করতে হয়। যদি সব সময়েই মাথা খাটিয়ে কাজ করি তবে অসুবিধে খুব কমই ভোগ করব। আর বিচারবুদ্ধি নিয়ে আমরা মানুষ যারা জন্মেছি তাদের ত বিচার করেই কাজ করা উচিত। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা আমাদের কার্যাবলীর নিয়ামক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু আমরা মজ্জাগত ধারণা বা দৃঢ়মূল বিশ্বাসের দ্বারাই বিশেষভাবে পরিচালিত হয়ে থাকি, সুতরাং এসব ধারণা বা বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এই যৌক্তিকতা-বিচার কিন্তু সহজ কাজ নয়। যদি কোন ধারণা বা বিশ্বাস অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন হয় তবে তা পরিত্যাগ করে নূতন ধারণা বা বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। **মজ্জাগত ধারণা ও দৃঢ়মূল বিশ্বাসের যৌক্তিকতা-বিচার ও সময় বিশেষে নূতন ধারণার সৃষ্টি, এই হচ্ছে দার্শনিকের কাজ।** কাজটা মোটেই সহজ নয়। দার্শনিক তাঁর কাজের গুরুত্ব বোঝেন। তিনি বিনীতভাবেই তাঁর বিচার-বুদ্ধিমত কাজ করে যান। ফলের ভাবনা তিনি ভাবেন না। দার্শনিক সত্যই নিষ্কাম কর্মী।

চিন্তার যে সমস্ত কাজ আছে তার মধ্যে দার্শনিক চিন্তা অত্যন্ত কঠিন ও একটু নূতন ধরনের। সক্রেটিস, প্লেটো, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি সমস্ত প্রখ্যাত দার্শনিকেরাই দর্শনের দুরূহতা স্বীকার করেছেন। দর্শনের দুরূহতা একটি বিশেষ কারণে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ত শুধু যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হই না; প্রায়ই ভাবপ্রবণতা আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে। মজ্জাগত সমস্ত ধারণা এবং দৃঢ়মূল সকল বিশ্বাসই ভাবপ্রবণতার কোমল কোলে লালিত হয়ে থাকে। তাই যুক্তি দিয়ে মজ্জাগত ধারণার দোষগুণ বিচার অনেকেই ভাল চোখে দেখে না। যার পেছনে হৃদয়ের দুর্বলতা আছে তা শত খারাপ হলেও আমরা সহজে তা ত্যাগ করতে পারি না। সে জন্যেই নির্মোহ মনে দার্শনিক-বিচার জনসাধারণ প্রীতির চোখে দেখে না। তবু যাঁরা সত্যসন্ধী তাঁরা শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কাজ করে যাবেন। দার্শনিকের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই শক্ত। যেহেতু লোকে তাঁদের কাজ ভাল চোখে দেখে না, সে জন্য এ কাজ আরও শক্ত।

দর্শনের আলোচ্য বিষয় (Scope of Philosophy)

জগৎ, জীবন ও জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা যে সব ধারণা বা বিশ্বাস নিয়ে কাজ-কারবার করি তাদের যৌক্তিকতা-বিচার আর মূল্যাবধারণই দর্শনের কাজ।

জাবনের পথে চলতে গিয়ে জ্ঞানের সম্ভাবনা[1], জড়,[2] প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবই সাধারণতঃ আমরা মেনে নিই। দর্শনে এই মেনে-নেওয়া তত্ত্বগুলোর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হয়ে থাকে। দার্শনিক বিচার করে দেখেন—আমাদের পক্ষে কতটুকু জানা সম্ভব ? জ্ঞানের সীমা কি ? জ্ঞান-লাভের জন্য কি কি প্রাগুপকরণ[3] প্রয়োজন ? জ্ঞানের সত্যতা কিসের উপর নির্ভর করে ? জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের আসল রূপ নির্ধারণেরও চেষ্টা করেন দার্শনিক। জড়ের সঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্পর্ক কি ? প্রাণ ও মন কি জড় থেকেই এসেছে, না তাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে ? ঈশ্বর আছেন কি ? থাকলে, ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক কি ?—এই সবই দার্শনিকের প্রশ্ন। সাধারণ ভাবে দেশ, কাল ও কার্যকারণ তত্ত্ব আমরা জীবনের প্রয়োজনে মেনে নিই। দার্শনিক এই সব তত্ত্বেরও প্রকৃতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন জিনিসের মূল্যাবধারণ করে থাকি। কোন একটি ফুলকে বলি সুন্দর, কোন একটিকে বা কুৎসিত, শ্যামকে বলি ভালো আর রামকে বলি মন্দ। নবীন যখন কোন সংবাদ এনে দেয় তখন বলি সত্য খবরই সে দিয়েছে ; আবার অন্য কেউ খবর এনে দিলে হয়ত বলি খবরটা ত সত্য নয়। সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত ও ভালো-মন্দের বিচার আমরা প্রতিনিয়ত করে থাকি। দার্শনিক এই সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত আর ভালোমন্দের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেন।

এতক্ষণ যা বলা হল তা সাজিয়ে নিলে দেখা যাবে—দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) জ্ঞানের সম্ভাবনা-নির্ণয় বা জ্ঞান-সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার আলোচনা ;

(২) দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় ;

(৩) সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত আর ভালোমন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ।

কাজের সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে দর্শনের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এই শাখাগুলো কিন্তু দর্শনেরই অঙ্গবিশেষ। দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে বা জ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা করে, তার নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান[4]। জ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস কি ? জ্ঞানের সীমা কোথায় ? জ্ঞান-লাভের প্রাগুপকরণ কি ? জ্ঞানের সত্যতা কি ভাবে নির্ণয় করা যায় ?—এই জাতীয় প্রশ্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

১। Possibility of knowledge ২। Matter ৩। Pre-conditions
৪। Epistemology

দর্শনের যে শাখা দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তার নাম **পরা-বিজ্ঞান** (**Metaphysics**)। জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এদের বিভিন্ন প্রকাশের রূপ আগে জানা দরকার। বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়েই যিনি প্রকাশিত তাঁর রূপ জানা যায়। আমের স্বরূপ জানতে গেলে আমের বিভিন্ন প্রকাশ—কাঁচা আম, কাঁচামিঠে আম আর পাকা আম—আগেই ত জানতে হবে। তাই পরা-বিজ্ঞান যা বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে—তার আগে বস্তু-প্রকাশের আলোচনা করা দরকার। বস্তুর প্রকাশ্য রূপ নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তার নাম **প্রকাশ-বিজ্ঞান** (**Phenomenology**)। প্রকাশ-বিজ্ঞান জানার পরই পরা-বিজ্ঞানে প্রবেশ করা যেতে পারে। তবে প্রকাশ-বিজ্ঞান আর পরা-বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে ছাড়া আর একটা ভাবাই যায় না।

সর্বশেষে বস্তুর মূল্য-নির্ণয়ের জন্যও দার্শনিক চেষ্টা করেন। দর্শনের যে শাখায় মূল্যাবধারণ ও মূল্য-বিষয়ক বিধান বা বচন[১] নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার নাম **মান-বিজ্ঞান** (**Axiology**)। মূল্য-বিষয়ক বিধানের রূপ, মূল্যের মূল্য আর সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপাবধারণই এই মান-বিজ্ঞানের কাজ। মান-বিজ্ঞানের চারটি শাখা। যে শাখা সত্যের প্রকৃতি ও আকার নিয়ে আলোচনা করে তার নাম **তর্কবিজ্ঞান** (**Logic**)। যে শাখা সুন্দরের প্রকৃতি নির্ণয় করে তার নাম **সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান বা কান্তিবিদ্যা**(**Aesthetics**)। কল্যাণ বা শুভের প্রকৃতি দুটি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়—ব্যক্তির এবং সমাজের। ব্যক্তির কল্যাণের প্রকৃতি নিয়ে যে শাখা আলোচনা করে তার নাম **নীতিশাস্ত্র** (**Ethics**) এবং যে শাখা সমাজকল্যাণের প্রকৃতি নির্ণয় করে তার নাম **সমাজ-দর্শন** (**Social Philosophy**)।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দর্শন চতুরঙ্গবিশেষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান তার প্রথম অঙ্গ। দ্বিতীয় অঙ্গ তার প্রকাশ-বিজ্ঞান ; তৃতীয়—পরা-বিজ্ঞান আর চতুর্থাঙ্গ তার মান-বিজ্ঞান।

দর্শন ও পরা-বিজ্ঞান (Philosophy and Metaphysics)

পরা-বিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের একটি অঙ্গবিশেষ। চতুরঙ্গের অন্যতম অঙ্গ এই পরা-বিজ্ঞান কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সর্বপ্রধান অঙ্গ। দর্শনশাস্ত্রের প্রাণই যেন এই

১। Value judgments.

পরা-বিজ্ঞানে নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, অনেক দার্শনিকের মতে পরা-বিজ্ঞান অসম্ভব এবং পরা-বিজ্ঞান ব্যতীতই দর্শন শাস্ত্র সম্ভব। দেশ, কাল, কার্যকারণসম্পর্ক, জড়, প্রাণ, মন, ঈশ্বর—এ সকলের স্বরূপ-নির্ণয় পরা-বিজ্ঞানের কাজ। নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে সব প্রচ্ছন্ন সত্তা বা তত্ত্ব নিহিত তারই আলোচনা করে পরা-বিজ্ঞান।

যে কোন জিনিসেরই দুটো বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনা চলতে পারে। একটা হচ্ছে বস্তুপ্র-কাশের দিক্ আর একটা হচ্ছে বস্তু-স্বরূপের দিক্। আকাশে যখন ঘুড়ি ওড়ে তখন যতই ঘুড়ি ওপরে ওঠে ততই তা ছোট বলে মনে হয়। আবার যখন ঘুড়ি মাটিতে নামান হয় তখন তা বেশ বড় আকারেই দেখি। এখানে মাটিতে ঘুড়ির যে আকার দেখি—তা তার প্রকাশাকার। পরা-বিজ্ঞান বস্তুর স্বরূপাকার নিয়ে আলোচনা করে, প্রকাশাকার নিয়ে নয়। অবশ্য প্রকাশা-কারের প্রকাশতার যে কি রূপ তা নিয়ে পরা-বিজ্ঞানে আলোচনা চলতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ, না পরা-বিজ্ঞানের অঙ্গ—এ-নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করি। তবে তা পরা-বিজ্ঞানের অংশ হবে না কেন? মান-বিজ্ঞানে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ উদ্ঘাটনেরই চেষ্টা করা হয়। সুতরাং মান-বিজ্ঞানের পরা-বিজ্ঞানেরই অংশ হওয়া উচিত। আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ত দর্শন বলতে পরা-বিজ্ঞানই বোঝেন। তাঁদের মতে পরা-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গ মাত্র নয়—পরা-বিজ্ঞান আর দর্শন একই জিনিস। পরা-বিজ্ঞান আর দর্শন যদি সমার্থক হয়, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর মান-বিজ্ঞান ত পরা-বিজ্ঞানেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের মনে হয়—দর্শনকে পরা-বিজ্ঞানের চেয়ে একটু ব্যাপকতর শাস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। পরা-বিজ্ঞানে শুধু বস্তু-স্বরূপেরই আলোচনা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বস্তু-প্রকাশের আলোচনা ছাড়া বস্তু-স্বরূপের আলোচনা চলে না। দর্শন বস্তু-প্রকাশ ও বস্তু-স্বরূপ দুয়েরই আলোচনা করে থাকে। সুতরাং পরা-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গই বটে, সমার্থক নয়।

তারপর প্রশ্ন উঠবে—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গ হবে, না পরা-বিজ্ঞানের অঙ্গ হবে? আমরা দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞানকে পরা-বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ রকম না ভাবাই উচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার পরই পরা-বিজ্ঞানের আলোচনা হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিচার করে দেখবে বস্তু-প্রকাশাতিরিক্ত

বস্তু-স্বরূপ বলে কিছু জানা যায় কিনা—তারপরই বস্তুর স্বরূপ জানার চেষ্টা বা পরা-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব হবে। সুতরাং দর্শনকে একটি ব্যাপকতর শাস্ত্র ভেবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরাবিজ্ঞানকে তার দুটো অঙ্গ হিসাবে ভাবাই যেন অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। মান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। মান বা মূল্য অন্য সমস্ত বস্তু থেকেই স্বতন্ত্র। মূল্য অন্য বস্তুর মত জাগতিক নয়—এ একান্তভাবেই আদর্শ রাজ্যের ব্যাপার। সুতরাং মূল্য-সত্তা অন্য সত্তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই ভাল। সুতরাং মান-বিজ্ঞান ব্যাপকতর শাস্ত্র দর্শনেরই শাখা—পরা-বিজ্ঞানের নয়।

দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (Philosophy and Epistemology)

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ-কারবার করি তাদের যৌক্তিকতা বিচার ও মূল্যাবধারণই দর্শনের কাজ। সুতরাং দার্শনিক যে পথের পথিক তা যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ বা জ্ঞানের পথ। দার্শনিক যখন এই পথে চলতে শুরু করেন তখন এই পথের বিপদ-আপদ আর শেষ সীমা একান্ত ভাবেই তাঁর জানা দরকার। নতুবা নানা বিড়ম্বনায় তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হবে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রাগুপকরণ কি কি, জ্ঞানের সীমা কোথায়—এসব প্রশ্নের সদুত্তর জেনেই দার্শনিক পথ চলতে পারেন। আর এসব প্রশ্নই জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। সুতরাং দর্শনের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান অপরিহার্য।

পুরাকালে কিন্তু দার্শনিকেরা জ্ঞানের সম্ভাবনা আলোচনা না করেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মন দিয়েছিলেন। এভাবে অবশ্য নির্বিচারবাদ[১] গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে উচিত হয়নি। দার্শনিকদের কাজই হচ্ছে প্রতিপদে বিচার করে যাওয়া। সুতরং বিচার না করেই কোন কিছু গ্রহণ করা দার্শনিক-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। প্রাচীন কালের দার্শনিকেরা এরকম করেছিলেন বলেই চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছিল। কোন্ মতবাদকে গ্রহণ করা যাবে তা ভেবেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান দার্শনিক কাণ্ট এসে সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি জ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে অলোচনা করে দেখালেন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কোন জ্ঞান হয় না।

সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে বিচার বা আলোচনা করা নিষ্ফল। এই ভাবে দর্শনের ক্ষেত্রে নির্বিচারবাদের স্থানে সবিচারবাদ[২] দেখা দিল।

১। Dogmatism
২। Critical theory or Criticism

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রাগুপকরণের চেয়ে জ্ঞানোৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক[১] ব্যাখ্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কাণ্টই সর্বপ্রথম জ্ঞানের প্রাগুপকরণ নির্ণয়ের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দার্শনিকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে কাণ্ট যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা মানেননি বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান (Epistemology and Metaphysics)

জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগুপকরণ, সীমা ও সত্যতার সর্ত নিয়ে আলোচনা করে। পরা-বিজ্ঞান জগৎ ও জীবনে নিহিত তত্ত্ব বা সত্তার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট প্রথম পরা-বিজ্ঞান আলোচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের সীমা না জেনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মন দেওয়ার কোন মানে হয় না। জ্ঞানের সম্ভাবনা আলোচনা করে যদি দেখা যায় যে চরম তত্ত্ব জানা যায় না তবে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করে কি হবে? কাণ্ট ত জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে দেখলেন, বস্তু-স্বরূপ কখনই জানা যায় না; যা জানা যায় তা বস্তু-প্রকাশ মাত্র। কাণ্টের মতে পরা-বিজ্ঞানের আগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে কতটুকু জানা যায় তা জেনেই পরা-বিজ্ঞানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

কাণ্টের পরবর্তী সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকই[২] জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে কাণ্টের মত অনেকাংশে শিরোধার্য করেছেন। অবশ্য তাঁরা কাণ্টের মত চরমতত্ত্ব জানা যায় না, এমন কথা বলেন না—জার্মান দার্শনিক হেগেল জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে জ্ঞানই চরম সত্তা—সুতরাং হেগেলের মতে পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় চরমতত্ত্ব জ্ঞানই বটে। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানও জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে থাকে। সুতরাং হেগেল মনে করেন, শেষ পর্যন্ত পরা-বিজ্ঞান আর জ্ঞান-বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

১। Psychological
২। Idealists

নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা[১] জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে, কিন্তু চরমতত্ত্ব যা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় তার কোন পরিচয় দেবার ক্ষমতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেই। তত্ত্ব[২] জ্ঞান-নির্ভর নয়, জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগতের দিকে তাকালেই একথার সত্যতা বোঝা যায়। জগৎকে ত চোখের সামনে আমাদের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সুতরাং জগতে নিহিত তত্ত্ব আর আমাদের জ্ঞান-নির্ভর হবে কি করে? সুতরাং নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীর মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরনিরপেক্ষ দুটি বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে আর পরা-বিজ্ঞান জ্ঞানাতিরিক্ত তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। এদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই।

আমাদের মনে হয় হেগেলপন্থী ভাববাদী ও নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী—এই দুই দলের দার্শনিকেরাই সত্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন। হেগেল যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর পরা-বিজ্ঞান এক করে ফেলেছেন—এটা যেমন সত্যি নয়, ঠিক তেমনি নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও যে দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছেন, তাও ঠিক নয়। পরা-বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের মধ্যে জ্ঞান অন্যতম, কিন্তু একমাত্র বিষয় নয়। চরম তত্ত্বকে আমরা শুধু জ্ঞানগম্য বলে মনে করি না, তা আমাদের বাসনা চরিতার্থ করে এবং অনুভূতি তৃপ্ত করে বলেও মনে করি। সুতরাং তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা কেবলমাত্র জ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তা আমাদের আচার, আচরণ এবং সৌন্দর্যানুভূতির ও তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। সত্য, শিব ও সুন্দর এই তিনই পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য। কেবলমাত্র সত্য পরা-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নয়। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান এক হতে পারে না।

তবে কেউ যদি মনে করেন, যে মানসিক বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান হয় তা জ্ঞানের বিষয় থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই আলোচনা করা যায়, তাও ঠিক নয়। কারণ, যে বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান হয় তার প্রকৃতি, শক্তি এবং সীমা কেবলমাত্র কি কি জানা যায়, সে আলোচনার ভিত্তিতেই নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ, তত্ত্বালোচনার ভিত্তিতেই জ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। অস্ত্রের প্রকৃতি যেমন তার ব্যবহারের মাধ্যমে জানা যায়, তেমনি জ্ঞানের প্রকৃতি জ্ঞানের প্রয়োগ বা জ্ঞানের বিষয়ের

১। American Neo-Realists

২। Reality

মাধ্যমেই জানা যায়। সুতরাং জ্ঞানালোচনা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য তত্ত্বালোচনা বা পরা-বিজ্ঞান প্রয়োজন।

আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে জ্ঞানের সীমা জানা গেলেই পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করা যেতে পারে। তত্ত্ব আদৌ জানা যায় কিনা তা জেনেই পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করা উচিত। তত্ত্ব আদৌ জানা যায় কি না, এ আলোচনা জ্ঞান-বিজ্ঞান করে থাকে। সুতরাং এই দিক্ থেকে পরা-বিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্বের স্বরূপ কি তা যদি জানা না যায় তবে তত্ত্ব জানা যাবে কি যাবে না তাই বা বোঝা যাবে কি করে? সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্ব জানা যাবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে হলে পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্বের স্বরূপ জেনে নিতে হবে। এই দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরা-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এত নিবিড় যে একটি ছাড়া আর একটি হতে পারে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তর্কবিজ্ঞান (Epistemology and Logic)

শুদ্ধ চিন্তা বা অনুমানের প্রকৃতি নির্ণয়ই মুখ্যতঃ তর্কবিজ্ঞানের কাজ। অনুমান-প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা বলতে কি বোঝায়, সিদ্ধান্ত উপাত্ত হতে কি ভাবে স্থাপন করলে অনুমান শুদ্ধ হয়, তা আলোচনা করে তর্কবিজ্ঞান। এক কথায়, অনুমানাত্মক জ্ঞানের শুদ্ধতার প্রকৃতি ও প্রকার যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকে বলে তর্ক-বিজ্ঞান।

কি কি সর্ত পালন করলে জ্ঞান আদৌ সম্ভব এবং জ্ঞানের সীমা কি তা নির্ণয় করে পরা-বিজ্ঞান। জ্ঞান আদৌ হলে তবে তার শুদ্ধতার প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং জ্ঞানের শুদ্ধতা নিয়ে যে তর্কবিজ্ঞান আলোচনা করে তার চেয়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি কি সর্ত পালন করলে জ্ঞান আদৌ সম্ভব, এ আলোচনা করে, তা গভীরতর এবং অধিকতর মূলস্পর্শী।

অনুমানের প্রমাণ-প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি আলোচনা করে তর্কবিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞান তা না করে জ্ঞান যে সমস্ত কারণের জন্য সম্ভব সেই সমস্ত কারণ এবং তাদের নিয়মাবলী আলোচনা করে। এজন্যই অনেকে বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেকাংশে পরা-বিজ্ঞানের সমধর্মী। তবে সমধর্মী হলেও তারা অভিন্ন নয়, একথা আমরা আগেই বলেছি।

এই ক্ষেত্রে পরা-বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা (**Possibility of Metaphysics**) সম্বন্ধে কোন কোন দার্শনিক যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তার কারণ এবং যৌক্তিকতা আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, বস্তু যা দেখায় অনেক সময়ই স্বরূপে বস্তু তা নয়। ঘুড়ি আকাশে অনেক ওপরে যখন ওড়ে তখন তা খুব ছোট দেখায়, কিন্তু বস্তুটি স্বরূপে তত ছোট নয়। আমরা যখন ট্রেনে যাই তখন চারপাশের বস্তু ছুটে চলেছে বলে মনে করি, কিন্তু বস্তু প্রকৃতই ছোটে না। সুতরাং বস্তুর প্রকাশ এবং বস্তুর স্বরূপ যে অনেকক্ষেত্রেই ভিন্ন তা অস্বীকার করা যায় না। যে শাস্ত্র বস্তু-প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র বস্তু-স্বরূপের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে তাকে পরা-বিজ্ঞান বলা হয়।

অনেকে পরা-বিজ্ঞান আলোচনা ও পাঠের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেন—(১) এমন একটি বিজ্ঞান অসম্ভব, (২) যদিও বা তর্কের খাতিরে সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয় তবে এই বিজ্ঞান হবে প্রয়োজনহীন, কারণ অন্যান্য বিজ্ঞান এবং আমাদের ভূয়োদর্শন আমরা যা কিছু জানতে চাই তা জানাতে সক্ষম এবং (৩) এই বিজ্ঞানের কোন প্রগতি নেই, কারণ এই বিজ্ঞানে আলোচিত সমস্যাবলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা সম্ভব অতীতে তা সবই বলা হয়েছে এবং এখন আর নূতন কিছু বলার নেই।

আমরা এবার এই সমস্ত আপত্তির যৌক্তিকতা বিচার করব।

(১) পরা-বিজ্ঞান অসম্ভব, এই আপত্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, চেষ্টা না করে এমন মন্তব্য করা যুক্তিহীন। যদি কোন লোক পরা-বিজ্ঞান আলোচনায় উৎসাহী না হন তবে তিনি এ আলোচনায় অগ্রসর না হতে পারেন। এতে কিছু বলার নেই। কিন্তু, পরা-বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোন অধিকার তাঁর থাকতে পারে না। এই অধিকার অর্জন করতে হলে তাঁকে পরা-বিজ্ঞান আলোচনার চেষ্টা করতে হবে এবং চেষ্টা করলেই পরা-বিজ্ঞান আলোচনা অসম্ভব, একথা আর বলা যাবে না। এই আপত্তি আরও বিস্তারিত ভাবেও আলোচনা করা যায়।

(ক) কখনও কখনও এমন বলা হয় যে, পরা-বিজ্ঞান অসম্ভব, কারণ পরা-বিজ্ঞানের সমস্যাবলীর সমাধান অসম্ভব। বোধগম্য প্রশ্নেরই বোধগম্য উত্তর হতে পারে। অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব ছাড়া আবার হবে কি? যদি কেউ প্রশ্ন করে—বন্ধ্যাপুত্র পরীক্ষায় পাস করেছে কি? তবে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বন্ধ্যাপুত্রই সম্ভব নয়, সুতরাং তারপাস করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। অনেকে

মনে করেন, বস্তু-প্রকাশের অতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপ বলে কিছু নেই, সুতরাং পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু-স্বরূপ অসম্ভব হওয়ায় পরা-বিজ্ঞানই অসম্ভব।

একথা যদি সত্য হয় তবে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানী বস্তু-স্বরূপ ও বস্তু-প্রকাশের মধ্যে যে পার্থক্য করেন, তা মিথ্যা হবে। ফলে শুধু যে পরা-বিজ্ঞান অসম্ভব হবে তা নয়, সমস্ত রকমের জ্ঞান ও বিজ্ঞানই অসম্ভব হবে। তা হলে হয় আমাদের বলতে হবে, বস্তু-স্বরূপ ও বস্তু-প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য করার কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই, ফলে সমস্ত বিজ্ঞানই হবে মিথ্যা, নয়ত বলতে হবে এদের পার্থক্যের যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে এবং এই ভিত্তি অনুসন্ধান করতে গেলেই পরা-বিজ্ঞান-চর্চায় প্রবেশ করতে হবে।

(খ) একই অভিযোগ কখনও কখনও অন্যরূপেও প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, যত রকমের বোধগম্য প্রশ্ন এবং সম্ভবপর সমস্যা আছে সবই কোন না কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে, সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনা করে না এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্যাই নেই যা পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য হতে পারে। এইরূপ যুক্তি-চক্রক দোষদুষ্ট, কারণ, যে উপাত্তের সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা হয়েছে সে উপাত্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হতে পারে। বিজ্ঞানী এবং পরা-বিজ্ঞানীর মতভেদের কারণ এই যে, বিজ্ঞানীর মতে সমস্ত বোধগম্য সমস্যাই বিজ্ঞানের আলোচ্য, পরা-বিজ্ঞানীর মতে বিজ্ঞানে আলোচিত হয় না এমন সমস্যাও আছে এবং তা পরা-বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া কোন মতই অন্য মতের চেয়ে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। পরা-বিজ্ঞানীর মতে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও জগৎ ও জীবনের প্রতি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত একথা আমরা অপ্রমাণ করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত পরা-বিজ্ঞানীর মতের বিরুদ্ধে আমরা সঙ্গত ভাবে কিছু বলতে পারব না।

(গ) অনেকে আবার পরা-বিজ্ঞানের সমস্যাবলীর বোধগম্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু এদের সমাধানের ক্ষমতা আমাদের নেই বলে মনে করেন। বস্তু-প্রকাশের অতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপ বলে কিছু থাকতে পারে, এমন কথা তাঁরা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁরা বলেন, মানুষের ক্ষমতা এমনই সীমাবদ্ধ যে তাদের পক্ষে বস্তু-স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞান বস্তু-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাণ্ট এমনি ধরনের মত প্রচার করেছেন বলে মনে করা হয়।

জ্ঞান বস্তু-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একথা বলতে হলে বস্তু-প্রকাশের অতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার না করে উপায় নেই।

বস্তু-প্রকাশ ভিন্ন কিছুই না থাকলে জ্ঞান বস্তু-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একথা বলার অর্থ হয় না। তবে এই ক্ষেত্রে বস্তু-স্বরূপ জ্ঞাত নয়, এমন একটা ইঙ্গিত আছে। এই ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা করে যদি বলা হয় যে, আমরা বস্তু-স্বরূপ সম্বন্ধে এইটুকু জানি যে তা জ্ঞাত নয়, তবে এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কিছু বলা মুশকিল। তা ছাড়া যাঁরা বলেন, আমাদের জ্ঞান বস্তু-প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাঁরা অন্ততঃ একটি বাক্যকে চরম সত্য-প্রকাশক বলে মনে করেন এবং সে বাক্যটি হচ্ছে—'আমি জানি যে, আমি যা কিছু জানি তা বস্তু-প্রকাশ মাত্র'। এই বাক্যের যাথার্থ্য পরা-বিজ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। সুতরাং পরা-বিজ্ঞান-বিরোধীরা যে যুক্তির সাহায্যে পরা-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন সে যুক্তিই পরা-বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন প্রমাণ করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। আধুনিককালে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivists) নামে এক শ্রেণীর দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা বাক্যের অর্থ-প্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে তাঁরা পরা-বিজ্ঞানের সমস্ত বাক্য অর্থহীন বলে মন্তব্য করেছেন। আমরা এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে তাঁদের বক্তব্য আলোচনা করে তা খণ্ডন করব। গ্রন্থারম্ভেই এরকম একটি জটিল মত আলোচনা করা সঙ্গত হবে না।

পরা-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আরও যে দুটি আপত্তি উপস্থিত করা হয়েছে আমরা এবার অতি সংক্ষেপে তা আলোচনা করব।

(২) যাঁরা বলেন, পরা-বিজ্ঞান সম্ভব হলেও নিষ্প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং ভূয়োদর্শন যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই স্ববিরোধ সৃষ্টি না করে জানিয়ে দেয়, তাঁদের বলা যায়ঃ (ক) বক্তব্য সন্দেহজনক। আত্যন্তিক সত্তা বা তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা কোন বিজ্ঞানই করে না। অথচ এ বিষয় যে জ্ঞাতব্য নয় তা বলা যায় না। (খ) অনেক সময়ই দেখা যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের এবং ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার বিরোধিতা বর্তমান। স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—এই বিরোধিতা কি স্বরূপগত, না, প্রকাশগত বা বাহ্য? পরা-বিজ্ঞান আলোচনা না করলে এ প্রশ্নের উত্তর দান অসম্ভব। (গ) যদি কেউ বলেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের এবং ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার কোন বিরোধিতা নেই এবং সমস্ত বিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শনই বিশ্বের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, তবে সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা বলতে কি বোঝায় এবং 'বিরোধিতা নেই' একথারই বা অর্থ কি, তা সঙ্গতভাবেই তাঁকে জিজ্ঞাসা

করা যেতে পারে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পরা-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবেশ না করে দেওয়া যায় না।

(৩) পরা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন প্রগতি নেই, এই অভিযোগের উত্তর দর্শনের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই অতি সহজে দেওয়া যায়। পরা-বিজ্ঞানের সমস্যাবলী অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ বিজ্ঞানের সমস্যাই বা প্রাচীন নয়? পরা-বিজ্ঞানীর সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ এবং সমাধান-দানের দৃষ্টিভঙ্গী যুগে যুগে এবং দেশে দেশে নূতন রূপ গ্রহণ করে। পরা-বিজ্ঞানের অনেক মত বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করেছে,আবার বিজ্ঞানেরও অনেক মত পরা-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দার্শনিক ডেকার্টের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ক্যালকুলাস আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল দার্শনিক লাইবনিজের চিন্তা। পরা-বিজ্ঞানী চরম সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মত প্রচার করতে গিয়ে তৎকালে প্রচলিত কোন বৈজ্ঞানিক মতকেই উপেক্ষা করতে পারে না। সেজন্যই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এবং নূতন মতবাদের ফলে পরা-বিজ্ঞানের প্রাচীন সমস্যাবলীর নূতন রূপে প্রকাশ করা এবং বিচার করার প্রয়োজন হয়। এইভাবেই পরা-বিজ্ঞানে প্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি-কথা

বুদ্ধি নিয়ে মানুষ জন্মেছে। তাই মানুষের স্বভাবই এই যে, সে চিন্তা করে। কোন না কোন বিষয়ে চিন্তা না করে মানুষ থাকতেই পারে না। জীবনধারণের সহজ উপায় নিয়ে যেমন মানুষ চিন্তা করে, ঠিক তেমনি আবার জগৎ ও জীবনের জটিল প্রশ্ন নিয়েও সে চিন্তা করে। 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কলুষিত করতে পারে না। জীবনধারণের অতিরিক্ত নানা জটিলতার মধ্যেও তার চিন্তা পথ করে নেয়। জীবনের পথে চলতে চলতে যে-সব চিন্তা মানুষের মনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, তারই মধ্য থেকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ নিয়ে দার্শনিক চিন্তা আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই এই দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি। কিন্তু সর্বদেশে ও সর্বকালে একই ভাবে এর উৎপত্তি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন দেশ ও জাতির বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস

আলোচনা করি তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির বিভিন্নতা দেখে আশ্চর্য হই। এখানে আমরা সংক্ষেপে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো আলোচনা করব।

(ক) বিস্ময় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে বিস্ময় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। মানুষ যখন প্রথম এই জগৎ দেখল তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সু-উচ্চ পর্বত, তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর, গহন অরণ্য, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র, দিনের সূর্য আর রাত্রির চন্দ্র মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বারবার মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এই বিচিত্র জগৎ কি ভাবে সম্ভব হল? শুধু তা-ই নয়। মানুষের জন্ম আবার তার মৃত্যু—এও কি কম বিস্ময়? মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ, না মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে?—এই প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে। এই পৃথিবীতে যা কিছু গভীর ও গহন, বিরাট ও মহান্—তার পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে কিনা কে জানে! এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মানুষের মনে এসেছে। মানুষ চিন্তা করেছে, প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে। কখন হয়ত সে উত্তর হয়েছে ভীত মানুষের আত্ম-দুর্বলতার স্বীকারোক্তিমাত্র, আবার কখনও বা নানা উদ্ভট কল্পনাজালে জড়িত। কখনও কখনও কিন্তু এই সব উত্তরের মধ্যে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির প্রাখর্যেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রীস দেশে এইভাবেই ত দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল। সেখানকার প্রাচীনতম দার্শনিক থেলিস আয়োনিয়া নামে এক দ্বীপে বাস করতেন। তিনি দেখলেন, চারিদিকেই জল, স্থল ত সামান্যমাত্র। জলের প্রাচুর্যে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে তিনি জলকেই বিশ্বের মূল উপাদান বলে ঘোষণা করলেন।

(খ) সংশয় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি—বেকন থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক দার্শনিকের চিন্তাধারাই সংশয় থেকে শুরু হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে রেনেশাঁস্-এর পর যে সমস্ত দার্শনিক-চিন্তা পশ্চিমে হয়েছে, তা সবই আধুনিক দর্শনের আওতায় পড়ে। এই বিচারে বেকন একজন আধুনিক দার্শনিক। বেকনের জন্মের আগে মধ্যযুগে য়ুরোপে যে সমস্ত দর্শন হয়েছে তার কোন একটিও বাইবেল আর চার্চের প্রভাব এড়াতে পারে নি। তখনকার দিনে পাদ্রীদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমস্ত দার্শনিক-

চিন্তা তাঁরাই নিয়ন্ত্রিত করতেন। তার ফলে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা যেন বাইবেলেরই নবভাষ্য। বাইবেলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার দুঃসাহস তখন কোন দার্শনিকেরই ছিল না। সেজন্য স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ মধ্যযুগীয় কোন দর্শনেই বিশেষ পাওয়া যায় না। বেকন এসে এই জাতীয় চিন্তাধারায় সংশয় প্রকাশ করলেন। বাইবেলে যা-ই আছে তা-ই অভ্রান্ত সত্য—এমন কথা মানতে তিনি রাজী ন'ন। তিনি বললেন, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যা সত্য বলে নির্ণীত হবে তা-ই যথার্থ সত্য। নির্মোহ মন নিয়ে দার্শনিককে তারই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করলেন বেকন। বিশ্বাসের স্থানে অভিজ্ঞতা দার্শনিক চিন্তায় স্থান পেল। অভিজ্ঞতায় যাকে সত্য বলে জানব তাকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হবে—এই হল বেকনের মূলমন্ত্র।

পরবর্তী কালে ডেকার্টের চিন্তায় এই সংশয় আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। যা কিছু সংশয় করা যায় তিনি তা-ই সংশয় করলেন। সংশয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন যেখানে সংশয় আর সম্ভব নয়। সংশয়-শেষে প্রাপ্ত সেই তত্ত্বের নাম দিলেন তিনি নিঃসংশয় সত্তা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুকে তিনি সংশয় করলেন। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্প দেখি তেমনি প্রত্যক্ষলব্ধ এই জগৎ ভ্রান্ত হতে পারে। স্মৃতি ত প্রত্যক্ষ থেকেই জন্মায়। প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তুর অনুপস্থিতিতে বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তির নামই ত স্মৃতি। প্রত্যক্ষ যদি ভ্রান্ত হয় স্মৃতিও নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে। কল্পনালব্ধ বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা যায়। সুতরাং ডেকার্টে কল্পনালব্ধ বস্তুকেও সংশয় করলেন। এমনি করে ডেকার্টে একে একে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ সমস্ত বস্তুকেই সংশয় করেছেন। তারপর ডেকার্টে বললেন, অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান পাই তাও সংশয় করা যেতে পারে। কোন দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে পড়ে যে অঙ্কশাস্ত্র আমরা গ্রহণ করিনি—তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং ডেকার্টের মতে অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষে ডেকার্টে বললেন—সব কিছু সংশয় করলেও সংশয়াত্মাকে কখনই সংশয় করা যায় না। সংশয়াত্মাকেই যদি সংশয় করা হয় তবে সংশয় করার কর্তা যে কেউ আর থাকবে না। সুতরাং সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় সত্তা বলে স্বীকার করতেই হবে। ডেকার্টের সমস্ত দার্শনিক-চিন্তা এই নিঃসংশয় সত্তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

কাণ্ট তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা সংশয় করেই নিজের স্বাধীন মত প্রচার করে-ছিলেন। লক, হিউম প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের[১] মতে আমাদের সমস্ত

১। Empiricists

জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। কাণ্ট এই মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত সাধারণ প্রতিজ্ঞার[১] জ্ঞান পেয়ে থাকি তা কখনই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। আর অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞানই নয়, এমন কথা ত বলা চলে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের[২] মতে ধারণা (idea) থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু কাণ্ট প্রশ্ন করলেন—শুধু ধারণা বলে কিছু আছে কি? সমস্ত ধারণাই ত কোন না কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা। সুতরাং শুধু ধারণা আমাদের কোন জ্ঞানই দিতে পারে না। ধারণা আর বস্তুর মিলন হলেই আমাদের জ্ঞান হয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাই আমরা বস্তু আর বুদ্ধি থেকে পাই ধারণা। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—এই দুই মিলেই আমাদের জ্ঞানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাণ্টের এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতবাদের সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

(গ) উপযোগিতা-বোধ থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক কালে একজাতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা উপযোগিতা-বোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জেমস্, ডিউই ও সীলার এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে এমন চিন্তাই করা উচিত জীবনে যার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। কোন্ বস্তু জীবনের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে—এই বিচারেই বস্তুর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব। দার্শনিক-চিন্তা মানুষকে জীবন-পথে চলতে সাহায্য করে; নানা বিপদে সার্থক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং দার্শনিক-চিন্তা এই উপযোগিতা-বোধ থেকে শুরু হবে।

(ঘ) জ্ঞান প্রীতি থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

পশ্চিমদেশে দর্শনের প্রতিশব্দ 'ফিলসফি'। 'ফিলস্' ও 'সোফিয়া'—এই দুটি গ্রীক শব্দ থেকে 'ফিলসফি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'ফিলস্' শব্দের অর্থ প্রেম বা প্রীতি। আর 'সোফিয়া' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান-প্রীতি। প্রাচীন গ্রীসে সোফিসট্স্ নামে একদল লোক ছিল। তারা সবার কাছেই নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে এদের থেকে আলাদা করবার জন্য নিজের

১। Universal Propositions

২। Rationalists

পরিচয় দিতেন জ্ঞান-প্রেমিকরূপে। সেই থেকেই দার্শনিক জ্ঞান-প্রেমিক আর দর্শন জ্ঞান-প্রেম বা জ্ঞান-প্রীতি বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

মানুষ বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। তাই বিশ্বের সমস্ত রহস্য জানবার আগ্রহ তার পক্ষে একান্তভাবেই স্বাভাবিক। জ্ঞানলাভ করবার এই আগ্রহশীলতাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মানুষের মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আগ্রহশীলতার ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। পশু যে জগতে জন্মেছে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তার নেই। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মানুষের মনে সর্বদাই জাগছে। কেন মানুষের মনে এত প্রশ্ন জাগে? এর একমাত্র উত্তর—জিজ্ঞাসাই মানুষের স্বভাব। যেদিন জিজ্ঞাসা থামবে সেদিন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকেই হয়েছে।

প্রত্যেকেই নিজেকে ভালবাসে। নিজের স্বভাব প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। জিজ্ঞাসা যেহেতু মানুষের স্বভাব, স্বতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার প্রেমে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে মানুষ আনন্দ পায়। স্বতরাং দার্শনিক-চিন্তা মানুষের অন্তরের আনন্দের ব্যাপার। যাকে আমি ভালবাসি, যাতে আমার আনন্দ হয়, তা জীবনের কোন্ ক্ষুদ্র প্রয়োজনে আসবে—তা কখনও ভাবি না। দার্শনিক-চিন্তাও জীবনের কোন্ কাজে লাগবে—তা ভাববার অবকাশও আমাদের নেই। চিন্তায় আনন্দ আছে, চিন্তা না করলে ভাল লাগে না—এই তো যথেষ্ট। এই যে কানন-কুন্তলা স্বন্দরী ধরণী আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এর উৎপত্তির ইতিহাস কি? ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার মত এই নবজাত শিশুটির জন্ম হল কেন? পাশের বাড়ির স্বগঠিতদেহ তরুণীটির অকালমৃত্যুরই বা কারণ কি? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরও আর একটা জীবন আছে? আকাশের এত তারা, গাছের এত ফুল ও ফল, দিনের ঐ সূর্য আর রাত্রির নিদ্রাহীন চন্দ্রকে সৃষ্টি করল কে? এ-জাতীয় কত প্রশ্নই মনে আসে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু চরম উত্তর আজও মেলেনি। মানুষ তাতে একটুও দুঃখিত নয়। এসব প্রশ্ন সে বারবারই করে—আর নিজের মত করে উত্তর দিয়ে আনন্দ পায়। বহু পুরাতন প্রশ্নের নূতন নূতন উত্তর বের করার মধ্যেই আনন্দ। আনন্দ মানুষকে প্রেরণা দেয়। তাই আনন্দ পায় বলেই মানুষ দার্শনিক-চিন্তা করে।

(৬) জাগতিক দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে দার্শনিক-চিন্তা বিস্ময়, সংশয় বা উপযোগিতা-বোধ থেকে জন্মলাভ

করে নি। এখানকার দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তির ইতিহাস একটু নূতন ধরনের। ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা যেন উপলব্ধি করেছেন—

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।"

এ সংসার এক মরুভূমি বিশেষ। এখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি জীবনের সমস্ত আনন্দ-রস নিয়ত শুষে নিচ্ছে। 'এ যে কান্না-ভরা, ঘেন্না-ধরা পৃথিবী।' এখানে অসাম্য, অসন্তোষ, আশাভঙ্গ, অত্যাচার, অবিচার মানুষের জীবনকে নিয়ত বিষিয়ে তুলছে। এই দুঃখের সাগর পার হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে—কেন এত দুঃখ। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা। তাই ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা দুঃখের কারণ আর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে দার্শনিক-চিন্তা জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দার্শনিকেরা বলেছেন—সত্যদৃষ্টির অভাবই দুঃখের জন্য দায়ী আর সত্যদৃষ্টিলাভ মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই নিত্যকালের ভারতীয় দার্শনিকের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

(অসৎ থেকে আমাকে সৎ-এ নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে, আর মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দাও।)

এই প্রার্থনার মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব

অনেক স্বল্পবুদ্ধি তথাকথিত বিষয়ী লোকেরই ধারণা—দর্শন উদ্ভট কল্পনা-বিলাস মাত্র। কতকগুলো স্বপ্নবিলাসী অকেজো লোক মিলে যুক্তির জাল বুনে চলেছে। জীবনের সঙ্গে এই যুক্তিজালের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এরা করে না। এদেরই নাম দার্শনিক। দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে এরকম শোচনীয় অজ্ঞতা যত শীঘ্র সমাজ থেকে দূর হয় ততই সমাজের মঙ্গল।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে দর্শন ধনোৎপাদনের ব্যাপারে

সরাসরি কোন সাহায্য করে না। কিন্তু ধনোৎপাদনকেই যদি একমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে না করি তবে দর্শন ধনোৎপাদনে সাহায্য করে না বলে তাকে প্রয়োজনহীন বলা চলে না। ধনের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এক-তাড়া নোট চিবিয়ে খাওয়া যায় না। টাকা দিয়ে আনন্দদায়ক অনেক বস্তু কেনা যায় বলেই তার দাম। সত্যের সন্ধান আর বস্তু-সত্তা আবিষ্কারের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার তুলনা নেই। দার্শনিক এই আনন্দের অধিকারী; কারণ সত্যের সন্ধান আর বস্তু-সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টাই তাঁর সাধনা। সুতরাং টাকা দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী আনন্দ কেউ কেউ যে দার্শনিক-চিন্তা থেকে পেতে পারেন তা অস্বীকার করা চলে না। জীবনে আনন্দ-প্রাপ্তিই যদি একমাত্র কাম্য হয় তবে যে দার্শনিক-চিন্তা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় তাকে প্রয়োজনহীন বললে চলবে কেন?

দর্শনের পক্ষে যে এইটুকুই বলবার আছে, তা নয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা—এ সমস্তই দার্শনিক-চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা, সাহিত্য, সংবাদপত্র ও মুখে মুখে সঞ্চারিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়ে দার্শনিক-চিন্তা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। আজকের খ্রীষ্টধর্ম যে অনেক মধ্যযুগীয় দার্শনিকের চিন্তা-দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আজকের দিনে সাধারণ লোকও যে বলে—মানুষকে কোন কর্মসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না; সরকার সাধারণ লোকের ভোট নিয়েই গড়ে উঠবে—এরও পেছনে কিন্তু দার্শনিক-চিন্তা কাজ করছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনেকাংশেই দার্শনিক জন লকের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জন লক্ কর্তৃক নির্দিষ্ট বংশানুক্রমিক রাজার স্থান অধিকার করেছেন এখানে প্রেসিডেন্ট। এইটুকুই ত তফাৎ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মানব-মুক্তির বাণী নিয়ে যে ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল তার মূলে দার্শনিক রুশোর যে কতখানি অবদান তা ভুললে চলবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতির ওপর দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক ফল প্রসব করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের উগ্র জাতীয়তাবাদ যে অনেকাংশে দুটো মহাযুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে, তা অস্বীকার করা দায়। কিন্তু মন্দ দর্শন যদি রাষ্ট্রনীতির ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে, তবে শুভ দর্শন রাষ্ট্রনীতির ওপর শুভ প্রভাব বিস্তার করবে না কেন? তা যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রনীতিকে

দর্শনের প্রভাব থেকে কখনই মুক্ত করা যায় না, একথা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতির ওপর প্রভাব-বিস্তারী দর্শন যাতে শুভ ও কল্যাণপ্রদ হয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জার্মানরা যদি নাজী রাষ্ট্রদর্শনের আওতায় না আসত তবে বোধ হয় পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত ও অনেক শোক-সন্তাপই বন্ধ করা সম্ভব হত।

দর্শন যদি রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে তবে শুভ দর্শনের আওতায় যে শুভরাষ্ট্র গড়ে উঠবে তাতে যে ধনোৎপাদনের ব্যাপারে একেবারেই সাহায্য হবে না—একথাই বা বলি কি করে? আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে আমরা যে কত শুভ ফল পেয়েছি তার সত্যিই হিসেব নেই। এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পেছনেও যে একটা দর্শনের পটভূমিকা আছে, তা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে কার্যকারণ-সম্পর্কিত ধারণা-রূপান্তরের একটি বিশেষ স্থান আছে। কার্যকারণ-সম্পর্কিত ধারণা দর্শনের আলোচনার বিষয়। এইদিক থেকে সভ্যতার অগ্রগতিতে দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে যে একটি কথা আছে তা কিন্তু দর্শনবিশেষ, আর দার্শনিকেরাই একথার পত্তন করেছেন।

দর্শন সভ্যতার অদৃশ্য পটভূমিকা রচনা করে থাকে। জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী একটি বিশেষ সভ্যতার কাঠামো তৈরী করে। আর জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিকেরই সৃষ্টি। সুতরাং একটি বিশেষ সভ্যতার ওপর দর্শনের প্রভাব মোটেই তুচ্ছ নয়। দর্শন যত বলিষ্ঠ ও উদার হবে—সভ্যতাও তত বলিষ্ঠ ও উদার হয়ে উঠবে। দার্শনিক-চিন্তার অগ্রগতির মানই একটি বিশেষ সভ্যতার মহত্ত্বের মান সূচনা করে। যে দেশে দার্শনিক-চিন্তা যত উন্নত, সে দেশের সভ্যতাও ততই উন্নত।

ধর্মবোধ, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, নীতিবোধ সবই দার্শনিক-চিন্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একটি বিশেষ দেশের ধর্ম, নীতি ও ঈশ্বরতত্ত্ব সেই দেশের বিশেষ দর্শনেরই ছাপ প্রকাশ করে। জড়বাদী দর্শনের দেশে লোক স্বাভাবিক-ভাবেই ধর্মবিষয়ে নাস্তিক আর নীতি-ব্যাপারে সুখবাদী হয়ে থাকে। যে দেশের দর্শন অধ্যাত্মবাদমূলক, সেখানে ধর্মে আস্তিকতা আর নীতি বিষয়ে বৈরাগ্যবাদই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কেউ কেউ বলেন, আজকের দিনে দর্শনের আর কোন দরকার নেই। বিজ্ঞানই এখন দর্শনের কাজ করতে পারে। কিন্তু আমরা বলি—বিজ্ঞান

কখনই দর্শনের স্থানে অভিষিক্ত হতে পারে না। মানুষের আত্মার স্বরূপ কি? জগতের কোন উদ্দেশ্য আছে কি? আমরা কি অর্থে স্বাধীন?—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান কখনই দিতে পারে না। দর্শন এসব প্রশ্নের চরম উত্তর দিতে পারে, এমন কথাও আমরা বলছি না। কিন্তু এসব প্রশ্নের আদৌ উত্তর দেওয়া যায় কিনা, আর দেওয়া গেলে উত্তর কি হবে—এসব নিয়ে আলোচনা যে দার্শনিক করেন, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রত্যেক বিজ্ঞান কতকগুলো কথা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়। দার্শনিক এই কথাগুলোর যুক্তিযুক্ততা বিচার করেন। আজকের বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সম্ভবই হত না যদি প্রখ্যাত দার্শনিকদের চিন্তা থেকে বিজ্ঞানীরা সাহায্য না নিতেন। গত তিন শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের যে যান্ত্রিক ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে, তার স্রষ্টা দার্শনিক ডেকার্টে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে। আজ যদি বিজ্ঞানকে নূতন ধারণা নিতে হয় তবে সে তা দার্শনিকের কাছ থেকেই নেবে।

অন্যদিক থেকেও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। দার্শনিক-চিন্তা মানুষের বুদ্ধি বিমল ও মার্জিত করে। বিভিন্ন সমস্যার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে দর্শন মানুষকে সজাগ করে দেয়। চট্ করে কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়—এই হচ্ছে দর্শনের শিক্ষা। নির্মোহ মন নিয়ে সমস্ত কিছুই বিচার করতে হবে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যা সত্য বলে নির্দিষ্ট হবে তা-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। কোন উচ্ছ্বাস, কোন ভাবপ্রবণতা যেন আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে সে দিকে সর্বদা আমাদের নজর রাখতে হবে। এরকম মানসিকতার নাম বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। দর্শন এই দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা মানুষকে শিখিয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হলে আমাদের সমাজের অনেক অসাম্য, অসন্তোষ ও অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব হবে। সুস্থ, সবল মানসিকতার ওপর এক নূতন সমাজ গড়ে উঠবে—সেখানে অত্যাচার, অবিচার, মনুষ্যত্বের পরাভব, শুভবুদ্ধির পরাজয় কিছুই আর থাকবে না। নূতন আলোর দেখা পাব আমরা। মুক্তির মন্দিরে আমাদের জীবনের নূতন অভিষেক হবে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ থাকবে না, কারণ ভুল বোঝার সুযোগই এখানে নেই, আর ভুল বোঝার জন্যই যত রকমের কলহ হয়ে থাকে। সবাই যখন যুক্তির নির্দেশে চলবে তখন অন্যায় লোভ ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা কারুরই থাকবে না। অন্যায় লোভ ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা থেকেই যুদ্ধের উৎপত্তি।

সুতরাং তখন যুদ্ধের অশান্তির উপর শান্তির যবনিকা নেমে আসবে। আর সব চেয়ে বড় কথা, সার্থক গণতন্ত্র সত্যি সত্যি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। দেশের শুভাশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে যদি সত্য ধারণা না থাকে, তবে কোন্ দল দেশের ও দশের সব চেয়ে বেশী উপকার করতে পারবে—তা বোঝা মুশকিল। আর তা বোঝা না গেলে কোন্ দলকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত তাও বোঝা যাবে না। তার ফলে হয়ত দেশের কল্যাণ ব্যাহত হবে। সেই জন্যই হোয়াইট্‌হেড্ বলেছেন—সাধারণ শিক্ষায় যতদিন পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকবে ততদিন সার্থক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবে না।

অবশ্য একথা ঠিক যে অধিকাংশ লোকই দর্শনের যে সমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা শোনে তা দিয়ে পরিচালিত হয় না। যদি পরিচালিত হত তবে এতদিনে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠত। সে যাই হোক না কেন—দার্শনিক-চিন্তার শুভফলকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। কেউ যদি উচ্চ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাতে উচ্চ আদর্শের হীনতা সূচিত হয় না, বরং ব্যক্তি-বিশেষেরই দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

সর্বশেষে আমরা বলব—দার্শনিক-চিন্তা আমাদের বিশেষ বিশেষ উপকারে আসে বলেই তা শ্রদ্ধেয়, একথাও ঠিক নয়। দার্শনিক-চিন্তার মধ্যে আত্মার আনন্দ আছে, এই ত যথেষ্ট কথা। মানুষ ত পশু নয়। বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে সে অজ্ঞানের অন্ধকারে বুদ্ধির মশাল জালিয়ে পথ বেয়ে চলবে—এই ত স্বাভাবিক। এই পথ চলায় কি লাভ হবে—সেটা বড় প্রশ্ন নয়। মানুষ পথ চলবে চলার আনন্দেই। দার্শনিক-চিন্তার ফল কি হবে—এটা বিচার্য নয়। দার্শনিক-চিন্তার মধ্যে আত্মার আনন্দ আছে, চিত্তের তৃপ্তি আছে, অন্তরের প্রশান্তি আছে—এই কথা স্বীকার্য। মানুষ শুধু দেহবিশিষ্ট জীব নয়। মন বলেও তার একটা পদার্থ আছে। দেহের ক্ষুধা মিটলেই যে তার মনের ক্ষুধা মেটে না। সেজন্যই সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজও করে। বিষয়ী লোকেরা হয়তো তাকে বলবে—'অকাজের কাজ'। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে চিত্তের পরম প্রশান্তির বিশেষ মুহূর্তে মানুষ যে অকাজের কাজ করেছে তারই ফলে দুনিয়ায় যত কাজের কাজ হয়েছে। বিজ্ঞানের যত বিস্ময়কর আবিষ্কার তার সকলেরই পেছনে এই একই ইতিহাস। সুতরাং সত্য সন্ধানের চেষ্টা তুচ্ছ নয়—হাস্যাস্পদ নয়—একথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে—কোন একটা

বিশেষ ধারণা থেকে সুফল পাওয়া যায় বলেই তা সত্য নয়—তা সত্য বলেই তা থেকে সুফল পাওয়া যায়। সত্য স্বতঃভাস্বর, স্বয়ংসাধ্য। যে দার্শনিক সেই সত্যানুসন্ধান করেন—সন্ধানের মধ্যেই তিনি তার পুরস্কার পান। সুতরাং দার্শনিক-চিন্তার যে একটা নিজস্ব মূল্য আছে তা কোন অংশেই হেয় বা তুচ্ছ নয়।

দর্শন ও বিজ্ঞান

জগৎ ও জীবনের রহস্যভেদের জন্যই দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি। সাধারণভাবে যা দুর্বোধ্য বা অজ্ঞেয় বা জটিল তাকে সহজবোধ্য, জ্ঞেয় ও সহজ করাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কাজ। আমরা যা সহজে বুঝি না তার একটা ব্যাখ্যা পেলে খুশী হই। জগৎ ও জীবনের জটিলতার আর শেষ নেই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিয়ে তার জটিলতা সহজ করার চেষ্টা করেন। সুতরাং জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক একই পথের যাত্রী। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক যেখানে এসে থেমে পড়েন, দার্শনিক সেখানেই থামেন না। তিনি আরও দূরের যাত্রী।

বৈজ্ঞানিক জগৎ ও জীবনকে আলোচনার সুবিধের জন্য কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নেন। পদার্থবিদ্যা শুধু পদার্থের ব্যাখ্যা নিয়েই ব্যস্ত আর জীববিদ্যা জীবের নানা জটিলতার রহস্যভেদের কাজেই মেতে আছে। এরকম করে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা নিয়ে সর্বদাই মশ্গুল। সেজন্যই বিশেষ বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানকে বলে বিজ্ঞান।

আমরা জানি কতকগুলো বিষয়কে যদি একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায় তবে সেই বিষয়গুলোর একটা ব্যাখ্যা আমরা পেয়ে থাকি। আম মাটিতে পড়ে, জল নীচে গড়িয়ে যায়—এমন কতই ত প্রতিনিয়ত দেখছি। এ সমস্ত বস্তুর নীচে নামার রহস্যই কিন্তু এক মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। পদার্থবিদ্যা ত তাই করছে। এমনিভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানই বিভিন্ন নিয়ম দিয়ে বহু খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও বস্তুকে ব্যাখ্যা করার কাজে এগিয়ে চলেছে। জীববিদ্যায় বংশপ্রভাবের নিয়ম[১], পদার্থবিদ্যায় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানে আপেক্ষিকত্বের নিয়ম—এমন ধারার কত নিয়মই ত বিভিন্ন বিজ্ঞানে আছে।

১। 'বংশপ্রভাবের নিয়ম' এর ইংরাজী নাম The Law of Heredity। আমরা সাধারণতঃ পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে দেখতে পাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পুত্রকন্যাদের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য এক বংশপ্রভাবের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। বংশপ্রভাবের নিয়ম

জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা হবে তখনই যখন কোন একটা বিশেষ নিয়ম বা তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক এই চরম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা কখনই করেন না। তিনি জগৎ ও জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন নিয়ম স্থাপন করেন। কিন্তু এই বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে আর একটা বৃহত্তর নিয়ম বা শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন না। সেজন্যই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যেন মাঝপথে এসেই থেমে পড়ে।

দর্শনের ব্যাখ্যা করার কায়দাই যেন আলাদা। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে নেন না। তিনি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ ও জীবনের পূর্ণচিত্র নিয়ে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। জড়বাদী দার্শনিক এক জড় তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। অধ্যাত্মবাদী এক অখণ্ড অধ্যাত্ম-তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যার প্রয়াস করেন। সেজন্যই দার্শনিকের যে ব্যাখ্যা তা যেন বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যার চেয়ে গভীরতর ও দূরগামী। শুধু তাই নয়। বৈজ্ঞানিক ত জগৎ ও জীবনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েই খালাস। কিন্তু ব্যাখ্যার স্বরূপ কি? কতটুকু ব্যাখ্যা সম্ভব? এমন কি কোন বস্তু আছে যার ব্যাখ্যা করাই যায় না?—এরকম প্রশ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক কখনই আলোচনা করেন না। এসব প্রশ্ন কিন্তু দার্শনিকের আলোচনার বিষয়। তারপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক কথাই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন। জড়, প্রাণ, মন, দেশ, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যার কাজ শুরু হয়। দার্শ[illegible] কন্তু এসব ধরে নেওয়া তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সুতরাং এদিক থেকেও দার্শনিকের কাজ বৈজ্ঞানিকের কাজের চেয়ে সুদূরপ্রসারী।[১]

অনুসারে পূর্বপুরুষদের প্রভাব উত্তরপুরুষদের মধ্যে বর্তায়। মনোবিজ্ঞানে আপেক্ষিকত্বের নিয়ম বলতে মনন (thinking), অনুভূতি (feeling) ও কৃতি (willing)—মনের এই তিন বৃত্তির পরস্পর সাপেক্ষতা বোঝায়। আমরা সাধারণতঃ যে ব্যক্তির মননশক্তি খুব প্রবল তার অনুভূতি ও কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বলই দেখতে পাই। আবার অনুভূতির প্রবলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনন ও কৃতির অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা সূচনা করে। কৃতি যেখানে প্রবল সেখানে মনন ও অনুভূতির স্বল্পতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

১। অত্যন্ত আধুনিককালে নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivist) নামে একদল দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো একত্র করা বা সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কোন সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা দর্শনের কাজ নয়; বিভিন্ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষার নৈয়ায়িক বিশ্লেষণই দর্শনের একমাত্র কাজ। সুতরাং এঁদের মতে, দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাকরণ: বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান কখনই অভিন্ন নয়। উৎসাহী পাঠক এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার জন্য কারনপ্ লিখিত 'Logical Syntax of Language' এবং 'Philosophy and Logical Syntax' গ্রন্থ দুটি পাঠ করতে পারেন।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদও লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সত্যতা পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়। দার্শনিক ব্যাখ্যার সত্যতা কিন্তু এভাবে কখনই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যে দার্শনিক ব্যাখ্যা তর্ক-বিজ্ঞানের কোন নীতি ভঙ্গ করে না অর্থাৎ যা যুক্তিযুক্ত আমরা মোটামুটি তাকেই সত্য বলে ধরে নিই। কোন একটা বিশেষ বিষয়ে একাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নয়। একটা বিশেষ যুগে সব বৈজ্ঞানিকেরা একটা বিশেষ বিষয়ের একরকম ব্যাখ্যাই দেন। যদি অন্য কোন ব্যাখ্যা পরীক্ষায় এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় তখন আগের ব্যাখ্যা সর্বৈব মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করতে হয়। দর্শনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিন্তু একথা কখনই বলা চলবে না। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়।[১] সেজন্যই অনেকে মনে করেন বিজ্ঞানে যে অর্থে জ্ঞান পাওয়া যায় দর্শন সে অর্থে কখনই জ্ঞান দিতে পারে না। বিজ্ঞানের একটা বিশেষ তত্ত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হবেই হবে, নতুবা তাকে গ্রহণই করা যাবে না। দর্শনে কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোন তত্ত্বই পাওয়া যাবে না। অনেকের মতে যা সর্বজনগ্রাহ্য তা-ই জ্ঞান। সে অর্থে বিজ্ঞানই জ্ঞান দেয়, দর্শন দেয় না।

একটা বিশেষ অর্থে দর্শন আর বিজ্ঞান কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। দর্শন যখন জড়, প্রাণ ও মনের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তখন এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো দার্শনিকের জানা প্রয়োজন। আসলে দার্শনিক জড়, প্রাণ ও মনের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর দার্শনিক মূল্য বিচার করে থাকেন। সুতরাং এই দিক থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না পেলে দার্শনিক আলোচনাই হতে পারে না। এই অর্থে দর্শন বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু আর একদিক থেকে বিজ্ঞান আবার দর্শনের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান জড়, প্রাণ, মন, দেশ, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব ধরে নিয়েই এদের

১। ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য তাঁর 'Alternative Standpoints in Philosophy' নামক পুস্তকে জ্ঞানের বিষয়ের ব্যাখ্যাতা হিসেবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) ও ভাববাদ (Idealism) উভয় মতবাদেরই যৌক্তিকতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। উৎসাহী পাঠক ডক্টর ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থ পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে। এদের সত্য-স্বরূপ নির্ণয়ের ভার দার্শনিকের ওপর। শুধু তাই নয়। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু এর চরম তাৎপর্য নির্ণয় করেন দার্শনিক। জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক কাজ শুরু করেন। দার্শনিক এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আলোচনা করেন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কতকগুলো মৌলিক তফাৎও আছে। বিজ্ঞান আঙ্কিক সূত্র (mathematical formula) দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। পদার্থ-বিজ্ঞানকে আজকের দিনে সেরা বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। উচ্চতর গণিতশাস্ত্র আর উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞান আজ প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল আঙ্কিক সূত্র দিয়ে প্রকাশ করেন। বিশ্বসংসারে কোন একটা বিশেষ বস্তুর স্থান ও মূল্য কি—এ আলোচনা কোন বৈজ্ঞানিকই সাধারণতঃ কখনও করেন না। বস্তুর স্বরূপ-বিশ্লেষণই বৈজ্ঞানিকের কাজ, তার মূল্য-নির্ণয় নয়। দার্শনিক মনে করেন, কোন একটা বস্তুর মূল্য-নির্ণয় না করলে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কখনই দেওয়া হয় না। সেজন্য বস্তুস্বরূপ ও বস্তুমূল্য-নির্ণয় উভয়ই দার্শনিকের কাজ। দর্শন জগৎ ও জীবনের চরম মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে।

বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মানুষ শুধু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবই নয়। তার অনুভূতি আছে, ইচ্ছারও প্রবলতা আছে। মানুষের সমগ্র মনের তৃপ্তির জন্য তার বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছার পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রয়োজন। বিজ্ঞান সত্যলাভের চেষ্টা করে। তাতে মানবমনের আংশিক তৃপ্তি হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না। দর্শন মানবমনের পূর্ণ প্রশান্তি এনে দেয়। বুদ্ধির তৃপ্তি সত্যপ্রাপ্তিতে। অনুভূতির প্রশান্তি কিন্তু সুন্দর লাভে। যা কিছু সুন্দর অনুভূতি তাকেই পেতে চায়। মানুষের কৃতি বা ইচ্ছা কল্যাণকর্মে আনন্দ পায়। যা ভালো তা করেই ত মানুষের সুখ। দর্শন এই সত্য-শিব (বা কল্যাণ)-সুন্দর তিনেরই আলোচনা করে থাকে। তাই কেবলমাত্র সত্য-সাধক বিজ্ঞান অপূর্ণ; সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধক দর্শন সত্যিই পূর্ণ।[১]

১। দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর একীকৃত রূপই দর্শন (Philosophy is the synthesis of the sciences)। হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতবাদে বিশ্বাসী। আমাদের মনে হয়, এই মতবাদ আদৌ যুক্তি-গ্রাহ্য নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে একীকৃত করতে হলে সমস্ত বিজ্ঞানেরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন দার্শনিকের পক্ষেই এরকম বিস্তৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি তাঁর দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞানকে একত্রিত করবেন, এমন উদ্ভট আশা পোষণ করা যায় না।

দর্শন ও ধর্ম

দর্শন ও ধর্ম—এই দুয়ের মূলে রয়েছে সত্যসন্ধান-প্রবৃত্তি। চরম সত্যকে জানবার চেষ্টাই দার্শনিক ও ধার্মিককে প্রণোদিত করে। কিন্তু এই সত্যসন্ধানের প্রণালী দর্শনে আর ধর্মে এক নয়। দার্শনিক যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে জানতে চেষ্টা করেন আর ধার্মিক অনুভূতির গভীরতায় সত্যকে লাভ করার জন্য আকুল হন। ধার্মিকের কাছে যুক্তিতর্কের বিশেষ স্থান নেই। তিনি বলেন—'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর'। বিশ্বাস, অনুভূতি, অন্তরের আন্তরিকতা—এ-সবই হচ্ছে ধর্মের প্রাণ। দর্শনে কিন্তু যুক্তিপারম্পর্য, বিচার আর মোহমুক্ততাই মুখ্য কথা। মোহমুক্ত মনে দার্শনিককে সত্যের বিচার করতে হয়। ধর্মে প্রেম, ভক্তি আর শ্রদ্ধা দিয়েই প্রেমের ঠাকুরকে জীবনের সত্য বলে পেতে হয়। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় দর্শনে তার কোন স্থান নেই। ধর্মের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে না।

দর্শনের কোন আনুষ্ঠানিক দিক নেই। দর্শন জ্ঞান-চর্চা, কিন্তু ধর্ম জীবন-চর্যা বিশেষ। অনুষ্ঠান বাদ দিলে ধর্মের অঙ্গহানি হয়। কিন্তু দার্শনিকের পক্ষে কোন অনুষ্ঠানই প্রয়োজনীয় নয়। ধর্মের প্রকাশ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পূজাপার্বণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দৈহিক পীড়ন, বিভিন্ন অঙ্গাভরণ, নৃত্য ও গীত ধর্মের অঙ্গ বলে গৃহীত হয়। দর্শনের সঙ্গে কিন্তু কোন পূজাপার্বণের সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। কোন অঙ্গাভরণ, নৃত্য বা গীত দর্শনের অঙ্গও নয়।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই বদলায়। টলেমি সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন আজকের দিনে তা আর কেউ সত্য বলে মনে করে না। এমন ধারার মত পরিবর্তন সব বিজ্ঞানেই আছে। এই পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো একত্রিত করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আজ সমস্ত বিজ্ঞান একত্রিত করে যা পাব, তা আর কাল হয়ত পাব না। এর ফলে দর্শনও বিজ্ঞানের মত পরিবর্তনশীল হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। কালকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন অনেক সময় আজকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়, তেমনি আজকের দর্শন কালকে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। তখন আজকের দর্শনের আর বিশেষ কোন মূল্যই থাকবে না। কিন্তু আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় না। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন দর্শনকেই অনেক সময় সমর্থন করা যায়। সুতরাং দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের একত্রিত রূপ বলা যায় না।

দর্শন বিজ্ঞানের মত আংশিক দৃষ্টি দিয়ে পরিচালিত হয় না—একথা সত্য। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে তাদের আলোচনা করে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, একথাও ঠিক। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলোকে যান্ত্রিকভাবে একত্রিত করলেই প্রকৃতির কোন সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় না। এই সামগ্রিক রূপ দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দর্শন কখনই বিভিন্ন বিজ্ঞানের একীকৃত প্রকাশ হতে পারে না।

দার্শনিক একটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে সত্যকে জানতে চেষ্টা করেন। ধার্মিক সত্যকে শুধু জেনে খুশী নন, তিনি তাকে হৃদয়ের সমস্ত আকুতির মধ্যে একান্তভাবে আপনার করে পেতে চান। ধার্মিকের কাছে সত্য যেন 'আমার সত্য' হয়ে দেখা দেয়। দার্শনিকের সত্যের রূপ কিন্তু সার্বজনীন ও একান্তভাবে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

সাধারণভাবে ধর্মের একটা নৈতিক ভিত্তি থাকে। কতকগুলো নৈতিক নিয়ম প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই অঙ্গবিশেষ। পৃথিবীর দুটো বিশিষ্ট ধর্ম—বৌদ্ধ আর জৈন ত মুখ্যতঃ নীতির ধর্মই বটে। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে নৈতিক জীবনই ধার্মিক জীবন। বুদ্ধদেব ধর্মজীবনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ ত কতকগুলো নীতি উপদেশমাত্র। বৌদ্ধধর্ম নীতি-উপদেশমূলকই বটে। জৈনেরা সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান আর সম্যক্ চরিত্র রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং জৈনধর্মও যে নীতিমূলক তা অস্বীকার করা যাবে না। দর্শনে কিন্তু ধর্মের মত কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। দর্শন করতে গেলেই যে কতকগুলো নীতির

আরও কথা, দর্শন কখনই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি একত্র করার চেষ্টা করে না, বরং বিজ্ঞানের পূর্ব স্বীকৃতিগুলির (presuppositions) তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলেই একথার সত্যতা জানা যায়।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে ইউইং১ যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলেছেন, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য দু'দিক থেকে বোঝা যায়—(১) দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর সার্বিক (general) এবং (২) দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনার পদ্ধতি এক নয়।

(১ A. C. Ewing : The Fundamental questions of Philosophy গ্রন্থের ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর সার্বিক বা ব্যাপকতর একথার অর্থ এই নয় যে, দর্শন সমস্ত বিজ্ঞানের সমাহার। দর্শন যে সমস্ত বিজ্ঞানের সমাহার হতে পারে না, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে প্রশ্ন হবে—দর্শন কি অর্থে বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপকতর? আমাদের মনে হয়, বিভিন্ন বিজ্ঞানের পূর্ব-স্বীকৃতিগুলি দর্শনের আলোচ্য বলে দর্শনকে বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপকতর বলা যায়। দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টিও দর্শনের ব্যাপকতার জন্য দায়ী। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা, নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান দর্শনেরএকটি কাজ বলে স্বাভাবিকভাবেই দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপকতর। আরও বলা যায়, দর্শনের আলোচ্য সত্য শিব ও সুন্দর তিনই। কিন্তু, বিজ্ঞানের আলোচ্য শুধু সত্য। তাও আবার অখণ্ড সত্য বিজ্ঞানের আলোচ্য হতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের খণ্ড সত্য নিয়ে আলোচনা করে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক সত্য দর্শনের আলোচ্য, বিজ্ঞানের নয়। এই কারণেও দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপকতর।

নিয়ম মেনে চলতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু ন্যায়ের নিয়ম (Laws of Logic) না মানলে কোন দর্শনই হবে না। ধর্ম অবশ্য সাধারণতঃ কোন ন্যায়ের নিয়মই মেনে চলে না। সুতরাং দর্শন আর ধর্ম কখনই এক হতে পারে না।

তবে ধর্মের বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা আলোচনা করা যেতে পারে। অথবা ধর্মীয় জীবনের মূলে যে সমস্ত প্রত্যয় বর্তমান তা বিশ্লেষণ ও বিচার করা যেতে পারে। এর ফলে ধর্ম-দর্শনের (Philosophy of Religion) সৃষ্টি হয় এবং ধর্ম-দর্শন দর্শনেরই একটি শাখা।

দর্শন ও কাব্য

কাব্য মুখ্যতঃ অনুভূতি ও রসের ব্যাপার। কবি হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেন তা-ই তিনি কাব্যের রসঘন ভাষায় আর একটি সহৃদয় লোকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। অনুভূতি ও আবেগ কাব্যের উৎস; রসিক পাঠক তার বিচারক। যার রসবোধ নেই কবি তার জন্য কখনই কাব্য রচনা করেন না। নিত্যকালের কবি নিত্যই প্রার্থনা করেন, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি

আলোচনার পদ্ধতির দিক থেকেও দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বর্তমান। বিজ্ঞান সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-ভিত্তিক আরোহাত্মক অনুমান (Inductive generalisation on the basis of observation and emperimetation) অনুসরণ করে। সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই আলোচনার এই পদ্ধতি অনুসৃত। কিন্তু দর্শনে আলোচ্য কতকগুলি প্রত্যয় (concept) বলে এখানে এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে না। দর্শনে আমরা বিশ্লেষণ, বিচার ও মননের পথে অগ্রসর হই। দর্শনের জগৎ ও জীবনের ভিত্তিস্থানীয় প্রত্যয় (Basal or Fundamental or structural concepts of life and the universe) বিশ্লেষণ করা হয়, বিচার করে তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় এবং সবই করা হয় মননের সাহায্যে।

অনেকে বলেন, গণিতেও ত মননাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সেখানে অবরোহানুমানই (Deduction) মুখ্য অবলম্বন, অবরোহানুমান অনুপস্থিত। তা হলে গণিত শাস্ত্রের পদ্ধতিই দর্শনে অনুসৃত হয়, এমন কথা বলা যেতে পারে।

দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে স্পিনোজার মত কোন কোন দার্শনিক জ্যামিতিক পদ্ধতি (Geometrical method) দর্শনে অনুসরণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে যে তাঁরা খুব সার্থকতা লাভ করেছেন, এমন বলা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রায়ই গাণিতিক স্পষ্টতা ও ঋজুতা বজায় রাখতে পারে না। একই শব্দ কখনও কখনও বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। সেজন্য গাণিতিক পদ্ধতি দর্শনে অনুসৃত হতে পারে না।

তা ছাড়া গণিতের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য, নিশ্চিত নয়। এতেও বোঝা যায় যে, গণিতের নিশ্চয়াত্মক অবরোহ পদ্ধতি দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যদি হত তবে দর্শনের সিদ্ধান্তও নিশ্চিত হত।

তবে এসব সত্ত্বেও অনেক দার্শনিকই যেমন অতীত কালে গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং এখনও করেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

মা লিখ মা লিখ। যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে দর্শনের উৎপত্তি। দার্শনিকের আবেদনও মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নয়, বুদ্ধির দরবারে।

কবি অনুভব করেন, আর তাঁর অনুভূতি মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেন। কবির কবিত্ব যতখানি প্রকাশের মাধুর্যে ও স্বচ্ছতায়, ততখানি কিন্তু ভাবের গভীরতায় নয়। দার্শনিকের পরিচয় তাঁর ভাব-প্রকাশের ক্ষমতায় নয়, চিন্তার মৌলিকতায় ও যুক্তির অনবদ্যতায়।

কবি জগৎ ও জীবনের স্পন্দন আপনার অনুভূতিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় যিনি যত সফল হন তিনিই তত সার্থক কবি। দার্শনিক বুদ্ধি দিয়ে জগৎ ও জীবনের জটিলতার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেন। এই কাজে যিনি যত এগিয়ে গেছেন, তিনি তত বড় দার্শনিক বলে খ্যাতি পেয়েছেন।

কবি কল্পনার রঙ্ বুলিয়ে জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। যা সহজ, সাধারণ ও একান্তভাবেই একঘেয়ে কবি তার মধ্যে অলৌকিকতার রূপ ফুটিয়ে তোলেন। দার্শনিক পুরাতন জিনিসকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে চেষ্টা করেন। তিনি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে জগৎকে কখনও রচনা করার চেষ্টা করেন না, বরং একান্ত নির্লিপ্তভাবে জগতের নিজস্ব রূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন।

কবি ভাষায় ছবি আঁকেন। বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনায়ই কবির কবিত্ব। জগতের একটা আলঙ্কারিক ও অতিপ্রাকৃত রূপ সাধারণতঃ কাব্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। দর্শনে ছবির কোন স্থান নেই, ব্যঞ্জনা এখানে গঞ্জনা বিশেষ। বুদ্ধিতে জগতের যে সহজ রূপ প্রকাশিত হয়—তাই দার্শনিকের আলোচনার বিষয়।

কবি বিশ্বসংসারে সুন্দরকে খুঁজে বেড়ান। নর ও নারীতে, মাটিতে ও আকাশে সর্বত্রই তিনি সুন্দর দেখতে পান। তাঁর চোখে কালোরও আলো আছে। কবির দৃষ্টিতে সুন্দরই সত্য আর সত্যই সুন্দর। দার্শনিক যুক্তি দিয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেন। সত্যস্বরূপের পরিপূর্ণ রূপ তাঁর কাছে শুধু সুন্দর নয়, শিবও বটে।

পেরী দার্শনিক-কবি আর কবি-দার্শনিকের মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে যে সমস্ত কবি তাঁদের কাব্যে দার্শনিক চিন্তার আমদানী করেছেন, তাঁরা সত্যিকারের দার্শনিক-কবি। মিল্টন, ডান্টে, গ্যেটে, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, ব্রাউনিং প্রভৃতি এই পথের পথিক। ডান্টে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি'তে

জগতের উপাদান, মানুষের উৎপত্তি ও ভাগ্য, পাপের উদ্ভব ও নিবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয় সম্পূর্ণভাবেই দার্শনিকের। মিল্টনও পাপের উৎপত্তি আর ঈশ্বরের কৃপায় পাপের নিবৃত্তি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। গ্যেটে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির কথা বলেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে জীবন্ত নারীমূর্তিরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক কবিকে অভিভূত করেছে। ব্রাউনিং ঈশ্বরে চরম বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই সব কবির কাব্যে দার্শনিক ভাবের ছড়াছড়ি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মতে—এঁরা কবি, দার্শনিক নন। কারো দার্শনিক ভাব থাকলেই কবি দার্শনিক হন না, তাঁর দার্শনিক মেজাজ থাকা চাই। যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে দার্শনিক ভাব পাই, তা-ই সত্যিকারের দর্শন। কাব্যে যুক্তিতর্ক নেই। সুতরাং তা দর্শন নয়। আর যুক্তিতর্ক থাকলে কাব্য দর্শন হবে বটে, কিন্তু তা কাব্য হবে না।

প্লেটো আর হেগেলকে বলা হয় কবি-দার্শনিক। এঁরা এঁদের দার্শনিক-চিন্তা কাব্যের মত মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এঁদের লেখা সত্যিই বড় মধুর। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্লেটো আর হেগেলের কৃতিত্ব কিন্তু ভাষায় বা বর্ণনায় নয়, তাঁদের ভাবগাম্ভীর্যে। আর এই ভাব যুক্তিতর্ককেই বাহন করেছে। লেখায় তাঁদের কাব্য-গুণ উপরি পাওনামাত্র। সুতরাং দার্শনিক শুধু কবি হলে তাঁকে কিন্তু দার্শনিক বলব না। দার্শনিক-চিন্তার সঙ্গে যাঁর কাব্যগুণ থাকে তাঁকে দার্শনিক হিসেবে নয়, দর্শনের লেখক হিসেবে একটু শ্রদ্ধা করব বৈকি। দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবেই দার্শনিক ভাবের ওপর, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতার ওপর নয়।

তবে কাব্যের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করলে কাব্য-দর্শন বা Poetics-এর সৃষ্টি হয়। কাব্য-দর্শন দর্শন শাস্ত্রেরই শাখা। সংস্কৃতে আমরা তাকে অলঙ্কার শাস্ত্র বলি।

দর্শনের প্রচলিত বিভিন্ন সংজ্ঞার্থের বিচার

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ-কারবার করি তাদের যৌক্তিকতা-বিচার ও মূল্যাবধারণই দর্শন। আমরা একথা বিশ্লেষণ করেছি এবং দর্শনের সংজ্ঞার্থরূপে একেই যথার্থ

বলে গ্রহণ করেছি। এবার আমরা এই সংজ্ঞার্থের আলোতে দর্শনের প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞার্থের যাথার্থ্য বিচার করবো।

১। কাণ্ট বলেছেন, দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান ও বিচার বোঝায় (Philosphy is the science and criticism of Cognition.)। এই সুরেই ফিক্‌টে বলেছেন, দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান (Philosophy is the science of Knowledge.)। এই দুটি সংজ্ঞার্থেই দর্শনকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর সমার্থক বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের একটি অঙ্গ মাত্র, এর আরও তিনটি অঙ্গ আছে। সুতরাং এ সংজ্ঞার্থ তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষায় সংকীর্ণ (Too narrow)। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। দর্শন যে সাধারণ বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন, একথা সুস্পষ্টভাবেই এ সংজ্ঞার্থে প্রকাশিত হয়েছে। কোন সাধারণ বিজ্ঞানেরই আলোচনার বিষয় জ্ঞান নয়, কিন্তু দর্শন জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। দর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে জ্ঞান যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জ্ঞানই দর্শনের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়।

২। অত্যন্ত প্রাচীন কালে প্লেটো এবং আরিস্টটল দর্শনের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছিলেন। প্লেটো বলেন, শাশ্বত এবং বস্তু-স্বরূপ-এর জ্ঞানলাভ দর্শনের লক্ষ্য (Philosophy aims at the Knowledge of the eternal, of the essential nature of things.)। আরিস্টটল বলেন, দর্শন বস্তুর স্বরূপ এবং স্বরূপগত গুণের বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞান (Philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes which belong to it in virtue of its own nature.)। এই দুটি সংজ্ঞার্থেই দর্শন ও পরাবিজ্ঞান সমার্থক বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু, একথা ঠিক নয়। পরাবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা বা অঙ্গ, দর্শনের আরও শাখা আছে। সুতরাং দর্শনের কোন একটি শাখাকে সম্পূর্ণ দর্শন বলে মনে করলে দর্শন সম্বন্ধে অত্যন্ত সংকীর্ণ (too narrow) ধারণা করা হয়। আমরা দর্শনের এ সংজ্ঞার্থ মানতে পারি না।

৩। কোঁতে বলেছেন—দর্শন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Philosophy is the science of sciences.)। পলসন বলেন, দর্শন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি (Philosophy is the sumtotal of all scientific Knowledge.)। ভুণ্ট বলেন—ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের একটি সুসমঞ্জস সমগ্রতায়

একীকরণই দর্শন (Philosophy is the unification of all Knowledge obtained by the special sciences in a consistent whole.) । এ সমস্ত সংজ্ঞার্থের মূল কথা—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির একীকৃত রূপই দর্শন। আমরা পূর্বে দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায় এ মত আলোচনা করে খণ্ডন করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সে আলোচনা আর করছি না।

৪। মার্ভিন বলেন, দর্শন সত্যের প্রতি অনুরাগ বোঝায়। এ সত্য সমস্ত সত্যকে একটি বিরাট সমগ্রতার মধ্যে সুবিন্যস্ত ক'রে অঙ্গীভূত করে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান সূচনা করে (Philosophy is love for 'the truth'—the complete body of Knowledge that includes in it all truths —all truths organised into one great system.)। এই সংজ্ঞার্থে দর্শনের ক্ষেত্রে সত্য লাভের গুরুত্ব যথার্থভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সত্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে দর্শন যে সুন্দর ও কল্যাণ নিয়েও আলোচনা করে, একথা উপেক্ষা করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার্থে পরিপূর্ণ জ্ঞান বলতে যদি বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞানের একীকরণ বুঝিয়ে থাকে তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। আমরা একথা আগেই আলোচনা করেছি। এ সংজ্ঞার্থে পরিপূর্ণ সত্যকে বিভিন্ন সত্যের সমাহার বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু, সত্যের সমাহার কি করে হতে পারে তা বোঝা মুশকিল। সত্যের যোগ বা বিয়োগ হতে পারে না।

৫। ওয়েবার বলেন, দর্শন প্রকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক মত এবং বস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা বোঝায় (Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things.)। এই সংজ্ঞার্থে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা যে দর্শনের কাজ, একথা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মূল্যাবধারণও যে দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম, একথা স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং এ মতকেও আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি

কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য যে নিয়ম বা প্রণালী অবলম্বন করা যায় তারই নাম পদ্ধতি। দার্শনিক আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে শৈলী বা পথ অনুসরণ করা উচিত তকেই বলে দার্শনিক পদ্ধতি। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস অলোচনা করি তবে দেখব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি অনুবর্তন করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে এই সব বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণ করে দার্শনিক আলোচনার আদর্শ পদ্ধতি কী হওয়া উচিত তা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

নির্বিচারবাদ (Dogmatism)

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা, জ্ঞানের প্রাগুপকরণ ও সীমা না জেনেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করার নাম নির্বিচারবাদ। এই পথের পথিকেরা কতটুকু জানা যায় তা বিচার না করেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুরু করে দেন। তাই এঁরা নির্বিচারবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। তত্ত্ব[১] আদৌ জানা সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন তাঁরা তোলেন না। কতকগুলো ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিয়ে তার থেকে অন্য কতকগুলো সিদ্ধান্ত এঁরা বের করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে এই নূতন সিদ্ধান্তগুলোও পূর্বের ধারণাগুলোর মতই সত্য। স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া ধারণা ও তা থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে, তা আসলে সত্য কিনা—এ বিচার তাঁরা করেন না। আমাদের মনে হয়, চিন্তা শুরু করার আগে যেহেতু চিন্তার সীমা জানা যায় না, সেজন্য বোধ হয় ব্যর্থ চেষ্টা না করে নির্বিচারবাদী দার্শনিকেরা প্রথমেই তত্ত্বজিজ্ঞসা শুরু করে দেন।

সমালোচনা ঃ—নির্বিচারবাদী দার্শনিকদের পক্ষে যা-ই বলি না কেন, তাঁদের পদ্ধতির কতকগুলো ত্রুটি কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। বিচার না করেই যদি দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তবে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দর্শনের ইতিহাস পূর্ণ হয়ে ওঠে। দর্শনের ইতিহাসে আমরা দুই দলের নির্বিচারবাদী দার্শনিকের দেখা পাই। একদলে আছেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা, আর একদলের সভ্য হচ্ছন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিচার না করেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অনির্দিষ্ট ও অসত্য ও বুদ্ধি দিয়ে চরম তত্ত্ব জানা

১। Reality

যায়, তা ধরে নিয়েছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যায়, বুদ্ধি জ্ঞান ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়—এসব কথা ধরে নিয়েই দর্শন শুরু করেছেন। তার ফলে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা সহজাত ধারণার[১] অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা মনে করেন, মানুষ জন্মাবার সময়েই কতকগুলো ধারণার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা সহজাত ধারণা বলে কিছুই নেই এমন সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছেন। পরস্পরবিরোধী এই দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক তা ত জ্ঞান-প্রক্রিয়ার যুক্তিসিদ্ধ বিচার না করলে জানাই যাবে না। সুতরাং নির্বিচারবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয়, কারণ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত তাঁদের দর্শনে আমরা হামেশাই দেখতে পাই।

বিশেষতঃ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তবে কোন্ জ্ঞান সত্য আর কোন্‌টা জ্ঞানাভাস মাত্র তাও বোঝা যাবে না।

সবশেষে নির্বিচারে যে তত্ত্বকে চরম বলে গ্রহণ করা যায় তাই যে চরম তা ত বিচার না করে নির্ণয় করা যায় না। আর তা যদি নির্ণয় করা না যায় তবে নির্বিচারে গৃহীত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয় আমাদের চিরকালই থেকে যাবে।

সংশয়বাদ (Scepticism)

নির্বিচারবাদী দার্শনিকেরা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান। এই রকম ধরনের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের রূপ জানতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। কখনও কখনও বা যা সত্য তা আবার মিথ্যাও হতে পারে—এমন ধরনের অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়। এই রকম ভাবে নির্বিচারবাদের ত্রুটিবহুল সিদ্ধান্তের ফলে সংশয়বাদের উদ্ভব হয়ে থাকে।

বিশ্বের চরম তত্ত্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়, আর সমস্ত ধারণাই সন্দেহের বিষয়—এই মতবাদের নামই সংশয়বাদ।

প্রাচীন গ্রীস দেশে সোফিস্টস্ নামে একদল সংশয়বাদী দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছিল। একই বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ধারণার অস্তিত্ব দেখে সোফিস্টরা সর্বজন-গ্রাহ্য কোন সত্যই নাই—এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন —'মানুষই সর্ববস্তুর নিয়ামক'।[২] একই জিনিস কারও কাছে সত্য, কারও কাছে মিথ্যা ; কারও কাছে সুন্দর, কারও কাছে কুৎসিত ; আবার কারও

১। Innate Ideas

২। Man is the measure of everything

কাছে ভালো এবং কারও কাছে মন্দ হতে পারে। যার কাছে যে বস্তু যেমন তার কাছে সে বস্তু তেমনি।

আধুনিক কালের দর্শনে ডেকার্টে এক ধরনের সংশয়বাদ পোষণ করেন। যা কিছু সংশয় করা যায় তাই পরিত্যাগ করা উচিত—এই তাঁর উপদেশ। দর্শনের ইতিহাসে ডেকার্টের এই মতবাদ 'পদ্ধতিগত সংশয়বাদ'[১] নামে পরিচিত। তিনি সমস্ত কিছু সংশয় করে করে সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় তত্ত্ব বলে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন, সংশয় করতে গেলেই সংশয়াত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, কারণ সংশয় করার কর্তা সংশয়াত্মা না থাকলে সংশয় করাই সম্ভব নয়। ডেকার্টে এই নিঃসংশয় তত্ত্ব থেকেই অন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত টেনে এনেছেন এবং এমনি করেই তাঁর বিশিষ্ট দার্শনিক-চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। তাঁর দর্শনে সন্দেহ করার জন্যই সন্দেহ করা হয় নি। সন্দেহ করে করে নিঃসন্দিগ্ধকে পাওয়া যাবে—এই আশা নিয়েই সন্দেহ করা হয়েছে।

আধুনিক কালের দর্শনে আর একজন শক্তিমান সংশয়বাদী দার্শনিকের দেখা পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম। তিনি মনে করেন, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় না তা মানবার কোন অধিকার যুক্তিবাদী মানুষের নেই। আত্মা, ঈশ্বর, বস্তুর প্রকাশ্য গুণাতিরিক্ত বস্তুত্ব নামে কোন পৃথক্ সত্তা—কিছুই অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করারও কোন অর্থ হয় না।

সমালোচনা :—নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদ এক হিসেবে সমপর্যায়ভুক্ত। নির্বিচারবাদ নির্বিচারে জ্ঞানের সম্ভাবনা মেনে নেয় আর সংশয়বাদ নির্বিচারে জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা স্বীকার করে। নির্বিচারবাদ মানুষের জ্ঞানের মধ্যে কোন সীমারেখা টানে না, সংশয়বাদ মতে মানুষের অজ্ঞতার কোন সীমা নেই। মানুষ এই নেতিবাচক চিন্তা-পদ্ধতিতে বেশী দিন তৃপ্ত থাকতে পারে না। বিশেষত সম্পূর্ণ নেতিবাচক চিন্তা-পদ্ধতি সম্ভবও নয়। যদি কেউ বলেন—বস্তুস্বরূপ জানা যায় না—বস্তুপ্রকাশ মাত্রই জানা যায়, তবে বস্তুস্বরূপের কিছু জ্ঞান নিশ্চয়ই তিনি দাবী করেন, কারণ বস্তুপ্রকাশ ও বস্তুস্বরূপ আলাদা করতে গেলে বস্তুস্বরূপের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং সংশয়বাদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন স্ব-বিরোধিতা (self-contradiction) রয়েছে।

১। Methodological scepticism

তবে এই ক্ষেত্রে বলা ভালো যে, কিঞ্চিৎ সংশয় মনে না থাকলে দার্শনিকতার উদ্ভবই হতে পারে না। সাধারণ মানুষের কাছে যে সমস্ত ব্যাপার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না, দার্শনিকের কাছে তা অনেক সময়েই সমস্যাসঙ্কুল বলে মনে হয়। দার্শনিক বিচার না করে কিছুই গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ, সাধারণভাবে একটা সংশয় নিয়েই তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন। এই জাতীয় প্রাথমিক সংশয় দর্শনের পক্ষে অপরিহার্য। তবে অতিরিক্ত সংশয় বা আত্যন্তিক সংশয় চিন্তা ও কর্ম দুয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

বিচারবাদ (Criticism)

নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব বিচারবাদের সৃষ্টি করেছে। নির্বিচারবাদ অনুসারে তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্ভব, আর সংশয়বাদীদের ধারণা—তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্ভব নয়। এখন এদের মতামতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জ্ঞানের সীমা, প্রাগুপকরণ প্রভৃতির সুস্পষ্ট জ্ঞান একান্তভাবেই প্রয়োজন। কতটুকু জানা যায় তা জানলেই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব কিনা তা জানা যাবে। সুতরাং জার্মান দার্শনিক কাণ্ট নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য জ্ঞানের প্রাগুপকরণ প্রভৃতির সন্ধান শুরু করেন। দর্শনের ইতিহাসে কাণ্টের পদ্ধতির নামই বিচারবাদ।

কাণ্ট দেখাতে চেষ্টা করলেন যে, সংবেদন[১] ও বুদ্ধি দুই-ই জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন। জ্ঞানের দুই দিক—একটি তার বিষয়, আর একটি তার আকার। কাণ্টের মতে জ্ঞানের বিষয় আমরা সংবেদন থেকে পাই, আর তার আকার বুদ্ধিই দিয়ে থাকে। বিষয় আর আকার—এ দুটি ছাড়া জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সংবেদন ও বুদ্ধি উভয়ই অপরিহার্য।

অতীন্দ্রিয় বিষয় কখনই সংবেদনের বিষয় হতে পারে না, কারণ সংবেদন কখনই ইন্দ্রিয়-সংযোগ ভিন্ন সম্ভব নয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানেরও বিষয় নয়।

বিচারবাদও সংশয়বাদের মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান-সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই —একথা বিচারবাদী দার্শনিক জোর গলায়ই বলেন।

সমালোচনা :—এই বিচারবাদের মূল কথা—জ্ঞানের প্রাগুপকরণ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানের প্রকৃতি—এসব আলোচনা ক'রেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করা উচিত। এ বিষয়ে আধুনিক কালের দার্শনিকদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য আছে।

১। Sensation

কিন্তু বিচারবাদী দার্শনিক কাণ্ট যে বলেছেন অতীন্দ্রিয় বিষয় জানা যায় না—এ বিষয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব বলেই অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectical Method)

ডায়ালেক্‌টিক শব্দের সাধারন অর্থ কোন বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা। কখনও কখনও কথোপকথন অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ভাবাত্মক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative)—দুরকমই হ'তে পারে। দর্শনের ইতিহাসে আমরা হেগেলকে প্রথম অর্থে আর কাণ্ট ও সক্রেটিসকে দ্বিতীয় অর্থে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখি।

নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে খণ্ডনরীতিও বলা যেতে পারে। সক্রেটিস এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সোফিস্টদের মতবাদ খণ্ডন করতেন। তিনি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিরোধী মতের অন্তর্বিরোধ প্রমাণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শনের ইতিহাসে এই পদ্ধতি সক্রেটিক পদ্ধতি নামে পরিচিত। কাণ্ট জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখানর জন্য এই পদ্ধতিরই অনুবর্তন করেছিলেন।

জার্মান দার্শনিক হেগেল ভাবাত্মক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আশ্রয় করেই চরম সত্যলাভ করা যায়। পরস্পরবিরোধী ধারণা-গুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার নামই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Anti-thesis) ও সম্বাদ (Synthesis)—এই তিন মিলেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী (triad) রচিত হয়েছে। কিন্তু সমন্বয়ে এসে গেলেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হয়ে যায় না। প্রথম বারের সমন্বয় আবার দ্বিতীয় বারে বাদ আকারে দেখা দেয়। এই বাদের আবার প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। এইভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া চরমতত্ত্ব অদ্বয় চিন্তা বা ব্রহ্মে (Absolute Thought) না পৌছান পর্যন্ত চলতেই থাকে।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে দুটো বিপরীত মতের মধ্যে একটাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। হেগেল এসে সাধারণ লোকের এই ধারণা বদলে দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বিরোধ সমন্বয়েরই পূর্বাভাস মাত্র। 'দ্বন্দ্ব' শব্দে বিরোধ ও মিলন দুই-ই আমরা বুঝে থাকি। সুতরাং ডায়ালেক্‌টিক শব্দের নিহিতার্থ দ্বন্দ্ব শব্দের মধ্য দিয়েই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়।

হেগেল মনে করেন—জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু উভয়েই স্ব-প্রকাশ চিন্তার (self-conscious Absolute Thought) বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। হেগেলীয় দর্শনে এই স্ব-প্রকাশ শুদ্ধ চিন্তাই চরম তত্ত্ব ও সত্য। এই তত্ত্ব বিভিন্ন নিম্নতর স্তরের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হতে পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। যেহেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু উভয়েই চরমতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, সেজন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুও এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মেনে চলে।

দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় হেগেল এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে কী করে সুষ্ঠুতর ও উন্নততর দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠে—হেগেল তা দর্শনের ইতিহাস থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

সমালোচনা :—বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয়ে অনেক সময় উন্নততর ধারণা লাভ করা যায়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বত্রই ও সর্বক্ষেত্রে বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। অধ্যাত্মবাদীদের মতে অধ্যাত্মতত্ত্বই চরম সত্য আর জড়বাদীদের মতে জড় বস্তুই চরম সত্য। প্রথম দলের ধারণা, জড় বস্তু অধ্যাত্ম তত্ত্বেরই প্রচ্ছন্ন রূপ মাত্র, আর দ্বিতীয় দলের মতে আত্মা প্রভৃতি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জড় বস্তুর প্রকারভেদ মাত্র। এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমন্বয় সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় না।

সিদ্ধান্ত :—দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি বিচার করে দেখা গেল। কোনটিই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হচ্ছে না। সর্বশেষে আমরা বুদ্ধি ও বোধির[1] দ্বন্দ্ব আলোচনা করে আদর্শ দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের মতামত দেবার চেষ্টা করব।

দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধি ও বোধির দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলে এসেছে। একদল দার্শনিক মনে করেন, বুদ্ধি দিয়ে দার্শনিক আলোচনার বিশেষ বিষয় চরম তত্ত্ব জানা যায়। এঁদের নাম বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। আর একদল দার্শনিক আছেন যাঁদের মতে চরম তত্ত্ব বুদ্ধির নাগালের বাইরে। বোধির গভীর প্রশান্তিতে চরম তত্ত্বের প্রতীতি হয় এই তাঁদের ধারণা। এই দুই দলের বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা যাক্।

হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলোর সমন্বয় সাধন করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করাই দার্শনিকের

১। Intellect and Intuition

কাজ। বিজ্ঞানী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কল্পনা (hypothesis) করে থাকেন। আবার সেই কল্পনার সত্যতা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়েই নির্ণয় করা বিজ্ঞানীর কাজ। বিজ্ঞানালোচনার এই বিভিন্ন পদক্ষেপে যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণই মুখ্যস্থান গ্রহণ করে থাকে। দর্শন যেহেতু বিজ্ঞানেরই উন্নততর স্তর মাত্র, সুতরাং বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাত্মক পদ্ধতিই দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি হবে। দার্শনিক বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের এই মত।

হেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মতে চরম তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য। সুতরাং চরমতত্ত্ব জানতে গেলে বুদ্ধিই মানুষের একমাত্র সহায় হবে।

দার্শনিক বার্গসঁ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে চরম তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং বুদ্ধিবাদ কখনই দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি হতে পারে না। বার্গসঁর মতে চরম তত্ত্ব স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। তিনি প্রাণ-প্রবাহ (Elan vital)-কে চরম তত্ত্ব বলে মনে করেন। সেই প্রাণ-প্রবাহ অখণ্ড ও অবিভাজ্য। কখনও কখনও তিনি এই প্রাণ-প্রবাহকে নিত্যবহমান কালপ্রবাহ বলেও অভিহিত করেছেন। কালপ্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় না, অবিরাম বয়েই চলে। বার্গসঁর মতে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এমন করে কালকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় না। কালপ্রবাহে কোথায়ও ছেদ নেই, বিরাম নেই। এখানে অতীত বর্তমানে এসেই আবার ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছে। অবিশ্রান্ত চলাই হচ্ছে এই প্রাণ-প্রবাহের রীতি। সুতরাং গতি আর চলাই হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র সত্য।

বার্গসঁ মনে করেন, বুদ্ধি দিয়ে এই সত্যকে কখনই ধরা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে জ্ঞান পাই তা বিধান বা বচনাত্মক (Judgmental)। বচন ছাড়া বুদ্ধি দিয়ে কোন জ্ঞানই হতে পারে না। প্রত্যেক বচনেরই দুটো অংশ থাকে—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। 'রাম ভাল ছেলে' একটি বচন। এখানে 'রাম' উদ্দেশ্য, আর 'ভাল ছেলে' বিধেয়। বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞানই হোক্ না কেন তা উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক হবে। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান লাভ করতে গেলেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি, বার্গসঁর মতে চরম সত্তা অবিভাজ্য। এই চরম সত্তার মধ্যে বিভেদ সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধি দিয়ে এই চরম সত্তা কখনই জানা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যেক বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুই-ই সামান্য ধারণা

(Concepts)। বিভিন্ন বস্তু দেখেই আমরা তাদের সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা করে থাকি। 'মানুষ' একটি সামান্য ধারণা। এই ধারণায় বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষের জীবনের কোন স্পর্শ 'মানুষ' এই অমূর্ত ধারণায় নাই। সুতরাং সামান্য ধারণা কোন কিছুরই প্রাণের পরিচয় দিতে পারে না। আমরা দেখেছি, বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তা বচন ছাড়া হয় না, আবার বচন সামান্য ধারণার যোগফল মাত্র। সুতরাং বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তাতে সত্তার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—গতিশীল কোন বস্তুকেই গতিশীল হিসেবে বুদ্ধি জানতে পারে না। বুদ্ধি যখনই কোন বস্তু জানে তখন তা স্থিতিশীল হয়ে যায়। বার্গসঁর মতে চরম তত্ত্ব গতিশীল। বুদ্ধি কখনও এই গতিশীল তত্ত্বকে জানতে পারে না। যেহেতু বুদ্ধি দিয়ে গতিশীল চরম তত্ত্ব জানা যায় না, সেজন্য বার্গসঁ তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে একমাত্র বোধিতে এই তত্ত্বের প্রকাশ পরিপূর্ণ ও ভ্রমশূন্য হয়। বোধি বলতে তিনি একরকমের বুদ্ধিসঞ্জাত সমবেদনা (intellectual sympathy) বোঝেন। বোধি দিয়ে চরম সত্তার অন্তরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার মহিমা উপলব্ধি করা যায়। বোধি অনেকটা অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি দিয়েই জ্ঞাতা প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অন্তরের পরিচয় পেতে পারে।

এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই যে, চরম তত্ত্ব বোধিলভ্য, একথা বার্গসঁ বললেও দার্শনিক আলোচনায় বুদ্ধির প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নি। তাঁর লেখা 'Creative Evolution' গ্রন্থটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে একথা জানা যায়। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, বোধির প্রমাণের জন্য বুদ্ধি বা বিচারের দ্বারস্থ হওয়া দরকার। বোধিলভ্য সত্য প্রমাণ ও অন্যের কাছে প্রচারের জন্য বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়। সুতরাং দার্শনিকতায় বুদ্ধি-বর্জন অসম্ভব।[১]

কেবলমাত্র বোধিই দার্শনিক বিচারের পদ্ধতি, বোধিবাদ যদি একথা বলে তবে এই মতের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো উত্থাপন করা যায়।

প্রথমতঃ—বোধি বা অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিভিন্ন লোক বোধি থেকে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই সব জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়

১। 'Dialectic is necessary to put intuition to the proof, necessary also in order that intuition should break itself up into concepts and so be propagated to other men, but all it does, often enough is to develop the result of that intuition which transcands it creative Evolution.

বোধি দ্বারা সম্ভব নয়। বুদ্ধি দিয়েই আমরা এদের গুণাগুণ বিচার করতে পারি। সুতরাং শুধু বোধি আমাদের যুক্তিবাদী মনের তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষতঃ বোধিবাদ যদি দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হয় তবে দর্শনশাস্ত্র কখনই সকলের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। যেহেতু বোধি ব্যক্তিগত ব্যাপার সেজন্য সকলে এই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কী করে আলোচনা করবে ?

দ্বিতীয়তঃ—বোধিতে যা জানা গেল তা যদি ভাষায় প্রকাশ না করা হয় তবে ত কোন দার্শনিক আলোচনাই হতে পারে না। জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই বচনের আশ্রয় নিতে হয়। বচনের আশ্রয় নিয়ে যে জ্ঞান হয় তা বুদ্ধিজাত জ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধির সাহায্য না নিলে কোন দার্শনিক আলোচনাই সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ—একমাত্র বোধিই যদি দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হয় তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোন সম্পর্কই থাকবে না। বিজ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। দার্শনিক আলোচনা যদি বুদ্ধি দিয়ে না-ই চলে তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার আর কী সম্পর্ক থাকবে ? কিন্তু আমরা জানি, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সুতরাং এই বোধিবাদ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হতে পারে না।

বোধিবাদ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি না হলেও দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতিতে বোধির স্থান আছে। বোধি বলতে যদি আমরা কল্পনাত্মক অন্তর্দৃষ্টি (imaginative insight) বুঝি তবে দার্শনিক আলোচনার গোড়াতেই এই বোধির দরকার। সত্য প্রথম অন্তর্দৃষ্টিতেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরে দার্শনিক যুক্তিতর্ক দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের সমস্ত বড় বড় আবিষ্কারের পেছনেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের অন্তর্দৃষ্টির খেলা দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে আপেল ফল পড়তে দেখে নিউটন আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারতেন না। আপেল ফল মাটিতে ত চিরকালই পড়ে। কিন্তু সকলেরই মনে এতে ত কোন প্রশ্ন জাগে না। আর এই সাধারণ ঘটনার পেছনে কোন সত্যের পরিচয়ও ত সাধারণ লোক পায় না। বিশেষ বিশেষ লোকের অন্তর্দৃষ্টিতেই সাধারণ বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। দার্শনিক জগৎ ও জীবনে নিহিত চরম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। কোন একটি বিশেষ ক্ষণের প্রশান্ত গভীরতাতেই দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টিতে এই তত্ত্বের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। পরে দার্শনিক যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্বের সর্বজনবোধ্য একটা রূপ দিতে পারেন। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতিতে বুদ্ধি ও বোধি উভয়েরই স্থান আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিচার ও অনুমান
(Judgment and Inference)

দর্শন মূলতঃ চিন্তার ব্যাপার। যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত ধারণা আছে তাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ই দার্শনিকের কাজ। বিচার ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। চিন্তায় অনুমানেরও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। সুতরাং দর্শনে বিচার ও অনুমান নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। আমরা এই অধ্যায়ে সে আলোচনাই করব।

বিচার, বচন, বাক্য ও বাস্তব
(Judgment, Proposition, Sentence and Fact)

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব পরিষ্কার করে প্রকাশ করা যায় তারই নাম বাক্য। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে—উদ্দেশ্য আর বিধেয়। যার সম্বন্ধে বাক্যে কিছু বলা হয় তার নাম উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার নাম বিধেয়। 'অসিত দার্জিলিং বেড়াতে গেছে'—এই বাক্যে 'অসিত' উদ্দেশ্য আর 'দার্জিলিং বেড়াতে গেছে' বিধেয়।

তর্কবিজ্ঞানে বিচার (Judgment) এবং বচন (Proposition) এই দুটি শব্দ প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ দুটির তাৎপর্য জানা দরকার। আমরা যখন চিন্তা করি তখন কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয় প্রয়োগ করি। যেমন আমি যখন চিন্তা করি দেয়াল সাদা, তখন 'সাদা' এই বিধেয় আমি 'দেয়াল' এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করি। সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। চিন্তা করার অর্থই কোন কিছুর উদ্দেশ্যে অপর কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা বা কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন বিধেয় প্রয়োগ করা। কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়-প্রয়োগের এই মানসিক ক্রিয়ার নামই বিচার।

এই বিচার যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয় প্রযুক্ত হয়ে তর্কবিজ্ঞানসম্মত বাক্য বা বচন গঠিত হয়। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়-প্রয়োগের মানসিক ক্রিয়া বিচার আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়ের প্রয়োগ ভাষায় প্রকাশিত হলেই তা বচন। 'দেয়াল' সম্বন্ধে 'সাদা' এই বিধেয়-প্রয়োগের মানসিক ক্রিয়া বিচার আর যখন বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করে ভাষায় প্রকাশ

করি এবং বলি বা লিখি 'দেয়াল হয় সাদা' তখন বচন বা তর্কবিজ্ঞানসম্মত বাক্য পাই। বিচার ও বচন সম্বন্ধে এই মতই সাধারণতঃ প্রচলিত।

এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই যে, আধুনিক গণিতভিত্তিক তর্কবিজ্ঞানে (Mathematical Logic) 'বচন' শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইক্ষেত্রে চিন্তার বিষয়কে বচন বলা হয়। আমি যখন চিন্তা করি যে, 'দেয়াল সাদা' তখন 'সাদা দেয়াল' আমার চিন্তার বিষয়।

আধুনিক তর্কবিজ্ঞানীদের মতে 'সাদা দেয়াল' বচন বা তর্কবিজ্ঞানসম্মত বাক্য। তাঁরা বলেন, চিন্তার দুটি দিক—একটি বিষয়ীগত (Subjective) এবং অন্যটি বিষয়গত (Objective)। চিন্তার বিষয়ীগত বা মানসিক দিকটি বিচার এবং বিষয়গত দিকটি বচন। আমরা এই গ্রন্থে সাধারণতঃ যে অর্থে 'বিচার' ও 'বচন' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়, সে অর্থেই তাদের ব্যবহার করেছি।

তর্কবিজ্ঞানের বচনের তিনটি অংশ থাকে। এই তিন অংশের তাৎপর্য বুঝতে গেলে বচনের প্রকৃতি জানা দরকার। আমরা বাক্য নানাভাবেই ব্যবহার করি। কোন কিছু সম্বন্ধে বলতে গেলে, কোন প্রশ্ন করতে গেলে, কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, কাউকে আদেশ করতে গেলে অথবা বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে আমরা বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করি। এই সমস্ত বাক্যকেই তর্কবিজ্ঞানে বচন বলে না। একমাত্র কোন কিছু সম্বন্ধে বলতে হলে আমরা যে বাক্য ব্যবহার করি তার নাম বচন। 'যদু ভাল ছেলে' এটি বাক্য ও বচন উভয়ই বটে। এখানে যদু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়—'যদু, এ কাজটা কর'—তবে এটা বাক্য হবে বটে, কিন্তু বচন হবে না। এখানে আদেশ করা হয়েছে, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধে কোন ঘোষণা (assertion) করা হয় নি। কোন কিছু সম্বন্ধে ঘোষণা করলেই বচন হয়, অন্যত্র নয়। বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ছাড়াও একটি সংযোজক (copula) থাকে। এই সংযোজকই বচনের তৃতীয়াংশ। 'যদু ভাল ছেলে' এই বচনে 'যদু' উদ্দেশ্য, 'ভাল ছেলে' বিধেয়, আর 'হয়' (অনুক্ত) সংযোজক। সাধারণতঃ বচনের সংযোজককে 'হয়' 'আছে' বা এই জাতীয় অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের[১] বর্তমান কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। সংযোজক কখনও অতীত বা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। শুধু তাই নয়। করা, খাওয়া, যাওয়া—এই জাতীয়

১। Verb 'to be'

কোন ক্রিয়াপদই সংযোজকের কাজ করতে পারে না। সংযোজক সবসময়ই অস্তিত্ব-বাচক ক্রিয়াপদের (verb 'to be') বর্তমান কালের কোন না কোন রূপ হবে।[১]

অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের কোন ঘোষণা তর্ক-বিজ্ঞানের বচনাকারে প্রকাশ করতে হলে তা বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোগে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা আরও ভাল করে বোঝা যেতে পারে। 'দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন'—এই বাক্য তর্ক-বিজ্ঞানের বচনাকারে প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে—'দশরথ হন একজন ব্যক্তি যিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন।' এখানে 'হন' এই বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোগেই 'দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন' এই বাক্যকে বচনাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়ে ভবিষ্যৎকালের ঘোষণার ক্ষেত্রে বচনের রূপ দেখান যেতে পারে। 'শীঘ্রই বৃষ্টি হবে'—ভবিষ্যৎকালের ঘোষণাসূচক একটি বাক্য। একে বচনে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে—'বৃষ্টি হয় এমন জিনিস যা শীঘ্র হবে।' এখানে 'হয়' এই বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোজকের কাজ করেছে।

কোন বাক্যে যদি অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়াপদ থাকে, তবে তা বচনাকারে প্রকাশের সময় অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া সংযোগে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। 'যদু যায়'—এই বাক্য একটি ঘোষণা প্রকাশ করে। কিন্তু ঘোষণা প্রকাশ করে বলেই একে এই অবস্থায় বচন বলা যাবে না। 'যদু যায়'—এই বাক্যকে বচনাকারে প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে—'যদু হয় একটি বালক বা মানুষ যে যায়।' এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, যে ভাবেই হোক্ না কেন প্রত্যেক বচনেই অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের রূপ সংযোজক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে কোন বচন হবে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বচনকে আমরা ঘোষকবাক্য বলতে পারি। কারণ, বচনে সর্বত্র কোন না কোন বিষয়ে ঘোষণাই থাকে। ঘোষণা কোন কিছুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব দুই-ই বোঝাতে পারে। আমরা যখন বলি

১। আমরা এখানে বচনের প্রকৃতি তর্কবিজ্ঞানী আরিস্টটল-নির্দিষ্ট পথে নির্ণয় করেছি। আধুনিক কালে অনেক তর্কবিজ্ঞানী সমস্ত বচনের ক্ষেত্রেই সংযোজকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। জনসন, স্টেরিং, মেলন প্রভৃতি এই দলের লোক। তাঁরা বলেন :

যেখানে দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সংযোগ প্রকাশ করা হয় বা কোন একটি শ্রেণীকে বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয় সেখানেই সংযোজকের প্রয়োজনীয়তা, অন্যত্র সংযোজক নিষ্প্রয়োজন। 'তিনি আমাকে বই দিয়েছেন' বাক্যটিকে 'তিনি হন একজন ব্যক্তি যিনি আমাকে বই দিয়েছেন' এইরূপ বচনে রূপান্তর অনাবশ্যক এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

'ফুলটি লাল' তখন বচনটি ফুলে লালিমার অস্তিত্বই প্রকাশ করে। আবার যখন বলি 'আমটি মিষ্টি নয়' তখন বচনটি আমে মিষ্টতার অভাবই বোঝায়।

বচন ও বাক্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা স্মরণীয়। বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় শব্দ বা শব্দসমষ্টি। এই শব্দ বা শব্দসমষ্টির কোন বিশেষ নাম নেই। কিন্তু বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি তার বিশেষ নাম আছে। এদের পদ (Term) বলে। বাক্যের ক্ষেত্রে মুখ্যপ্রশ্ন—বাক্যটি ব্যাকরণসম্মত, না, ব্যাকরণসম্মত নয়? কিন্তু, বচনের ক্ষেত্রে মুখ্যপ্রশ্ন—বচনটি কি সত্য না মিথ্যা? বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, বাক্য প্রশ্ন, আদেশ, বিস্ময়, ইচ্ছা প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রকাশ করে; কিন্তু প্রশ্নজ্ঞাপক, আদেশসূচক, বিস্ময়প্রকাশক বা ইচ্ছাজ্ঞাপক বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলার কোন প্রসঙ্গই নেই। 'রাম কি ভাল ছেলে?' এই বাক্যটিকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। তবে এই বাক্য ব্যাকরণের নিয়ম মেনেছে কি মানেনি, এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করা যায়। একমাত্র ঘোষকবাক্য অর্থাৎ বচনের ক্ষেত্রেই সত্য বা মিথ্যার প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা যখন বলি—'রাম ভাল ছেলে', তখনই এই বাক্যটি সত্য না মিথ্যা এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবে ওঠে। কারণ, রাম বস্তুতঃ ভাল ছেলে হ'তেও পারে আবার নাও পারে। যদি সে বস্তুতঃই ভাল ছেলে হয়, তবে বচনটি সত্য, আর যদি সে বস্তুতঃ ভাল ছেলে না হয়, তবে বচনটি মিথ্যা।

বিচার, বচন ও বাক্যের পার্থক্য আলোচনা করা হ'ল। এবার বচন ও বাস্তবের সম্বন্ধ আলোচনা করবো। বস্তুতঃ যা আছে বা থাকে বা ঘটে আমরা সাধারণতঃ তাকেই বাস্তব বা fact বলি। আমরা যখন বচন রচনা করি তখন সাধারণতঃ বাস্তবকে কেন্দ্র করেই তা রচনা করি তবে বচনই বাস্তব নয় বা বাস্তবই বচন নয়। 'দেয়াল হয় সাদা'—একটি বচন। 'সাদা দেয়াল'—একটি বস্তু। 'সাদা দেয়াল' এই বস্তুকে কেন্দ্র করেই 'দেয়াল হয় সাদা' এই বচন রচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'সাদা দেয়াল'—এই বস্তু এবং 'দেয়াল হয় সাদা' এই বচন এক নয়। তবে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি বা মিল থাকলেই বচন সত্য হয়। অর্থাৎ, 'দেয়াল হয় সাদা' এই বচন সত্য হয় তখন, যখন 'সাদা দেয়াল' এই বস্তুটি থাকে।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—আধুনিক তর্কবিজ্ঞানীদের মতে চিন্তার বিষয় ত বচন, তবে তাঁদের মতে বচন ও বাস্তবের পার্থক্য কি হবে? দেয়ালকে যখন

সাদা বলে বিচার করি, অর্থাৎ 'দেয়াল' সম্বন্ধে 'সাদা' এই বিধেয় যখন মনে মনে প্রয়োগ করি, তখন 'সাদা দেয়াল'ই ত চিন্তার বিষয়, অর্থাৎ বচন। 'সাদা দেয়াল' আবার বাস্তবও বটে। তবে কি বচন ও বাস্তব অভিন্ন? উত্তরে বলা হয় যে, চিন্তার বিষয় ও বাস্তব এক নয়। বক্তব্য অন্য আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান যেতে পারে। আমি আজ এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণ দেখতে দেখতে ভাব্‌ছি—এবার কার্তিকেই খুব শীত পড়বে। 'কার্তিকে শীত পড়া' রূপ বাস্তব এখন শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হতে পারে না, কিন্তু, এখনই 'কার্তিকে শীত পড়া' আমার চিন্তার বিষয় হতে পারে। এতেই বোঝা যায় যে, চিন্তার বিষয়রূপ বচন ও বাস্তব এক নয়।

বিচারই জ্ঞানের একক

(Judgment is the unit of Knowledge)

জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে বিচার জ্ঞানের একক।

সামান্যতম জ্ঞান হতে গেলেই বিচার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কথাটা ভেবে দেখা যাক্।

জ্ঞান মানেই কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান। সাধারণতঃ বিষয় ছাড়া কোন জ্ঞানই হয় না। আবার বিষয়ের জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতা। কোন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মানেই বিষয়টি এমন বা বিষয়টি এমন নয়, এই বোধ লাভ করা। এই বোধ ত আসলে বিচারেরই বোধ। কারণ, কোন বিষয় এমন বা এমন নয় ভাবতে হলেই বিচার করতে হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিচার ছাড়া অর্থাৎ বিষয়টি এমন বা এমন নয় এই বোধ ছাড়া জ্ঞান হ'তেই পারে না। অর্থাৎ বিচারকেই জ্ঞানের একক বলতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়-প্রয়োগের মানসিক ক্রিয়াকে বিচার বলে। 'দেয়াল' সম্বন্ধে 'সাদা' এই বিধেয় প্রয়োগ করার যে মানসিক ক্রিয়া তা-ই বিচার। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয় প্রয়োগ করা আর উদ্দেশ্যের অর্থ নির্ণয় করা একই কথা। আমরা যখন 'দেয়াল সাদা' বলি তখন 'সাদা' এই বিধেয়ের দ্বারা দেয়ালের অর্থ নির্ণয় করি। অর্থ নির্ণয় না করলে জ্ঞান হয় না। অর্থ নির্ণয় করার প্রক্রিয়াই যদি হয় বিচার এবং অর্থ নির্ণয় না করলে যদি জ্ঞান না হয় তবে বিচার ছাড়া জ্ঞান হবে না ; বিচারই হবে জ্ঞানের একক। টেবিল

নামক একটি বস্তু থাকলেই টেবিলের জ্ঞান হয় না। বস্তুটিকে টেবিল বলে বিচার করলেই জ্ঞান হয়। এই রকম সর্বত্রই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচার আবশ্যক।

কোন কোন দার্শনিক বিচার-পূর্ব জ্ঞান বা Pre-judgmental knowledge স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, বিচার ছাড়াও এমন এক প্রকার জ্ঞান সম্ভব যেখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের তফাৎ নেই। এই জ্ঞান বোধি বা intuition পর্যায়ভুক্ত। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোধি-প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছি। আমাদের মনে হয়, বোধি কোন জ্ঞান নয়। কারণ, বোধি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের। সার্বজনীন বোধি সাধারণতঃ হয় না। জ্ঞান সার্বজনীন। সুতরাং বিচার-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না বলেই বিচারই জ্ঞানের একক, একথা বলতে হয়।

মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখব প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা, বচন আর অনুমান[১] ছাড়া কোন জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞানের এই প্রক্রিয়াগুলি যদি আবার আলোচনা করি তবে বোঝা যাবে বিচার ছাড়া কোন প্রক্রিয়াই হয় না। সুতরাং বিচারকেই জ্ঞানের একক বলতে হয়। আমরা এখন জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার[২] আলোচনা করে একথার সত্যতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব।

(ক) বিচার ও প্রত্যক্ষ (Judgment and Perception)

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্ব থেকে আমরা সংবেদন[৩] লাভ করি। শুধু সংবেদন কোন জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ সংবেদনে আমাদের ইন্দ্রিয় সংক্ষুব্ধ হয় বটে, কিন্তু সংবেদ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা হয় না। সংবেদ্য বস্তুর সামান্যতম ধারণা মনে উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবেদন প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে। কলেজে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় প্রথম সংক্ষুব্ধ হয়, কিছু একটা আছে এমন মনে হয়। তারপর যখন বিচার করি যে ঘণ্টা বাজলো, তখন সংবেদন প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সংবেদনের বিচার ছাড়া প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং বিচার ছাড়া প্রত্যক্ষ হয় না, একথা বলায় কোন বাধা নেই।

১। প্রত্যক্ষ=Perception, স্মৃতি=Memory, কল্পনা=Imagination, সামান্য ধারণা=Concept, বচন=Judgment, অনুমান=Inference

২। Forms

৩। Sensation

(খ) বিচার ও স্মৃতি (Judgment and Memory)

স্মৃতি প্রত্যক্ষেরই পুনর্ভাবনা মাত্র। আজ আকাশের চাঁদ দেখা গেল। এটা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দশ দিন বাদে আমরা এই প্রত্যক্ষীকৃত চাঁদের কথা আবার ভাবতে পারি। তখন তার নাম স্মৃতি। আগেই দেখেছি, বিচার ছাড়া প্রত্যক্ষ হয় না। স্মৃতি যদি প্রত্যক্ষের পুনর্ভাবনা মাত্র হয়, তবে বিচার ছাডা যে স্মৃতিও হবে না তা সহজেই বোঝা যায়।

(গ) বিচার ও কল্পনা (Judgement and Imagination)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর একত্র সমাবেশ করে নূতন কিছু সৃষ্টি করার নাম কল্পনা। আমরা সুন্দরী নারীও দেখেছি, আবার আকাশে ওড়া পাখিও দেখেছি। এখন পাখির পাখা যদি সুন্দরী নারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় তবে যা পাব তা শুধু পাখি বা শুধু মানবী নয়, সে এক নূতন সৃষ্ট সুন্দরী। তার নাম পরী। পরী মানবী নয়, কল্পনা। এই কল্পনার ক্ষেত্রে বিচার যে কার্যকর তা না বুঝিয়ে বললেও চলবে। প্রথম যখন পাখি দেখেছিলাম, তখন সেই প্রত্যক্ষে বিচার ছিল। পরে যখন সুন্দরী নারী দেখলাম তাতেও ত বিচার আছে ; কারণ বিচার ছাড়া যে কোন প্রত্যক্ষই হয় না তা আমরা আগেই বলেছি। আর এই দুই প্রত্যক্ষ মিলে যখন কল্পনা হল তখন তাতেও যে বিচার থাকবে, এ আর বেশী কথা কি!

(ঘ) বিচার ও সামান্য ধারণা (Judgment and Concept)

'ঘাস সবুজ'—একটি বিচার। এই বিচারে 'সবুজ' ও 'ঘাস' দুইটি সামান্য ধারণা। বিভিন্ন সবুজ জিনিস দেখে তাদের সাধারণ রঙকে আমরা 'সবুজ' নাম দিয়ে থাকি। ঠিক এমনি করে নানা জাতীয় ঘাস দেখে তাদের সাধারণ গুণগুলোকে একত্র করে নাম দিই 'ঘাস'। 'ঘাস সবুজ' এই বিচারের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'ঘাস' ও 'সবুজ' এই দুইটি সামান্য ধারণা আমরা প্রথম পেয়েছি ; তারপর ধারণা দুটিকে একত্র করে 'ঘাস সবুজ' এই বিচার করেছি। সেজন্য সাধারণভাবে মনে হয়, সামান্য ধারণা না হলে কোন বিচারই হয় না। অর্থাৎ বিচারের আগেই সামান্য ধারণার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা যদি সামান্য ধারণা-গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আলোচনা করি তবে দেখব প্রতি পদক্ষেপেই বিচার আবশ্যক। যে কোন সামান্য ধারণা গঠন করতে গেলেই প্রত্যক্ষকরণ, বিশ্লেষণ, পারস্পরিক তুলনা,

সামান্যীকরণ ও নামকরণ[১] এসব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ধরা যাক্—'মানুষ' এই সামান্য ধারণা গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রথমতঃ রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বিচার ছাড়া ত প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং এই প্রত্যক্ষকরণের স্তরে বচন অপরিহার্য। তারপর রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিশ্লেষণ করতে হবে। রাম লম্বা ও ফর্সা, তার পশুত্ব ও যুক্তিবোধ[২] আছে। শ্যাম বেঁটে ও কালো, তার পশুত্ব ও যুক্তিবোধ আছে। এমনি করে নানা বিচার করতে হবে। তারপর এদের গুণগুলোর পারস্পরিক তুলনা করতে হবে। দেখতে হবে 'রামের এই গুণ' আর 'শ্যামের এসব গুণ'—এদের মধ্যে মিল কোথায়? দেখলাম—'এদের সকলের মধ্যেই পশুত্ব ও যুক্তিবোধ আছে'। এই তো সামান্যীকরণ। এখানে যে বিচার করা হয়েছে তা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সর্বশেষে পশুত্ব ও যুক্তিবোধবিশিষ্ট সবাইকে 'এরা মানুষ'—এই নামে পরিচয় দিতে হবে। এখানেও বিচার আছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বিচারের ব্যবহার ছাড়া সামান্য ধারণা কখনই পাওয়া যায় না। কাজেই বিচারের আগে সামান্য ধারণা কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ বিচার না করে সামান্য ধারণা করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন সামান্য ধারণা শুধু ত অর্থহীন শব্দ মাত্র নয়, অর্থযুক্ত শব্দ। এই অর্থ বিচার করেই নির্ণয় করা যায়। 'ঘাস সবুজ' এই বিচারে 'সবুজ' ও 'ঘাস' এই দুইটি সামান্য ধারণারই তাৎপর্য বিচার-নির্ভর। 'সবুজ একটি রঙ্', 'এই রঙ্ নীল প্রভৃতি রঙ্ থেকে ভিন্ন' এই জাতীয় কতগুলো বিচারের মাধ্যমেই 'সবুজ' ধারণার তাৎপর্য বোঝা যায়। 'ঘাস' সম্বন্ধেও একই কথা। 'ঘাসের জন্ম মাটিতে', 'ঘাস সহজে হয়' ইত্যাদি বিচারের দ্বারাই 'ঘাস'-এর তাৎপর্য বোঝা যায়। এমনি করে দেখান যায় কোন সামান্য ধারণাই বিচার ভিন্ন বোধগম্য হয় না। সুতরাং সামান্য ধারণা কখনই বিচার ছাড়া হয় না।

(৬) বিচার ও অনুমান (Judgment and Inference)

বিচার ও অনুমানে পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না। কখনও কখনও একটি বিচারেই অনুমান-প্রক্রিয়া লুকিয়ে থাকে। যখন আকাশে মেঘ দেখে ভাবি 'বৃষ্টি হবে', তখন আমার

১। প্রত্যক্ষকরণ—Observa বিশ্লেষণ—Analysis, পারস্পরিক তুলনা—Comparison, সামান্যীকরণ—Generalisation, নামকরণ—Naming

২। Rationality

ভাবনাকে বিচার বা অনুমান উভয়ই বলা যেতে পারে। সুতরাং অনেক সময়ই যে বচন থেকে অনুমানকে আলাদা করা মুশকিল হয়—একথা অস্বীকার করা দায়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—অনুমান কি? আর তার প্রকৃতিই বা কি? আমাদের মনে হয় এক বা একাধিক বিচারের উপর ভিত্তি করে নূতন কোন বিচার করার প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল, রাম মনুষ্য, সুতরাং রাম মরণশীল—এই ভাবনায় একটি অনুমান প্রক্রিয়া নিহিত। এখানে 'রাম মরণশীল'—এই বিচার 'সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল' ও 'রাম মনুষ্য'—এই দুটি বিচারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বিচার ছাড়া যে অনুমান হয় না, তা স্পষ্ট। এক বা একাধিক বিচারের মাধ্যমে স্থাপিত নূতন বিচারকেও অনুমান বলা হয়। এই অর্থে 'সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল, রাম মনুষ্য, সুতরাং রাম মরণশীল' এই ক্ষেত্রে 'রাম মরণশীল' এই বিচারটি অনুমান, কারণ তা 'সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল' এবং 'রাম মনুষ্য' এই দুটি বিচারের মাধ্যমে স্থাপিত। বলা বাহুল্য, এই অর্থেও বিচার ছাড়া অনুমান হয় না।

অনুমানের এই ধারণা থেকে আমরা অনুমানের প্রকৃতি নিরূপণ করতে পারি। প্রত্যেক অনুমানেরই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার। এই ক্ষেত্রে আমরা 'বিচার' শব্দটি ব্যবহার না করে 'বচন' শব্দটি ব্যবহার করেছি। ভাষায় প্রকাশিত বিচারই বচন এই কথা মনে রেখে আমাদের আলোচনা ভাষায় প্রকাশিত বলে 'বিচার'-এর পরিবর্তে 'বচন' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক অনুমানে এক বা একাধিক প্রদত্ত বচন বা প্রতিজ্ঞা থাকবে। একটি প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করে যে অনুমান হয় তার নাম অমাধ্যম অনুমান[১]। 'সকল মানুষ মরণশীল, সুতরাং কতকগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ'—এই জাতীয় অনুমান। আর একাধিক প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে যে অনুমান হয় তার নাম সমাধ্যম অনুমান।[২] 'সকল মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল'—এই অনুমানের উদাহরণ। অবশ্য সমাধ্যম অনুমানে সব সময়েই যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা উক্ত হবে তার কোন মানে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিজ্ঞা থেকে অনুমানে যে বচনটি গৃহীত হয় তার নাম সিদ্ধান্ত। 'সকল মানুষ মরণশীল' সুতরাং 'কতগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ'—এই অনুমানে 'কতগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ' এই বচনটি সিদ্ধান্ত।

১। Immediate Inference

২। Mediate Inference

তৃতীয়তঃ, সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি মাত্র নয়। নূতন কথা সিদ্ধান্তে না পাওয়া গেলে অনুমান সার্থক হয় না। অবশ্য এই নূতন কথা ব্যক্তিবিশেষের কাছে নূতন কথা হতে পারে, আবার তা বস্তুগত সর্বজনগ্রাহ্য নূতন কথাও হতে পারে। যখন আমরা বলি—'সকল মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল', তখন অনেকে[১] বলেন এখানে 'রাম মরণশীল' বলার মধ্যে ত কোন নূতন কথা নেই। 'সকল মানুষ মরণশীল' বলার মধ্যেই রাম মানুষ হিসেবে যে 'মরণশীল' তা বলা হয়েছে। অন্যেরা (যেমন Keynes) বলবেন, বস্তুতঃ (objectively) হয়ত তাই; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কাছে 'রামের মরণশীলতা' একটা নূতন কথাই ত বটে, কারণ 'রাম মানুষ' একথা জানার পরই ত তিনি রাম যে মরণশীল তা বুঝতে পারেন। 'সকল মানুষ মরণশীল' বললেই হয়ত বস্তুতঃ রামের মরণশীলতার ইঙ্গিত তাতে থাকে কিন্তু এই ইঙ্গিত ব্যক্তিবিশেষের কাছে বোধগম্য ত নাও হতে পারে। তার কাছে রামের মরণশীলতা যে এক নূতন খবর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য অন্য কতগুলো সিদ্ধান্তে বস্তুগত নূতনত্বই পাওয়া যায়। যেমন ধরুন—রাম মরণশীল, শ্যাম মরণশীল, যদু মরণশীল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে যখন আমরা সিদ্ধান্ত করি 'সকল মানুষই মরণশীল', তখন এই সিদ্ধান্তে বস্তুগত নূতনত্বের কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। 'সকল মানুষ মরণশীল' বললে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের মরণশীলতা বোঝায়। কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞায় আমরা এত মানুষের মরণশীলতা কখনই প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সুতরাং এখানে সিদ্ধান্তে যে বস্তুগত নূতন কথা আছে, তা মানতেই হবে।

চতুর্থতঃ, অনুমানে প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ (necessary connection) আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সিদ্ধান্ত মাত্রেই নির্ভুল। এর আসল অর্থ হচ্ছে—প্রতিজ্ঞাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বাধ্যবাধকভাবে সিদ্ধান্ত দেখা দেয়। আমরা যে কোন প্রতিজ্ঞা থেকে খেয়ালখুশীমত যে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না। 'কোন কুকুরই পাখি নয়' আর 'সকল কুকুরই পশু'—এই দুটো প্রতিজ্ঞা থেকে 'কোন পশুই পাখি নয়' বা 'কোন কোন

১। Mill মনে করেন, এই জাতীয় সিদ্ধান্তে কোন নূতন কথাই বলা হয় না। এখানে প্রতিজ্ঞায় যা বলা হয় সিদ্ধান্তে তারই সমর্থন পাওয়া যায় মাত্র। এক কথায় এই জাতীয় অনুমানে সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞাকে সমর্থন করে; কিন্তু কোন নূতন কথা বলে না। 'রাম মরণশীল' বললে 'সকল মানুষ মরণশীল' এই প্রতিজ্ঞাটি সমর্থিত হয়। অর্থাৎ 'রাম মরণশীল' বললে 'সমস্ত মানুষ যে মরণশীল' এ কথার সত্যতা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। কিন্তু 'রাম মরণশীল' এ কথা 'সকল মানুষ মরণশীল' এ কথায় অতিরিক্ত কোন নূতন কথা নয়।

পশু পাখি নয়'—এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এখানে প্রথম সিদ্ধান্তটি ভুল ও দ্বিতীয়টি শুদ্ধ। কিন্তু তা বলে পূর্বোদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা দুটো থেকে 'কুকুর মানুষ নয়' এমন ধরনের সিদ্ধান্ত কখনই করা যাবে না। যদি এমন সিদ্ধান্ত কেউ করে তবে লোকে তাকে পাগল বলবে। এই সিদ্ধান্ত যে করা যায় না তার কারণ এই সিদ্ধান্ত পূর্বোদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা দুটো থেকে বাধ্যবাধকভাবে কখনই পাওয়া যায় না। যে সিদ্ধান্ত বাধ্যবাধকভাবে প্রতিজ্ঞা থেকে পাওয়া যায় না তা সিদ্ধান্ত পদবাচ্যই নয়।

অনুমান সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বচন ছাড়া কোন অনুমানই হতে পারে না। প্রত্যেক অনুমানেই এক বা একাধিক বচন থাকে। শুধু তাই নয়। অনুমান-প্রক্রিয়ায় আর বিচার-প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যখন আমরা নদীর ঘোলা জল দেখে বলি—'খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়েছে' তখন এটা বিচার-প্রক্রিয়া (Judging), না অনুমান প্রক্রিয়া (Inference) তা বলা মুশকিল। আমাদের মনে হয়, এটা বিচার ও অনুমান-প্রক্রিয়া উভয়ই। বিচার-প্রক্রিয়ায় কোন কিছু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। রামকে দেখে যখন বলি—'রাম লম্বা'—তখন যে বিচার-প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয় তা সবাই স্বীকার করবেন। আর এই প্রক্রিয়া যে রাম নামক এক ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা কি অস্বীকার করা যাবে? অনুমান-প্রক্রিয়াও আসলে ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া। যখন 'সকল মানুষ মরণশীল' ও 'রাম মানুষ' বলে 'রামকে মরণশীল' বলা হয়, তখন রামের মরণশীলতার একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়। রাম মরণশীল কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়—যেহেতু সকল মানুষ মরণশীল ও রাম মানুষ, সে জন্যই সে মরণশীল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিচার-প্রক্রিয়ার মত অনুমান-প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া। তবে অনুমান-প্রক্রিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার-প্রক্রিয়ার চেয়ে ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়ায় জটিলতা বেশী। বিচার-প্রক্রিয়ায় 'রাম মরণশীল' বলেই রামের ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু অনুমান-প্রক্রিয়ায় সকল মানুষের মরণশীলতা ও রামের মানবতার ওপর ভিত্তি করে রামের মরণশীলতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং অনুমান-প্রক্রিয়াকে জটিলতর বিচার-প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। আর যদি তাই হয় তবে অনুমান যে বিচার ছাড়া কখনই হবে না, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেউ কেউ বলেন, বিচার যখনই তার কারণ বা হেতু সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই অনুমান গড়ে ওঠে। 'রাম মরণশীল' একটি বিচার। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—রাম মরণশীল কেন? তবে

বলতে হবে সমস্ত মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল। অর্থাৎ বিচারের কারণ বা হেতু সম্বন্ধে সচেতন হলেই অনুমান হয়। এই দিক থেকেও বিচার ও অনুমানের সম্পর্ক যে নিবিড় তা বোঝা যায়।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের কোন প্রক্রিয়াই (প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা ও অনুমান) বিচার ছাড়া হয় না। সুতরাং বিচারকেই জ্ঞানের সরলতম প্রকাশ বা একক বলা যেতে পারে।

অনুমানের প্রকারভেদ ও তাদের সম্পর্ক

অনুমান সাধারণভাবে দু'রকম হতে পারে—আরোহানুমান (Induction) ও অবরোহানুমান (Deduction)।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা থেকে সামান্য সিদ্ধান্তে বা ঐকিক প্রতিজ্ঞা থেকে ঐকিক সিদ্ধান্তে অথবা স্বল্পতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে যে অনুমান-প্রক্রিয়ার দরকার তার নাম আরোহানুমান। আবার এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় তাকেও আরোহানুমান বলে।

দৃষ্টান্ত :—

(ক) বিশেষ প্রতিজ্ঞা থেকে সামান্য সিদ্ধান্ত

(Universal Conclusion from Particular Premise)

অসিত মরণশীল
অমর মরণশীল
অমল মরণশীল
∴ সব মানুষই মরণশীল।

(খ) ঐকিক প্রতিজ্ঞা থেকে ঐকিক সিদ্ধান্ত

(A Singular Conclusion from a Singular Premise)

মাধুরীর জ্বর কুইনাইনে সেরেছে
∴ শ্যামলীর জ্বরও তাতেই সারবে

(গ) স্বল্পতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর সামান্য সিদ্ধান্ত

(A more Universal Conclusion from less Universal Premise)

সকল বাঙ্গালী মরণশীল
সকল উৎকলবাসী মরণশীল
∴ সকল মানুষ মরণশীল।

এই সমস্ত আরোহানুমানের লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে যেতে খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সমস্ত প্রতিজ্ঞাই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ঘোষণা করা হয়েছে। সিদ্ধান্তে যা বলা হচ্ছে—অভিজ্ঞতায় তৎক্ষণাৎ তা পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্ত যাত্রা সব সময় নিরাপদ বলেও মনে হচ্ছে না। 'ক' উদাহরণে অসিত, অমর ও অমলের মরণশীলতার ওপর নির্ভর করে—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের মরণশীলতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সকল মানুষের মরণশীলতা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। সুতরাং মাত্র তিনজন লোকের মরণশীলতা থেকে সব মানুষের মরণশীলতার কথা বলতে মনে একটু অনিশ্চয়তা আছে বৈকি। এরকমভাবে দেখান যেতে পারে যে 'খ' ও 'গ' উদাহরণেও প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে পৌছতে একটু অনিশ্চয়তা থাকে।

এই ত গেল আরোহানুমানের কথা। অন্যদিকে সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে বা অধিকতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে স্বল্পতর সামান্য সিদ্ধান্তে পৌছতে যে অনুমান দরকার তার নাম—অবরোহানুমান। এই ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থাপিত সিদ্ধান্ত দুই-ই অবরোহানুমান নামে পরিচিত।

উদাহরণঃ —

(ক) সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত

(A Particular Conclusion from a Universal Premise)

সকল মানুষ মরণশীল
কোন কোন মানুষ কবি
∴ কোন কোন কবি মরণশীল

(খ) অধিকতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে স্বল্পতর সামান্য সিদ্ধান্ত

(A less Universal Conclusion from a more Universal Premise)

সকল মানুষ মরণশীল
সকল বাঙ্গালী মানুষ
∴ সকল বাঙ্গালী মরণশীল

অবরোহানুমানের সিদ্ধান্তে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। সিদ্ধান্ত তর্কবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা থেকে সুনিশ্চিতভাবে দেখা দেয়।

অবরোহানুমান আবার দু'রকম হতে পারে—অমাধ্যম (Immediate) ও সমাধ্যম (Mediate)। অমাধ্যম অবরোহানুমানে একটি প্রতিজ্ঞা থেকেই সরাসরি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। 'সকল কবিই মানুষ, সুতরাং কতিপয় মানুষ কবি'—এই অনুমানটি অমাধ্যম অবরোহানুমান। এখানে 'কতিপয় মানুষ কবি' এই সিদ্ধান্ত 'সকল কবিই মানুষ' এই প্রতিজ্ঞাটি থেকে সরাসরি পাওয়া গেছে। আবার যখন অবরোহানুমানে একাধিক প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্ত 'পাওয়া যায় তখন তার নাম সমাধ্যম অবরোহানুমান। যখন বলি—'সকল মানুষ মরণশীল', 'রাম মানুষ', সুতরাং 'রাম মরণশীল', তখন 'রাম মরণশীল' এই সিদ্ধান্ত 'সকল মানুষ মরণশীল' ও 'রাম মানুষ' এই দুটি প্রতিজ্ঞার মিলিত সাহায্যের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়ে থাকে। সুতরাং এই অবরোহানুমানটি অমাধ্যম নয়, সমাধ্যম।

অবরোহ ও আরোহানুমানের প্রকৃতি বোঝা গেল। এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অবরোহানুমানের সিদ্ধান্ত কখনই প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর ব্যাপক হয় না। কিন্তু আরোহানুমানের সিদ্ধান্ত কখনই প্রতিজ্ঞা থেকে কম ব্যাপক হয় না। অবরোহানুমানে প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে যাওয়ার পথে কোন অনিশ্চয়তা বা বিপদ নেই, কিন্তু আরোহানুমানে সর্বদাই একটু অনিশ্চয়তা ও বিপদের ভয় থাকে। সুতরাং অবরোহ ও আরোহ দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া।

কেউ কেউ আরোহ ও অবরোহানুমানের মধ্যে একটিকে আর একটির চেয়ে প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা ও মৌলিকতা সমান। বিশেষের সঙ্গে সামান্যের সংযোগই[১] সকল ব্যাখ্যার কাজ। এই সংযোগ বিশেষকে সামান্যের অধীনে এনেও দেখান যায়, আবার বিশেষ থেকে সামান্যের আগমন দেখিয়েও দেখান যায়। প্রথম প্রক্রিয়া অবরোহানুমানে আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া আরোহানুমানে গৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং অবরোহ ও আরোহানুমান দুই-ই ব্যাখ্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ দুই প্রক্রিয়া। একটি আর একটির চেয়ে কম মৌলিক বা কম প্রয়োজনীয় এমন কথা কখনই বলা যায় না।

১। Relation between the Universal and the Particular

বিচারের বৈশিষ্ট্য

(The Characteristics of a Judgment)

বিচার কাকে বলে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন বিচারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব।

প্রথমতঃ, যে কোন বিচারেই কোন না কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিচার করা হয়। এই বিচার ভাষায় প্রকাশিত হলেই বচন হয়। এই বচন সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। সুতরাং বচন সত্য বা মিথ্যা এ দুটোর একটা হবেই। 'সকল মানুষ কবি' এটা যেমন একটি বচন, আবার 'সকল মানুষই মরণশীল' এটা তেমনি আর একটি বচন। এদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, প্রথম বচনটি মিথ্যা আর দ্বিতীয়টি সত্য।

দ্বিতীয়তঃ, যে কোন বিচারই সার্বজনিকত্ব (Universality) দাবী করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, সব বিচারই সামান্য বিচার (Universal judgment) বলে পরিচিত হ'তে পারে। 'সকল মানুষ মরণশীল'—একটি সামান্য বিচার। এখানে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' কাউকে বাদ না দিয়ে সব মানুষকেই বোঝাচ্ছে। এমনি করে যে বিচারের উদ্দেশ্য পদ সেই পদ-নির্দিষ্ট সবাইকে বোঝায় তার নাম দেওয়া হয় সামান্য বিচার। এই অর্থে সব বিচার কখনই সার্বজনিকত্ব দাবী করতে পারে না। কিন্তু বিচারের যৌক্তিকতা যে সবাই স্বীকার করবে এমন আশা বা দাবী সব বিচারের পেছনেই আছে। এই অর্থে সব বিচারেই সার্বজনিকত্ব দাবী করতে পারে। যখন আমরা বিচার করি যে, 'ফুলটি লাল' তখন আমরা এ আশাও করি যে সকলেই ফুলটিকে লাল বলেই বিচার করবে। এ আশা হয়ত সর্বত্র সফল হবে না, কিন্তু প্রত্যেক বিচারেই এরকম দাবী করার অধিকার আছে। যদি তা না থাকত তবে বিচার আর নিছক কল্পনায় কোন তফাৎ থাকত না। যখন একজনের বিচার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বচনের রূপ নেয় তখন তা যদি আর একজনের স্বীকৃতি পাবার দাবী না করতে পারে, তবে পারস্পরিক আলোচনাই সম্ভব হবে না। আর তার ফলে সামাজিক ব্যবহার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বিচারই নিশ্চয়াত্মক (necessary)। এই 'নিশ্চয়াত্মক' শব্দ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকার খুবই সম্ভাবনা আছে। সাধারণ লোকের

ধারণা—নিশ্চয়াত্মক বিচার নিশ্চয় করে কিছু বলে। এই অর্থে 'সে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করে' একটি নিশ্চয়াত্মক বিচার। সব বিচার কখনই এই অর্থে নিশ্চয়াত্মক হ'তে পারে না।

'নিশ্চয়াত্মক' শব্দের আর একটি অর্থ আছে। সেই অর্থেই সব বিচার নিশ্চয়াত্মক। কোন বিচার করার সময়ে কোন ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। এই অর্থে বিচার নিশ্চয়াত্মক। যে বস্তু সম্বন্ধে বিচার করা হয় তার প্রকৃতি বিচারের রূপ নির্ণয় করে। যার যা খুশি সে তাই কোন বস্তু সম্বন্ধে ভাবতে পারে না। যখন ভাবি—ছেলেটি লম্বা তখন ছেলেটির আকৃতি আমাকে তাকে লম্বা ভাবতে বাধ্য করে। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে বেঁটে বলে ভাবতে পারি না। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন বিচারই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেক বিচার পূর্ববর্তী অনেক বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ববর্তী বিচার থেকে নূতন বিচার নিশ্চয়াত্মক ভাবে অনুসৃত হয়। অর্থাৎ পূর্বে পূর্বে আমরা যেমন বিচার করেছি তাতে নূতন বিচারটি যেমন ভাবে করেছি তেমন ভাবে করতে আমরা বাধ্য। বিচারের নিশ্চয়তা এভাবেও বোঝা যায়।

কেউ কেউ মনে করেন[১], কোন বিচারই নিজে নিজে নিশ্চয়তা দাবী করতে পারে না। তাঁদের মতে অন্য বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই সব বিচার নিশ্চয়তা দাবী করে, সুতরাং বিচারের নিশ্চয়তা অমাধ্যম নয়, সমাধ্যম। যেমন ধরুন 'বইটি ভাল নয়' এই বিচারের নিশ্চয়তা অন্য দুটি বিচার যেমন—'কোন বইতে বক্তব্য বিষয় খারাপ ও লেখা খারাপ হলে বই ভাল হয় না' ও 'এ বইটির বক্তব্য ও লেখা দুই-ই খারাপ'-এর ওপর নির্ভর করছে।

এ বিষয়ে কিন্‌সের (Keynes) বক্তব্য আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন—বিচারের নিশ্চয়তা সমাধ্যম নয়, অমাধ্যমই বটে। কোন বিচারে যদি নিজে নিজে নিশ্চয়তাশূন্য হয়, তবে যে কোন বিচারই তার সমর্থনে আনা হোক্ না কেন তাতে তার নিশ্চয়তা উৎপন্ন হবে না। যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না। সুতরাং কোন বিচারের নিশ্চয়তা সেই বিচারের মধ্যেই আছে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বিচার-প্রক্রিয়াতেই বিশ্লেষণ (Analysis) ও সংশ্লেষণ (Synthesis)—এই দুই প্রক্রিয়া বর্তমান অর্থাৎ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ছাড়া কোন বিচারই সম্ভব নয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'ফুলটি সুন্দর' এই বিচার করতে গেলে প্রথমতঃ ফুল ও সৌন্দর্য—এই দুটি ধারণা আলাদা আলাদা

১। 'Necessity is always mediate and not immediate.'—*Creighton*.

বুঝতে হবে। অর্থাৎ ফুল কি আর সৌন্দর্য কি তা আগে না বুঝলে 'ফুলটি সুন্দর' এমন বিচার কখনই করা যাবে না। এরকম করে কোন কিছু বোঝার নাম বিশ্লেষণ। আবার আলাদা করে ফুল আর সৌন্দর্যের ধারণা করেই আমাদের মন খুশী হয় না। আমরা দুটো ধারণাকে একত্র মিলিয়ে দিয়ে বিচার করি যে 'ফুল সুন্দর'। এই প্রক্রিয়ার নাম সংশ্লেষণ। এরকম করে সমস্ত বিচারেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ—এই দুই প্রক্রিয়া বর্তমান বলে বোঝা যায়।

পঞ্চমতঃ, বিচারমাত্রই নির্বাচনাত্মক (Selective)। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে যখন বিচার করি তখন অন্যান্য বিষয় থেকে সেই বিষয়টিকে যেমন আলাদা করে নির্বাচন করে থাকি তেমনি আবার সেই বিষয়ের কোন না কোন একটি গুণ নির্বাচন করে তার সম্বন্ধে বিচার করি। একই সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত বিষয় নিয়ে যেমন বিচার করি না তেমনি একটি বিষয়ের সমস্ত গুণ নিয়েও বিচার করি না। যখন আমরা 'গোলাপ ফুল' নিয়ে বিচার করি তখন অন্যান্য ফুল থেকে তাকে আলাদা করে বেছে নিই এবং সমগ্র ফুল নিয়ে বিচার না করে তার বর্ণ বা গন্ধ বা আয়তন বা অন্য কোন দিক নিয়ে বিচার করি। সুতরাং বিচার যে নির্বাচনাত্মক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ষষ্ঠতঃ, বিচারমাত্রই এক জ্ঞান-মণ্ডলী[১] রচনা করে। যখন আমরা ভাবি 'হরিণটি সুন্দর', তখন 'হরিণ একটি পশু', 'হরিণ সাধারণতঃ বনে থাকে', 'হরিণের গায়ের চামড়া সুন্দর চিত্রিত', 'হরিণের চোখ দেখবার মত'—এই জাতীয় নানা বিচার মনে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণকে ঘিরে একটি জ্ঞান-মণ্ডলী গ'ড়ে ওঠে। এই রকম করে প্রত্যেক বিচারই জ্ঞান-মণ্ডলী রচনা করে থাকে। কথাটি অন্য ভাবেও বোঝা যায়। যে কোন বিচারই অন্য অনেক বিচারের ওপর নির্ভর করে গ'ড়ে ওঠে এবং অনেক বিচারের সৃষ্টিও করে। এই ভাবেই একটি বিচার জ্ঞান-মণ্ডলী রচনা করে। 'ফুলটি লাল' এই বিচার ফুল এবং লাল রঙ বিষয়ে বিভিন্ন বিচারের ভিত্তিতেই করা সম্ভব। যে ফুল এবং লাল রঙ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না সে কখনই 'ফুলটি লাল' এই বিচার করতে পারে না। 'ফুলটি লাল' এই বিচার আবার 'ফুলটি সুন্দর', 'ফুলটি টকটকে লাল' এই জাতীয় বিচার সৃষ্টি করে।

১। System of Knowledge

বিচারের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Judgment)

বিভিন্ন দিক থেকে বিচারের নানা রকম শ্রেণীবিভাগ হ'তে পারে। চিন্তার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে গুন-বিষয়ক বিচার, পরিমাণ-বিষয়ক বিচার, কার্যকারন-সম্বন্ধবিষয়ক বিচার ও উদ্দেশ্য-বিষয়ক বিচার পাওয়া যেতে পারে। অন্য দিক্ থেকে ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক বিচার, তথ্য-বিষয়ক বিচার ও মূল্যজ্ঞাপক বিচারও পাওয়া সম্ভব। আমরা এখন এসব বিভিন্ন প্রকারের বিচারের একটু বিষদ আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, এই সমস্ত বিভিন্ন বিচার ভাষায় প্রকাশিত হলেই একই নামের বিভিন্ন বচনের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, গুন-বিষয়ক, পরিমাণ-বিষয়ক, কার্যকারণ-বিষয়ক, উদ্দেশ্য-বিষয়ক, ভাবাত্মক, নিষেধাত্মক, তথ্যবিষয়ক এবং মূল বিষয়ক বিচার ভাষায় প্রকাশিত হলেই এরা যথাক্রমে গুন-বিষয়ক, পরিমাণ বিষয়ক, কার্যকারণ-বিষয়ক, উদ্দেশ্য-বিষয়ক, ভাবাত্মক, নিষেধাত্মক, তথ্য-বিষয়ক এবং মূল্য-বিষয়ক বচন রূপে পরিচিত হয়। যে কোন গ্রন্থই ভাষা-নির্ভর বলে অধিকাংশ গ্রন্থেই বিচারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Judgments) না বলে বচনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Propositions) বলা হয়। তবে বচনের পশ্চাৎপটে যে বিচার বর্তমান তার ভিত্তিতে বিচারের শ্রেণীবিভাগ বললে কিছু দোষের হয় বলে মনে করি না। বিচার মানসিক হলেও যেমন বিচার সম্বন্ধে গ্রন্থে লেখা হয় তেমনি বিচারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে লেখা যেতে পারে। তবে ভাষায় প্রকাশিত রূপে এদের যদি কেউ বচনের শ্রেণীবিভাগ বলেন তবে তাতেও কিছু দোষের হয় বলে মনে হয় না।

(ক) অভিজ্ঞতার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়ে তার চিন্তার মধ্যে ততই জটিলতা দেখা দেয়। শিশুর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সরল। কৈশোরে মানুষের চিন্তা আর একটু জটিলতর রূপ ধারণ করে। যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে মানুষের চিন্তা ক্রমশঃ আরও আরও জটিলতর হ'তে হ'তে জটিলতম আকার নেয়।

বস্তুর গুণই সর্বপ্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু 'ফুলটি লাল', 'আকাশ নীল', 'গাছের পাতা সবুজ' এই জাতীয় বিচারই প্রথম করতে পারে।

বস্তুর রঙ, গন্ধ, স্পর্শ শিশুকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। সেজন্য শিশুর বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুর এই জাতীয় গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সব বিচারের নাম **'গুণ-বিষয়ক বিচার' (Judgment of Quality)**।

মানবশিশু যতই কৈশোরের দিকে এগুতে থাকে ততই তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তখন পরিমাণ সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার হতে থাকে। সে তখন 'হাস্নুহানার গন্ধ গোলাপের গন্ধের চেয়ে তীব্র', 'দুধের ফেনার মত সাদা জিনিস পাওয়া মুশকিল'—এই জাতীয় তুলনামূলক **'পরিমাণ-বিষয়ক বিচার' (Judgment of Quantity)** করতে শুরু করে। হাস্নুহানার গন্ধের তীব্রতার পরিমাণ যে গোলাপের গন্ধের তীব্রতার চেয়ে বেশী, দুধের ফেনা যে অনেক বস্তুর চেয়েই বেশী সাদা—এসব বোধ তখন শিশুর মনে জাগ্রত হয়।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অথবা যৌবনে মানুষের বুদ্ধি আরও পরিপক্ক হয়। তখন সে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কার্যকারণসম্পর্ক উপলব্ধি করে। দুধ থেকে দই হয়, তিল থেকে তৈল হয়, সূতা থেকে কাপড় হয়—এই জাতীয় নানা অভিজ্ঞতা থেকে কিশোর ও যুবক ক্রমশঃ বুঝতে শেখে যে, সমস্ত কার্যেরই একটা না একটা কারণ আছে। এরকম করে কার্যকারণসম্পর্কে যখন মানুষের ধারণা হয়ে যায়, তখন সে **'কার্যকারণ-বিষয়ক নানা বিচার'ই (Judgment of Causal Connection)** করে থাকে। সেই সময় তাকে 'চিরুনি প্লাষ্টিক ও হাড় উভয়েরই হতে পারে', 'শৈশবের শিক্ষা মানুষের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে'—এই জাতীয় কার্যকারন-বিষয়ক নানা বিচার করতে দেখা যায়।

কার্যকারন সম্পর্কের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বা পরপরই মানুষ বস্তুর সমগ্রতা, উদ্দেশ্য, অংশ-অংশী-সম্পর্ক প্রভৃতি জটিল জিনিস বুঝতে শেখে। তখন সে জাগতিক সৌন্দর্য ও বিভিন্ন বস্তুর সুষ্ঠু সমাবেশ দেখে জগতের পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করে। তখন সে ভাবতে শেখে 'জগৎ উদ্দেশ্যহীন নয়', 'পালক পাখিকে রোদ, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে রক্ষা করে' অথবা 'প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করার জন্যই ফুলের রঙ।' এই সমস্ত বিচারই **'উদ্দেশ্য-বিষয়ক' (Judgment of Purpose)**[১], কারণ এগুলিতে যথাক্রমে জগতের উদ্দেশ্য, পাখির পালকের উদ্দেশ্য ও প্রজাপতির রঙের উদ্দেশ্যই বিচার্য বিষয়। গাছের শাখার সঙ্গে কাণ্ডের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক একথাও মানুষ তখন বুঝতে শেখে। মানবদেহের যে কোন অংশ

১। উদ্দেশ্য-বিষয়ক বচনকে Teleological Judgment অথবা Judgment of Individualityও বলা হয়।

কেটে নিলে যে আর সহজে জোড়া দেওয়া যায় না এই বোধও তার জাগ্রত হয়। উদ্দেশ্য-বিষয়ক বিচার এই সমস্ত বিষয়েও হতে পারে। মানুষের বুদ্ধি সম্যক পরিপক্ক হলেই এই জাতীয় বিচার সম্ভব। শিশু এরকম বিষয় ভাবতেও পারে না।

(খ) ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক বিচার (**Positive and Negative Judgments**)

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়ের প্রয়োগ-প্রক্রিয়াকে বিচার বলে। এই প্রয়োগ ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক দু'রকম হতে পারে। 'রাম ভাল ছেলে'—এই বিচারে 'রাম' উদ্দেশ্য ও 'ভাল ছেলে' বিধেয় এবং এখানে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয় ভাবাত্মক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এই বিচারের নাম—'**ভাবাত্মক বিচার**' (**Positive Judgment**)। আবার যখন ভাবি 'ফুলটির গন্ধ নাই' তখন 'ফুল' এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'গন্ধ' নিষেধাত্মক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। এই বিচারের নাম '**নিষেধাত্মক বিচার**' (**Negative Judgment**)। সোজা কথায় যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে মিল ভাবি তখন বিচার হয় ভাবাত্মক, আর যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে অমিল থাকে তখন বিচার হয় নিষেধাত্মক।

(গ) তথ্য-বিষয়ক বিচার ও মূল্য-জ্ঞাপক বিচার (**Judgment of Fact and Judgment of Value.**)

তথ্য-বিষয়ক বিচার ও মূল্য-জ্ঞাপক বিচার বুঝতে গেলে প্রথমেই তথ্য ও মূল্যের[১] স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝতে হবে। জগতে যা আছে, ঘটে বা প্রকাশিত হয় তারই নাম তথ্য। ফুল, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এসবই তথ্য। কিন্তু আর এক জাতীয় বস্তু আছে যা আমাদের কাছে আদর্শ হিসাবে দেখা দেয়—তারই নাম মূল্য। সত্য, শিব ও সুন্দর[২] এই জাতীয় পদার্থ। ফুলকে আমরা জগতে যে ভাবে থাকতে দেখি সেভাবে সত্য, শিব ও সুন্দর কখনও থাকে না। বস্তুর মূল্য নিরূপন করতে গিয়েই আমরা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত প্রভৃতি নানারকম বলে থাকি। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দর জাগতিক বস্তুর মত জায়গা জুড়ে না থেকে বস্তুর মূল্যায়নে মানুষের বিভিন্ন মূল্যবোধ প্রকাশ করে থাকে। এই সব মূল্যের প্রকাশ জাগতিক কোন বস্তুতেই পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুর মূল্য-বিচারে এগুলো যেন ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ। এই সব আদর্শের মাপকাঠিতেই আমরা বস্তুর মান বা মূল্য ঠিক করি। কোন একটি কথাকে সত্য, কোন একটি

১। তথ্য—Fact, মূল্য—Value

২। সত্য—Truth, শিব—Goodness, সুন্দর—Beauty

ছেলেকে ভালো আবার কোন একটি দৃশ্যকে সুন্দর আমরা প্রতিনিয়ত বলি। এই সব বলার পেছনে কথা, ছেলে ও দৃশ্যের মূল্য-নিরূপণের প্রবৃত্তি কাজ করে। এই মূল্য-নিরূপণ আবার সত্য, ভালো (শিব) ও সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে তার কতটুকু এই বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণ হ'ল তার ওপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে।

তথ্য ও মূল্যের পার্থক্য খানিকটা আলোচনা করা গেল। এখন তথ্যবিষয়ক বিচার ও মূল্য-জ্ঞাপক বিচারের সম্পর্ক আলোচনা করতে হবে। যখন কোন বিচার কোন তথ্য সম্বন্ধে করা হয় তখন তার নাম তথ্যবিষয়ক বিচার। উদাহরণ হিসাবে 'ফুলটি লাল', 'নির্মেঘ আকাশ'—এই জাতীয় বিচারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিচারের প্রথমটিতে ফুলের রঙ আর দ্বিতীয়টিতে আকাশের মেঘহীনতা বিচার্য বিষয়।

অন্যদিকে আমরা যখন কোন কিছুর মূল্য বিচার করি তখন তার নাম মূল্যবিষয়ক বিচার। রাম একটি ছেলে। ছেলে হিসেবে তার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে যখন আমরা ভাবি 'রাম ভাল ছেলে' তখন এই বিচার মূল্য-বিষয়ক। এখানে রামের কোন সাধারণ বর্ণনা বিচার্য নয়, এখানে রামের মূল্যই বিচার্য। আবার ধরুন, যখন ভাবি 'কথাটা সত্য' অথবা 'ফুলটি সুন্দর'—তখন এই দুটি বিচার যথাক্রমে কথা ও ফুলের মূল্য-বিষয়ক। 'আকাশ নীল' আর 'আকাশ সুন্দর' —এই দুটি বিচারের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে আকাশের রঙ্ আর দ্বিতীয়টিতে আকাশের মূল্য বিচার্য। প্রথমটি তথ্য-বিষয়ক বিচার আর দ্বিতীয়টি মূল্য-বিষয়ক।

কখনও কখনও অন্য আর একদিক থেকেও তথ্য-বিষয়ক বিচার ও মূল্য-জ্ঞাপক বিচারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। তথ্য-বিষয়ক বিচারে আমরা কোন একটা বস্তু সম্বন্ধে (about) বিচার করি। কিন্তু মূল্য-জ্ঞাপক বিচারে কোন বিষয়ের ওপর (upon) তার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিচার্য। 'বইটি নীল-মলাটযুক্ত' এই তথ্য-বিষয়ক বিচারে বইটির মলাট সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা 'বইটি ভালো' এই মূল্য-জ্ঞাপক বিচার করি তখন বইয়ের ওপর তার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিচার করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান

(Epistemology or the Theory of Knowledge)

জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা। দর্শনের এই অংশে জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উপাদান, জ্ঞানের সীমা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়ে থাকে। তর্ক-বিজ্ঞান[১] ও মনোবিজ্ঞানেও[২] জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনার চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের। আমরা এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তর্কবিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করব।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

(Epistemology, Logic & Psychology)

জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উপাদান, জ্ঞানের প্রাগুপকরণ[৩], জ্ঞানের পরিধি প্রভৃতি নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। তর্কবিজ্ঞান জ্ঞানের সত্যতার আকার নির্ণয় করে। কি রকম আকার-প্রকারের মধ্য দিয়ে জানলে জ্ঞান সত্য হবে—এই আলোচনাই তর্কবিজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান হওয়ার পর তার সত্যতা নিরূপণই তর্ক-বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজ আরও গভীর ও মূলস্পর্শী[৪]। কি কি উপকরণের সমাবেশ হলে জ্ঞান হয় তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান অলোচনা করে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা জ্ঞানের সম্ভাবনা নিরূপণ করে। জ্ঞান সম্ভব হলেই তার সত্যতার প্রশ্ন ওঠে। তর্ক-বিজ্ঞান জ্ঞানের সত্যতার রূপ নির্ধারণ করে। সুতরাং তর্কবিজ্ঞানীর কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানীর কাজের উপর নির্ভর করে।

মনোবিজ্ঞান শুধু জ্ঞানেরই আলোচনা করে না—জ্ঞান, অনুভূতি[৫] ও ইচ্ছা[৬] এই তিন নিয়েই আলোচনা করে। এইদিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য সুস্পষ্ট। জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে, অনুভূতি বা ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানালোচনা

১। Logic　　২। Psychology

৩। Pre-conditions　　৪। Fundamental

৫। Feeling　　৬। Willing

আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞানালোচনার মধ্যেও যথেষ্ট তফাৎ আছে। আমাদের জ্ঞান যেভাবে হয় এবং যে সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়, মনোবিজ্ঞান তার বর্ণনা দিয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, সামান্য ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়াই মনোবিজ্ঞনের কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিন্তু জ্ঞানের বর্ণনা দেওয়া হয় না ; জ্ঞানোৎপত্তির মূলে কি কি উপাদান থাকে তাই আলোচনা করা হয়। কোন্ কোন্ উপাদান বা উপকরণ না হ'লে জ্ঞান সম্ভবই নয় তা বের করাই জ্ঞান-বিজ্ঞানীর কাজ। শুধু তাই নয়। মানুষ কতটুকু জানতে পারে, অতীন্দ্রিয় বিষয় জানা যায় কিনা—এই জাতীয় প্রশ্নও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মনোবিজ্ঞান এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞানের উপাদান বা উপকরণ নির্ণয় করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি কাজ। এই প্রসঙ্গে অনেকে জ্ঞানোৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জ্ঞানোৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব ?

জ্ঞানোৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব এ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে মতভেদ আছে। জ্ঞানোৎপত্তির উৎস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের চারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করা যেতে পারে—বুদ্ধিবাদী[১], প্রত্যক্ষবাদী[২], বিচারবাদী[৩] ও দ্বান্দ্বিকবাদী[৪]। ডেকার্টে, লাইবনিজ, ভলফ্ প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। জন লক্, ডেভিড হিউম—এঁরা হচ্ছেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। কান্ট বিচারবাদী আর হেগেল দ্বান্দ্বিকবাদী দার্শনিক।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয় কখনই জ্ঞান দিতে পারে না। ইন্দ্রিয় থেকে যা আমরা পাই তা নিশ্চিতও নয়, সর্বজনগ্রাহ্যও নয়। নিশ্চিতি (Necessity) এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা (Universality) জ্ঞানের লক্ষণ। সমস্ত জ্ঞানই বুদ্ধির কতগুলি মৌলিক ধারণা থেকে লাভ করতে হয়। সহজাত ধারণা (Innate ideas) জ্ঞানের নিয়ামক। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের এই মতবাদের নাম বুদ্ধিবাদ (Rationalism)। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে একমাত্র প্রত্যক্ষ থেকেই জ্ঞান লাভ সম্ভব। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়পথেই লাভ করা যায়। এই মতবাদের নাম প্রত্যক্ষ-

---

১। Rationalistic School
২। Empirical School
৩। Critical School
৪। Dialectical School

বাদ (Empiricism)। কাণ্টের মতে জ্ঞানলাভের জন্য প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি দুই-ই দরকার। প্রত্যক্ষ জ্ঞনের বিষয় আর বুদ্ধি জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে। বিষয় আর আকার দুই মিলেই পরিপূর্ণ জ্ঞান হয়। কাণ্টের এই মতবাদের নাম বিচার-বাদ (Criticism)। হেগেল জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞানের আকার যে ভিন্ন নয়, পরন্তু একই তত্ত্বের দুটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। হেগেলের এই মতের নাম দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic theory)। আমরা নীচে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদগুলোর একটু বিস্তৃত আলোচনা করব।

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য এই যে, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয় থেকে যা পাই, তা হয় জ্ঞানই নয়, নয়ত অতি নিকৃষ্ট নিম্নস্তরের জ্ঞান এবং তাকে মত[১] বলাই ভালো। নিশ্চিতি (Necessity) এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা (Universality) জ্ঞানের লক্ষণ। যে বিশ্বাস নিশ্চিত, সর্বজনগ্রাহ্য ও সত্য নয় তাকে জ্ঞান বলা যায় না। গণিতশাস্ত্রে জ্ঞান পাওয়া যায়। কারণ, গণিতশাস্ত্রের বচনগুলি নিশ্চিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য। বুদ্ধিবাদীদের মতে গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানই জ্ঞানের আদর্শ। নিশ্চিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বাস একমাত্র বুদ্ধি দ্বারাই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়পথে যা আমরা পাই তা নিশ্চিতও নয়, সর্বজনগ্রাহ্যও নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিশ্বাসকে জ্ঞান না বলাই ভালো; যদিও বা একে জ্ঞান বলা হয় তবে মনে রাখতে হবে এ অতি নিম্নস্তরের জ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান যে অর্থে জ্ঞান সেই অর্থে এ জ্ঞান জ্ঞানই নয়। এতে কাজ চলে, কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা চলে না। ইন্দ্রিয় প্রায়ই আমাদের প্রতারণা করে। রজ্জুকে সর্প বলে দেখায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় নির্ভরযোগ্য নয়।

বুদ্ধিবাদীরা আরও বলেন গণিতশাস্ত্রে যেমন ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ দেখিয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, সর্বত্রই তেমনই। ধারণাই জ্ঞানের উৎস। আবার ধারণা আমাদের বুদ্ধির সৃষ্টি। সুতরাং বুদ্ধিই জ্ঞানের মূল উৎস। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে, জ্ঞানের প্রকাশ বচনে। বচন ছাড়া জ্ঞান প্রকাশ করা যায় না। এখন বলা যায় যে, বচন আবার দ্বিবিধ—অভিজ্ঞতা-জাত (Empirical) এবং প্রাক-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ (A priori)। 'দেয়াল সাদা' এই বচন অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যায় বলে একে অভিজ্ঞতা-জাত বচন বলে। '২+২=৪' এই বচন

১। Opinion. প্রাচীন গ্রীকদর্শনে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক প্লেটো ইন্দ্রিয়লব্ধ বিশ্বাসকে 'মত' (opinion) নামে অভিহিত করেছেন।

অভিজ্ঞতা-জাত নয়। আমরা চিন্তা করে এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করেই এই বচন পাই। একে প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বচন বলে।

বুদ্ধিবাদীদের মতে আমাদের জ্ঞান প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বচনে প্রকাশিত হয় বা প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বচনই জ্ঞান। এই বচন যেমন নিশ্চিত তেমনই সর্বজনগ্রাহ্য। এই বচন আমরা বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে পাই, এর জন্য কোন অভিজ্ঞতা দরকার হয় না। যে লোক ২-এর অর্থ বোঝে এবং '২+২'-এর অর্থ বোঝে, সে-ই বোঝে ২+২=৪। এই বোঝার জন্য বুদ্ধি দরকার, অভিজ্ঞতার দরকার নেই। এই বচনগুলি যেমন প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ (a priori), তেমনই বিশ্লেষণমূলক (analytic)। এই আলোচনার ভিত্তিতে বুদ্ধিবাদীরা বলেন, বিশ্লেষণমূলক প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বচনই (analytic a priori proposition) জ্ঞান। গণিতশাস্ত্রে এবং তর্কবিজ্ঞানে এই জ্ঞান পাওয়া যায়।

দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ডেকার্টের মতে আমাদের কতকগুলো সহজাত ধারণা আছে। এই ধারণাগুলো সহজাত এই অর্থে যে এরা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না এবং এদের অস্তিত্ব সম্ভাবনারূপে অভিজ্ঞতার পূর্বেই মনে থাকে। এই জন্য এই ধারণাগুলিকে প্রাক-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ (a priori) বলা যায়। এ ধারণাগুলো কখনই মিথ্যা হতে পারে না। ভগবান হয়ত জন্মের সময়ই এই সমস্ত ধারণার সম্ভাবনা মানুষের মনে গেঁথে দেন। অন্য সমস্ত জ্ঞান এই সমস্ত ধারণা থেকে গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে[১] লাভ করা যায়। এই জাতীয় বুদ্ধিবাদকে পল্‌সন গাণিতিক বুদ্ধিবাদ (Mathematical Rationalism) নামে অভিহিত করেছেন।

সহজাত ধারণায় বিশ্বাসের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যে জ্ঞানই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না কেন তাই সন্দেহ করতে পারি। 'ফুলটি লাল' না বলে যদি বলি 'ফুলটি সাদা' তবে চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকে না। কিন্তু 'সোনার পাথর বাটি' বললে চিন্তার মধ্যেই বিরোধিতা দেখা দেয়। সুতরাং 'সোনার পাথর বাটি' ভাবাই যায় না। কিন্তু ফুলটিকে 'লাল' না ভেবে অনায়াসেই 'সাদা' ভাবা যায়। আমাদের জীবনে এমন কতকগুলো ধারণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় যাদের বিপরীত ভাবাই যায় না। দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়। এর বিপরীত ভাবা যায় না। সুতরাং এই জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা যাবে না। এই জ্ঞান সহজাত।

১। Through mathematical deduction

দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতার পূর্বে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু কখনও মনে উপস্থিত থাকতে পারে না। যে কখনও ঘোড়া দেখেনি, ঘোড়ার ছবি তার মনে কখনও জাগতে পারে না। কিন্তু মানুষের এমন কতগুলো ধারণা আছে যা মানুষের মনে সর্বদাই থাকে। এইগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, সহজাত। কার্য-কারণবিধি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই জাতির অন্তর্গত।

তৃতীয়তঃ, অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান পাওয়া যায় প্রায়ই সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রায়ই অন্য লোকের অভিজ্ঞতার মিল হয় না। কিন্তু তর্কবিজ্ঞানে এমন কতগুলো নিয়ম আছে যাদের সম্বন্ধে কোন মতানৈক্যই সম্ভব নয়। এই নিয়মগুলো তর্কবিজ্ঞানে 'চিন্তার মৌলিক নিয়ম' (Fundamental laws of thought) নামে পরিচিত। এই নিয়মগুলো কখনই অভিজ্ঞতালব্ধ হতে পারে না, এগুলো সহজাত। নীতির মৌলিক নিয়ম, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা—এসবও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে সহজাত ধারণা সম্ভব এবং এই সহজাত ধারণাই জ্ঞান দিয়ে থাকে।

জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ্‌ সমস্ত উচ্চ বিষয়ের জ্ঞানই বুদ্ধিলভ্য, একথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন অহিনকুল সম্পর্ক নেই। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞান—দুই বিজাতীয় জ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বুদ্ধিজাত জ্ঞানের চেয়ে অস্পষ্ট ও কম প্রামাণ্য মাত্র। ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরই এক অনুন্নত রূপ।

দার্শনিক ভল্‌ফ কতকগুলি মৌলিক ধারণা (Fundamental Ideas) থেকে সমস্ত জ্ঞান অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায়—এই মতবাদে বিশ্বাসী। তিনিও একজন বুদ্ধিবাদের সমর্থক।

সমালোচনা ঃ অনেক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বক্তব্য সহজাত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দার্শনিক জন লক্ এই সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

লক্ বলেন, সর্বজনগৃহীত ও সর্বজনজ্ঞাত কোন ধারণাই নাই। কিন্তু বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মত সর্বজনগৃহীত ও সর্বজনজ্ঞাত ধারণাই সহজাত ধারণা। কার্য-কারন-বিধি বা তর্কবিজ্ঞানের কোন মৌলিক নিয়ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছোট শিশুর নেই। সুতরাং এগুলোকে সহজাত ধারণা বলা যায় না।

যে সমস্ত ধারণা সম্বন্ধে সকলেরই মতৈক্য আছে তাদেরই সহজাত ধারণা

বলা হয়েছে। কিন্তু লকের মতে ঈশ্বর, নৈতিক নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সকলের মতৈক্য নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কেউ মাত্র দুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কেউ বা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে। ডেকার্টে মনে করেন, জন্মের সময়ই ঈশ্বর সহজাত ধারণাগুলো মানুষের মনে গেঁথে দেন। কিন্তু ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের ধারণাই সকলের মনে এক রকম ভাবে গেঁথে দিতে পারেননি। সুতরাং অন্য কোন ধারণা তিনি সকলের মনে একরকম করে গেঁথে দেবেন, তা-ই বা কি করে ভাবা যায়। বিভিন্ন দেশে ও সমাজে নীতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত দেখা যায়। কোন সমাজে এক পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ নিন্দনীয়, আবার অন্য কোন সমাজে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী সমাজ-সমর্থিত; এই অবস্থায় নীতির ধারণাকেও সহজাত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, লক্ 'সহজাত ধারণা' যে অর্থে গ্রহণ করে খণ্ডন করেছেন, ডেকার্টে বা লাইব্‌নিজ্ কেউই এই অর্থে সহজাত 'ধারণা' কথাটি ব্যবহার করেননি। শিশুরাও সহজাত ধারণা জানে, এমন কথা কোন বুদ্ধিবাদীই বলেন না। তাঁদের বক্তব্য এই যে, মনে কতকগুলি ধারণার সম্ভাবনা এবং এই ধারণাগুলি করার সামর্থ্যসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি জন্ম থেকেই মানুষের থাকে। এই অর্থে 'সহজাত ধারণা' লক খণ্ডন করেছেন এমন কথা বলা যায় না।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আর একটি বিষয়ও বলবার আছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, ধারণা থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু শুধু ধারণা বলে দুনিয়ায় কিছু আছে কি? ধারণা ত সব সময়েই বস্তুর ধারণা। আর এই বস্তু ত কখনই বুদ্ধিসৃষ্ট হতে পারে না। বস্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা এই দিক্ থেকে একটা ভুল করেছেন বলে মনে হয়।

তা ছাড়া গণিতশাস্ত্রে বা তর্কবিজ্ঞানে ধারণার সঙ্গে ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি দেখিয়ে জ্ঞানলাভ হতে পারে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে বা লৌকিক জীবনে এভাবে ত আমরা জ্ঞান পাই না। এই সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর পদার্থ বিজ্ঞান জ্ঞান দেয় না, এমন কথাও মানা যায় না।

বুদ্ধিবাদীদের মতে বিশ্লেষণাত্মক প্রাক-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বচনই জ্ঞান। তা যদি হয় তবে এই জ্ঞানে নূতনত্ব কিছুই থাকবে না। যে বচনের বিধেয় উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় আমরা তাকেই বিশ্লেষণাত্মক বচন বলি। এই বচনে

বিধেয়ে এমন কিছু থাকতে পারে না যা উদ্দেশ্যে নেই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বচনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যা নিহিত বচন তাই-ই ঘোষণা করে আর তা যদি হয় তবে এই বচনে নূতন কিছুই জানা যায় না। যাতে নূতনত্ব নেই তাকে কি জ্ঞান বলা যায়?

এখানে প্রশ্ন উঠবে—বুদ্ধিবাদের যদি এতই দোষ তবে তার কোন গুণই নেই কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব—জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির দরকার আছে, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কাণ্ট বলেছেন, বুদ্ধি জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে। কোন বস্তুই বিষয় ও আকার[1] ছাড়া ভাবা যায় না। জ্ঞানেরও বিষয় ও আকার দুই-ই আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় দেয় আর বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার। প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি এই দুই-ই জ্ঞানের জন্য দরকার।[2] বুদ্ধিবাদ জ্ঞানে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। এইখানেই বুদ্ধিবাদের সার্থকতা। এই বিষয়ে আমরা পরে বিচারবাদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism)

প্রত্যক্ষবাদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। এই বৃহৎ পথ থেকে দুটি শাখা-পথ বেরিয়ে গেছে—একটির নাম সংবেদন (Sensation) ও আর এক-টার নাম অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বাইরের জিনিসের জ্ঞানলাভ করি। অন্তর্দর্শনে আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ নূতনত্ব (novelty)। জ্ঞান নিশ্চয়ই কিছু নূতন সংবাদ দেবে। যা পূর্বেই জানা আছে তা ভাষান্তরে বললে বা তার পুনরুক্তি করলে তাকে যথার্থতঃ জ্ঞান বলা যায় না। যে সমস্ত বচনে বিধেয় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করে মাত্র, অর্থাৎ, যে সমস্ত বচন বিশ্লেষক (Analytic), সে সমস্ত বচন পুনরুক্তি প্রকাশ করে (Tautologous), কিন্তু নূতন কোন সংবাদ দেয় না। আমরা যখন বলি, 'মানুষ বিচারশীল প্রাণী' তখন মানুষ সম্বন্ধে নূতন কোন কথাই বলি না। 'মানুষ' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করলেই 'বিচারশীল প্রাণী' পাওয়া যায়। অর্থাৎ, 'মানুষ' বলাও যা 'বিচারশীল প্রাণী' বলাও তা-ই। সুতরাং 'মানুষ বিচারশীল প্রাণী' এই বিশ্লেষণাত্মক বচন (Analytic proposition) পুনরুক্তিবাচক, কিন্তু নূতন সংবাদ-বাহক নয় বলে 'নূতনত্ব-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান' নয়।

যে বচন নূতন সংবাদ বহন করে বা 'নূতনত্ব-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান' দেয় তা সংশ্লেষক

১। বিষয়=Matter, আকার=Form

২। এই প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা কাণ্টের বিচারবাদ আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

(Synthetic) এবং বিশ্লেষক (Analytic) নয়। যখন আমরা বলি 'মানুষ মরণশীল, তখন 'মরণশীল' এই বিধেয় 'মানুষ' এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'মানুষ' শব্দের অর্থের মধ্যে নিহিত নয় এমন একটি সংবাদ দেয়। 'মানুষ' পদটিকে বিশ্লেষণ করলে 'মরণশীল' পাওয়া যায় না। এই বচন বিশ্লেষক (Analytic) নয়, সংশ্লেষক (Synthetic)। যে সমস্ত বচন উদ্দেশ্যে নিহিত নেই এমন কোন সংবাদ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়ে প্রকাশ করে তাদের সংশ্লেষক বচন বলা হয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে সংশ্লেষক বচনই (Synthetic proposition) নূতনত্ব-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান দেয়। এই সমস্ত বচন ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর। সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান নূতন সংবাদ বহন করে, যে বচন নূতন সংবাদ বহন করে তা সংশ্লেষক, সংশ্লেষক বচনই জ্ঞান দেয় এবং এই সংশ্লেষক বচন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—গণিতশাস্ত্রে বা অবরোহী তর্কবিজ্ঞানে (Deductive Logic) আমরা যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (Necessary Knowledge) পাই বলে মনে করি, তা কি ব্যাপার? অধিকাংশ অভিজ্ঞতাবাদী বলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কতগুলো ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ (Relations of Ideas) প্রকাশ করা হয় এবং এতে কোন নূতন সংবাদ থাকে না। আমরা যখন গণিতশাস্ত্রে বলি ২+২=৪, তখন ২-এর ধারণার সঙ্গে ২-এর ধারণার এবং তাদের যোগের ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। '২+২' বলাও যা '৪' বলাও তা-ই। এখানে নূতন কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। এই জাতীয় বচন পুনরুক্তি প্রকাশ করে (Tautologous)।

অবরোহানুমানের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত উপাত্তের (Premise) পুনরুক্তি প্রকাশ করে। যখন 'সমস্ত মানুষ মরণশীল', 'রাম মানুষ' সুতরাং 'রাম মরণশীল'—এইরূপ অবরোহানুমান করা হয় তখন সিদ্ধান্ত 'রাম মরণশীল' উপাত্ত 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' প্রকাশ করেনি এমন কিছুই বলে না। কারণ, যখন সমস্ত মানুষকেই মরণশীল বলা হয়েছে তখন রামও একজন মানুষ বলে মরণশীল, তাও বলা হয়েছে। মানুষ রামের মরণশীলতা বাদ দিয়ে 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' একথা বলা যায় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, অবরোহানুমানের ক্ষেত্রে নূতন কিছুই বলা হয় না। সিদ্ধান্ত উপাত্তের পুনরুক্তি মাত্র। তা ছাড়া উপরের দৃষ্টান্তে 'রাম' নামক মানুষের ধারণার সঙ্গে 'মরণশীলতা'র ধারণার সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। সমস্ত মানুষের ধারণার সঙ্গে মরণশীলতার ধারণার সম্বন্ধ এবং রাম-এর ধারণার সঙ্গে মানুষের

ধারণার সম্বন্ধের ভিত্তিতে রামের ধারণার সঙ্গে মরণশীলতার ধারণার সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে কতগুলো ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি ?

যেখানেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান পাওয়া যায় বলে মনে করা হয় সেখানেই এইরূপ কত গুলো ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয় এবং তাতে কোন নূতন সংবাদ থাকে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে আরোহানুমান (Induction) করা হয় তা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষন এবং কার্য-কারন-সম্বন্ধের ভিত্তিতে করা হয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ নয়, অভ্যাসজনিত বিষয়ীগত প্রত্যাশা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের তথাকথিত নিশ্চয়তার ভিত্তি। আমরা এ বিষয় অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের কারণতত্ত্ব আলোচনাকালে পরে বিশদভাবে উপস্থিত করব। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে আরোহানুমানের কোন তাত্ত্বিক বা বিষয়গত নিশ্চয়তা নেই। একে একটি প্রকল্প বলা যায় এবং লোকব্যবহারে এর ভিত্তিতে যদি সুফল পাওয়া যায় তবে তার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি।

দার্শনিক জন লক্ এই অভিজ্ঞতাবাদের একজন প্রখ্যাত সমর্থক। তাঁর মতে মানুষ জন্মের সময় কোন ধারণা নিয়েই জন্মায় না। শিশুর মন একেবারে খালি থাকে। লক্ এই সাদা মনকে একখানা অলিখিত কোরা কাগজ[১] বলে উল্লেখ করেছেন। পরে যখন শিশুর ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন ইন্দ্রিয়-পথে মনের ওপর বাইরের জিনিসের ছাপ পড়ে। এই ছাপ থেকেই শিশুর জ্ঞান হয়। যে বস্তু আছে, তাই জানা যায়। বস্তু থাকলেই জানা যাবে এমন নয়, কিন্তু বস্তু না থাকলে জানা যায় না। এখন প্রশ্ন হ'ল—বস্তু যে আছে তা বুঝব কি করে ? উত্তরে লক্ বলেন—বস্তুর ছাপ যদি মনে পড়ে তবেই বুঝব বস্তু আছে। বস্তুর যে ছাপ মনে পড়ে লক্ তার নাম দিয়েছেন ধারণা (Idea)।

ধারণা দুটো পথ দিয়ে আমাদের মনে প্রবেশ করতে পারে—একটা হচ্ছে সংবেদনের পথ, আর একটা অন্তর্দর্শনের পথ। সংবেদন-পথে বাইরের জগতের ধারণা পাই, আর অন্তর্দর্শনের পথে মানসিক অবস্থার জ্ঞান পাওয়া যায়। লকের মতে ধারণা-গ্রহণ ব্যাপারে মন একান্ত ভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকে। বাইরে থেকে ধারণাগুলো যখন মনের সাদা পর্দায় এসে পড়ে তখন মনের দিক থেকে কিছুই করবার থাকে না।

লকের মতে এই ধারাণাগুলো জ্ঞান নয়। ধারাণার মধ্যে মিল বা অমিল

১। Tabula Rasa

প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। 'ফুল'—এই ধারণা কোন জ্ঞান নয়, কিন্তু 'ফুলটি লাল'—এটি একটা জ্ঞান, কারণ এখানে 'ফুল' ও 'লাল' এই দুই ধারণার মধ্যে মিল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ উপায়ে সম্ভবপর—(ক) বোধির সাহায্যে সরাসরি দুটো ধারণার তুলনা করে, (খ) বুদ্ধি দিয়ে এক বা একাধিক ধারণার মাধ্যমে দুটি ধারণার মিল বা অমিল দেখে ও (গ) সংবেদনের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

সমালোচনা : লকের অভিজ্ঞতাবাদ যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি তবে নানা রকমের অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা আমাদের চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ, লক্ ধারণা গ্রহণ-ব্যাপারে মনকে নিষ্ক্রিয় বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের মন বিভিন্ন ধারণার নিষ্ক্রিয় আধার মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জ্ঞান-ব্যাপারে মন কখনই নিষ্ক্রিয় নয়। সংবেদনের দ্বারা মন বিক্ষুব্ধ (irritated) না হ'লে কখনই জ্ঞান হতে পারে না। আর মন যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন বিক্ষোভের হেতুর পরিচয় মনই সক্রিয়ভাবে দিয়ে থাকে। এই পরিচয় থেকেই জ্ঞান হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। বাইরে যখন কোন শব্দ হয় তখন কর্ণেন্দ্রিয় সংক্ষুব্ধ হয়। মন এই সংক্ষোভের একটা ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেয়, আর তার ফলেই আমরা জানতে পারি যে একটা শব্দ হয়েছে সুতরাং জ্ঞান-ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।

লক্ সহজাত ধারণা যে অর্থে গ্রহণ করে খণ্ডন করেছেন, কোন বুদ্ধিবাদীই সেই অর্থে সহজাত কথাটি গ্রহণ করেননি। বুদ্ধিবাদীদের মতে কতগুলো ধারণার সম্ভাবনা মনে থাকে এবং তারাই সহজাত ধারণা। সহজাত ধারণা কতকগুলো ধারণার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিপূর্ণ বিকশিত ধারণা নয়। লক্ 'পরিপূর্ণ বিকশিত ধারণা' প্রসঙ্গে 'সহজাত ধারণা' কথাটি গ্রহণ করে খণ্ডন করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, লক্ বস্তু ও ধারণার মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে ধারণাই আমরা সরাসরি জানি। ধারণা লাভের পর ধারণার একটি বস্তু আছে তা আমরা বুঝতে পারি। বস্তুর সরাসরি জ্ঞান আমাদের কখনই হয় না। লকের এই মতবাদ থেকেই পরবর্তীকালে বার্কলির বিজ্ঞানবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বার্কলি বলেছেন—ধারণা যদি আমরা সরাসরি জানি ও বস্তু কখনই সোজাসুজি না জানি, তবে বস্তু যে আছে তার ত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। যা প্রত্যক্ষ করি না তা আছে, এমন কথা মানা যায় না। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করতে হয়। যা আমরা জানি তা সবই ধারণা। সুতরাং একমাত্র ধারণাই আছে। ধারণাতিরিক্ত

বস্তু বলে কিছু নাই। স্বতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, লকের মতবাদ মানতে গেলে বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, ধারণা সত্য কি মিথ্যা বুঝব কি করে? লক্ অবশ্য বলবেন, ধারণা যখন বস্তুর সঙ্গে মেলে তখনই ধারণা সত্য হয়, আর যখন মেলে না তখন হয় মিথ্যা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে—যে বস্তু আমরা কখনই সরাসরি জানি না তার সঙ্গে ধারণা মিলল কি মিলল না তা বুঝব কি করে? যে লোককে আমরা কখনও দেখিনি তার ফটো দেখে লোকটির প্রতিকৃতি ঠিক হয়েছে কিনা তা ত আমরা বলতে পারি না। স্বতরাং অজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল বা অমিলও আমরা জানতে পারি না। কাজেই লকের মতানুসারে ধারণার সত্যাসত্য কখনই নির্ণয় করা যায় না।

পরবর্তীকালে হিউম লকের অভিজ্ঞতাবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অতীন্দ্রিয় আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব[১] ও ঈশ্বরের কোন জ্ঞান হয় না। স্বতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করার পেছনে কোন যুক্তিই নাই। হিউমের এই মতবাদ সংশয়বাদ[২] নামে পরিচিত।

হিউমের মতে সাক্ষাৎ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় মুদ্রণ[৩]। মানুষের কোন ইন্দ্রিয় যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সেই বস্তুর একটা ছাপ মানুষের মনে পড়ে। হিউম তারই নাম দিয়েছেন মুদ্রন। এই মুদ্রণ যখন অস্পষ্ট আকার ধারন করে তখন তার নাম ধারণা। হিউমের মতে মুদ্রন ছাড়া কোন ধারণাই হতে পারে না। আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব বা ঈশ্বরের কোন মুদ্রণ সম্ভব নয়, কারন কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই এদের পাওয়া যায় না; আর যা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় না তার কোন মুদ্রণ হ'তে পারে না। স্বতরাং আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব বা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নয়। যাদের জ্ঞান সম্ভব নয়, তাদের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা যায় না।

১। দ্রব্যত্ব (Substantiality)—কোন বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণাবলী যে আধারে থাকে তার নাম দ্রব্য। এই আধার কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ প্রকাশিত গুণ-গুলোর অধিষ্ঠান হিসেবে তাকে মানতে হয়। লক্ দ্রব্যত্ব সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেন। হিউম বলেন, প্রকাশিত গুণাবলী ছাড়া বস্তুর দ্রব্যত্ব বলে প্রচ্ছন্ন কোন সত্তা নেই। বিস্তৃত, আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২। সংশয়বাদ—Scepticism

৩। মুদ্রণ—Impression

হিউম মনে করেন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুদ্রণ কতকগুলো অনুষঙ্গের নিয়মের[১] বন্ধনে বদ্ধ হ'লেই জ্ঞান হয়। সান্নিধ্য (Contiguity), সাদৃশ্য (Similarity) ও কার্যকারণসম্বন্ধ (Cause and Effect relation) অনুষঙ্গের এই তিন নিয়ম। সমস্ত বস্তুই কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টিবিশেষ। মুদ্রণাতিরিক্ত বস্তুর দ্রব্যত্ব ব'লে কিছু নাই।

হিউমের মতে কার্যকারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্বন্ধ[২] নাই। কুইনাইন খেলে জ্বর কমে। এই ক্ষেত্রে কুইনাইন খাওয়া কারণ আর জ্বর কমা তার কার্য। হিউম বলবেন—কুইনাইন খেলেই জ্বর কমবে এমন কোন আবশ্যিক কার্যকারণসম্বন্ধ আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। বার বার কুইনাইন খেয়ে জ্বর কমতে দেখে আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও কুইনাইন খেলে জ্বর কমবে। এটা আমাদের অভ্যাসগত ধারণা মাত্র। এর কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা (Objective necessity) নাই।

সমালোচনা : বিচ্ছিন্ন মুদ্রণের মধ্যে যদি বস্তুগত ঐক্য না থাকে তবে আমাদের পক্ষে কোন বস্তুর জ্ঞানই সম্ভব নয়। অনুষঙ্গ-নিয়ম-লব্ধ ঐক্য কখনই বস্তু-ঐক্য দিতে পারে না; কারণ অনুষঙ্গের নিয়ম বস্তুর নিয়ম নয়, এগুলো ব্যক্তিমানসের নিয়ম মাত্র। মনে করুন—রূপ, রস, গন্ধের কতগুলো বিচ্ছিন্ন মুদ্রণ পাওয়া গেল। এগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট না হলে বস্তুর জ্ঞান হতে পারে না। হিউমের মতে গুণগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে আমাদের কাছে আসে না। আমরা অনুষঙ্গের নিয়ম দিয়ে তাদের একত্র সন্নিবিষ্ট করি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—অনুষঙ্গের নিয়ম যে ঐক্য দেয় সে ত বিষয়ীগত ঐক্য (Subjective unity), কিন্তু তা বস্তুর ঐক্য বিধান করবে কি ক'রে? অনুষঙ্গের নিয়ম ব্যক্তিমনের নিয়ম, কিন্তু বস্তুর নিয়ম নয়। সুতরাং অনুষঙ্গের নিয়ম দিয়ে কখনই বস্তুর ঐক্য পাওয়া যায় না। আর বস্তুর ঐক্য যদি না পাওয়া যায়, তবে বস্তুর জ্ঞানই হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, হিউমের মতে সমস্ত বস্তুই কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টিমাত্র। তাই যদি হয়, তবে মানুষের মনও কতগুলো মুদ্রণের সমষ্টি। একথা সত্য হ'লে আমাদের কোন স্মৃতিই হবে না। আজ যা প্রত্যক্ষ করি মনে তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে বলেই পরে তা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু হিউমের

১। অনুষঙ্গের নিয়ম—Laws of Association

২। আবশ্যিক সম্বন্ধ—Necessary Connection

মতে স্থায়ী মন বলে কিছু নেই। মন পরিবর্তমান কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং এই মন নিয়ত পরিবর্তনশীল, এখানে কিছুই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সুতরাং স্মৃতিও সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, হিউম যে বলেছেন, কার্যকারণের মধ্যে কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা নেই—একথা সত্য নয়। কাণ্ট এই মতবাদের ত্রুটি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করেছেন। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে কাণ্টের মতবাদ আলোচনা করব।

চতুর্থতঃ, হিউমের অভিজ্ঞতা সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়েছে। হিউমের মতে কোন তত্ত্ব-জ্ঞানই[১] হ'তে পারে না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, সংশয়বাদ সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। সংশয়বাদের মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা আছে, সেই প্রসঙ্গে আমরা তাও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এই দিক থেকেও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। এই ত্রুটি শুধু হিউমের অভিজ্ঞতাবাদেই নেই, অভিজ্ঞতাবাদ মাত্রেই এই ত্রুটি বর্তমান। কারণ, যাঁরাই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী তাঁরাই তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব বলে মনে করেন এবং ফলে স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করেন। তত্ত্বজ্ঞান হয় না বললে অজ্ঞাতরূপে তত্ত্বের জ্ঞান হয়, একথা বলতে হয় এবং তাতে তত্ত্বের কোনপ্রকার জ্ঞানই হয় না একথা বলা যায় না।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত বচন বিশ্লেষণাত্মক এবং কতগুলো ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ-প্রকাশক, এতে কোন নূতন সংবাদ থাকে না। কাণ্ট দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত বচন বিশ্লেষণাত্মক নয়, সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic) এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর (Emprical) নয়, অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a priori)। তিনি বলেন, '২+২=৪' এই বচনে ২, ২ এবং '+' এই চিহ্ন বিশ্লেষণ করলেই ৪ পাওয়া যায় না, আঙ্গুল গুণে অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায়ই '২+২' যে '৪', তা জানা যায়। সুতরাং এই বচন বিশ্লেষণাত্মক (Analytic) নয়, সংশ্লেষণাত্মক এবং এতে নূতন সংবাদ আছে। তবে তা সংশ্লেষণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়, অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a priori)। যদি এই বচন অভিজ্ঞতা-নির্ভর হত তবে তা কখনই নিশ্চয়াত্মক হ'ত না, বচনটি নিশ্চয়াত্মক বলে তা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। তবে এই বচনে নূতন কোন সংবাদ নেই, একথা

১। তত্ত্ব-জ্ঞান—Metaphysical Knowledge, অর্থাৎ, বাহ্যদ্রব্য, মানসদ্রব্য বা আত্মা এবং ঈশ্বরের জ্ঞান।

সত্য নয়। অর্থাৎ, কোন বচন অভিজ্ঞতা-নির্ভর না হলেই যে তা নূতন সংবাদ-বাহক হয় না, একথা ঠিক নয়। গণিতশাস্ত্রের সমস্ত বচন সম্বন্ধেই একথা সত্য।

অবরোহানুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে নূতনত্ব নেই বলে অভিজ্ঞতাবাদীরা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, আমরা পূর্বেই অনুমানের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, অনুমানের ক্ষেত্রে উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে নূতনত্ব থাকে এবং এটাই অনুমানের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আরোহানুমান প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, আরোহানুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভব্য এবং উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, আরোহানুমান যদি অনুমান হয় তবে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত উপাত্ত থেকে অনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয় বা উপাত্ত ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক, একথা বলতেই হবে। উপাত্ত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ না থাকলে কোন অনুমানই হতে পারে না।

অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল। এই মতবাদ যে বহু দোষদুষ্ট তা দেখান হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল—অভিজ্ঞতাবাদের কোন গুণই নাই কি?

আমাদের মনে হয়, বস্তু ছাড়া যে কোন ধারণা হয় না—অভিজ্ঞতাবাদীদের একথা প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ধারণাই বস্তু-জ্ঞান সৃষ্টি করতে সমর্থ। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম একথার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছেন। ধারণা সব সময়েই কোন না কোন বস্তুর ধারণা। সুতরাং বস্তু ছাড়া কোন ধারণাই হতে পারে না। পরবর্তীকালে কাণ্ট এ কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। প্রথম জীবনে কাণ্ট মনে করতেন—ধারণাই আমাদের বস্তু-জ্ঞান দিতে সক্ষম। পরে হিউমের বই পড়ে তাঁর ভুল ভাঙ্গে। তিনি নিজে বলেছেন, 'হিউম আমাকে নির্বিচার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছে'।[১] তাছাড়া নূতনত্ব জ্ঞানের লক্ষণ, অভিজ্ঞতাবাদীদের একথাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। জ্ঞান নূতন সংবাদ পরিবেশন করে, একথা পরবর্তীকালে কাণ্ট স্বীকার করেছেন।

বিচারবাদ (Critical theory):

প্রত্যেক জিনিসেরই সাধারণভাবে দুটো দিক থাকে—একটা তার আকারের

১। 'Hume roused me from dogmatic slumber'.

দিক, আর একটা তার বস্তুর দিক।[১] যে টেবিলের ওপর লিখছি তার কথাই ধরা যাক্ না কেন। বস্তুর দিক থেকে এই বিশেষ টেবিলটি কাঠের, আর আকারের দিক থেকে এটা চতুষ্কোণ। অবশ্য টেবিলের বস্তু মার্বেল, বেত বা অন্য কিছু হ'তে পারত। এর আকারও তেমনি গোল অথবা অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কোন না কোন বস্তু ও আকার ছাড়া কোন টেবিলই হ'তে পারে না।

কাণ্টের মতে জ্ঞানের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। প্রত্যেক জ্ঞানেরই দুই দিক—আকারের দিক ও বিষয় বা বস্তুর দিক। বিষয় বা বস্তু ছাড়া শুধু আকার শূন্যগর্ভ, আবার আকার ছাড়া শুধু বস্তু অন্ধ।[২] আকার যেন একটা ছাঁচের মত ফাঁপা—বস্তু দিলেই তা পূর্ণ হয়। আর যেখানে শুধু বস্তু আছে কিন্তু তার কোন আকার নেই সেখানে বস্তুর কোন রূপ পাওয়া যায় না। অন্ধ মানুষ কোন রূপই জানতে পারে না। সুতরাং আকারহীন বস্তুকে অন্ধই বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল—জ্ঞানের আকারই বা কি আর তার বস্তু-প্রকৃতি বা কি? আর এদের কি করে পাওয়া যায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কাণ্ট বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের বক্তব্য বিচার ক'রে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন।

আমরা দেখেছি, বুদ্ধিবাদের মতে বুদ্ধিই সত্যজ্ঞান দিতে সক্ষম। প্রথম জীবনে কাণ্ট একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন—শুধু ধারণা থেকেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের বই পড়ে তাঁর ধারণা বদলে যায়। তিনি বুঝতে শেখেন বস্তু ছাড়া শুধু ধারণা বলে কিছু হতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান হতে গেলে ধারণা ও বস্তু দুই-ই দরকার। বুদ্ধি দিয়ে ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু পাওয়া যায় না। বস্তু পেতে হ'লে বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সংবেদন প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে শুধু সংবেদন থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু কাণ্ট বললেন—শুধু সংবেদন থেকে জ্ঞানের বস্তু পাই, আকার না পেলে জ্ঞান হ'তে পারে না। সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি।

১। আকার—Form, বস্তু—Matter.

২। 'Concepts without percepts are empty, and percepts without concepts are blind.'

তাঁদের মতবাদ অর্ধ সত্য বহন করে মাত্র। অন্যদিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। তাঁদের মতে শুধু বুদ্ধিজাত ধারণা থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু কাণ্ট বললেন—বুদ্ধিজাত ধারণা জ্ঞানের আকার দিতে পারে বটে, তাতে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, কিন্তু তা জ্ঞানের বিষয় দিতে পারে না, নূতনত্ব দিতে পারে না। সংবেদন থেকে নূতনত্ব আসে, নিশ্চয়তা আসে না, নিশ্চয়তা আসে বুদ্ধির আকার থেকে। আর জ্ঞানের বিষয় ও আকার, নূতনত্ব ও নিশ্চয়তা দুই-ই না পেলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞান হ'তে গেলে নিশ্চয়তা ও নূতনত্ব, বুদ্ধিজাত ধারণা ও সংবেদনজাত বস্তু উভয়ই দরকার। কাণ্ট এইভাবে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে নিহিত সত্য গ্রহণ ক'রে এক সমন্বিত মতবাদ (Synthetic theory) সৃষ্টি করলেন। কাণ্টের মতে জ্ঞান হতে গেলে বুদ্ধি ও সংবেদন[১] দুইই দরকার। বুদ্ধি থেকে আমরা জ্ঞানের আকার পাই আর সংবেদন আমাদের জ্ঞানের বস্তু দিয়ে থাকে। যেহেতু কাণ্ট সমস্ত জ্ঞান ব্যাপার, বিশেষ করে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ বিচার বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেজন্য কাণ্টের এই মতবাদকে বিচারবাদ বলা হয়।

বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানের লক্ষণ—নিশ্চয়তা এবং সর্বজনীনত্ব (Necessity and Universality) এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব বিশ্লেষণাত্মক বচনই (A priori analytic propositions) জ্ঞানপদবাচ্য। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানের লক্ষণ—নূতনত্ব (novelty) এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর সংশ্লেষণাত্মক বচনই (Empirical synthetic propositions) জ্ঞানপদবাচ্য। কাণ্ট বলেন, জ্ঞান যেমন হবে নিশ্চয়াত্মক ও সর্বজনীন, তেমনি তা হবে নূতন। তাঁর মতে জ্ঞানের লক্ষণ—নিশ্চয়তা, সর্বজনীনত্ব এবং নূতনত্ব। কাণ্ট এইভাবে জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী বক্তব্যের সমন্বয় সাধন করেছেন। বিজ্ঞান আদর্শ জ্ঞান দেয়। বিজ্ঞানের বচন বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, এই বচনের যেমন আছে সর্বজনীনত্ব এবং নিশ্চয়তা, তেমনি আছে নূতনত্ব।

পদার্থবিজ্ঞানে বলা হয় যে, 'জড়জগতের শত পরিবর্তন সত্বেও জড়ের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে।' এই বচন অভিজ্ঞতা-পূর্ব, কারণ, বিজ্ঞানীদের মতে এই বচন নিশ্চয়াত্মক এবং কোন নিশ্চয়াত্মক বচনই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লাভ করা যায় না। কিন্তু, এই বচন সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic), কারণ 'জড়' শব্দের অর্থের মধ্যে তার অপরিবর্তন নিহিত নেই। অর্থাৎ, এই বচন অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং সংশ্লেষণাত্মক

১। বুদ্ধি—Understanding, সংবেদন—Sensibility.

(A priori and synethetic)। বচনটি নিশ্চয়াত্মক আবার নূতনত্ব বিশিষ্ট। এই জাতীয় বচনই আদর্শ জ্ঞান প্রকাশ করে। কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচনই আদর্শ জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই জ্ঞান হয় কি করে? কাণ্ট বলেন, জ্ঞানের নিশ্চয়তা আসে বুদ্ধির আকার (Categories of understanding) থেকে এবং সংশ্লেষণাত্মকতা (Synthetic Character) আসে সংবেদনে (sensibility) প্রাপ্ত অনুভব (intuition) থেকে।

আধুনিক লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা বলেছেন, অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচন অসম্ভব। আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, 'অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচন অসম্ভব' এই বচনটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচনের একটি দৃষ্টান্ত। সুতরাং অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচন হয় না, এমন কথা বলা যায় না।

সংবেদন দিয়ে জ্ঞানের বিষয়ের যে পরিচয় আমরা পাই তার নাম অনুভব।[১] সংবেদন নিষ্ক্রিয়। তা বহির্বিশ্ব থেকে আগত বস্তু-অনুভবের নিষ্ক্রিয় ধারক। দেশ ও কাল অনুভবের দুটি পূর্বতঃ সিদ্ধ আকার।[২] এদের পূর্বতঃ সিদ্ধ আকার এই অর্থে বলা যায় যে, এই আকার ছাড়া কোন অনুভব সম্ভব নয়। সুতরাং এরা অনুভব-সাপেক্ষ নয়, বরং অনুভবই এদের ওপর নির্ভর করে। দেশ ও কালের মধ্যে সংবেদন যে অনুভব ধারণ করে বুদ্ধি সক্রিয়ভাবে তার ওপর বুদ্ধির আকার[৩] লাগিয়ে দেয়। বুদ্ধির আকারে আকারিত হয়ে দেশ ও কালস্থিত অনুভব জ্ঞান-পদবাচ্য হয়। বহির্বিশ্ব থেকে আগত কেবলমাত্র অনুভব জ্ঞান দিতে পারে না। অনুভব বুদ্ধির আকারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই জ্ঞান সম্ভব করে তোলে। এই বুদ্ধির আকার অবশ্য কোন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির আকার নয়। এগুলো সকল মানুষের মধ্যেই যে সাধারণ বুদ্ধি আছে তারই আকার। সুতরাং এই বুদ্ধির আকারে আকারিত করে যে অনুভব আমরা লাভ করি তা সকলের কাছেই এক রকম। কিন্তু এই জ্ঞান বস্তু-স্বরূপের[৪] জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ সমস্ত জ্ঞানেই আমাদের বুদ্ধির আকার থাকে। সুতরাং অবিমিশ্র বস্তুস্বরূপ আমরা কখনই জানতে পারি না। যা আমরা জানি তা বুদ্ধির আকার-বিমিশ্র বস্তুরূপ। কাণ্ট জ্ঞানের এই বিষয়ের নাম দিয়েছেন অবভাস[৫]। অবভাসের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে সম্ভব। বস্তু-স্বরূপের জ্ঞান আমরা কখনই পাই না। কিন্তু বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব না মেনে উপায় নাই। সংবেদন নিষ্ক্রিয়

১। Intuition
২। A—priori forms of Intuition
৩। Categories of understanding
৪। Thing-in-itself
৫। Phenomenon

ভাবে বহির্বিশ্ব থেকে আগত অনুভব ধারণ করে। অনুভব সংবেদনসৃষ্ট নয়। সুতরাং এই অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

সমালোচনা—কাণ্ট অনেক বিচার বিশ্লেষণ ক'রে এই বিচারবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এত করা সত্বেও কাণ্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়নি। **জ্ঞানোৎপত্তির দিক থেকে তিনি এক অসমন্বিত দ্বৈত ধারণার**[১] সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সংবেদন ও বুদ্ধি উভয়েরই সমন্বয় আবশ্যক। সংবেদন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়, আর বুদ্ধি একান্তভাবেই সক্রিয়। সুতরাং সংবেদন ও বুদ্ধি একেবারেই বিপরীতধর্মী। এই দুই বিপরীতধর্মী বৃত্তি কি করে একত্র হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করে তার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কাণ্ট দেননি। সুতরাং তাঁর মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য অপরিহার্য দুই বৃত্তির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে। কাণ্ট এই দ্বৈতভাব সমন্বয়ের কোন চেষ্টা করেননি।

বস্তু-সত্তার দিক থেকেও কাণ্ট এক দ্বৈত ধারণার সৃষ্টি করেছেন।[২] তাঁর মতে অবভাসের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব। বস্তু-স্বরূপ আছে, কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না। এই ক্ষেত্রে বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপ এক দ্বৈত বোধ সৃষ্টি করেছে। কাণ্ট পরিষ্কার ভাবে বস্তু-স্বরূপ ও বস্তু-অবভাসের দ্বন্দ্ব সমন্বিত করার চেষ্টা করেননি। তা ছাড়া বস্তু-স্বরূপ আছে, অথচ তা জানা যায় না, একথা বলে কাণ্ট এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। বস্তু-স্বরূপ না জানা গেলে তা যে আছে, তা বলা যায় কি? এই সমস্যা পরবর্তীকালে দার্শনিকদের বস্তু-স্বরূপের কোন প্রকার জ্ঞান হয় নয়ত বস্তু-স্বরূপ বলে কিছু নেই, এই দুই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দুই দলে বিভক্ত করেছে।

দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic Theory):

কাণ্ট তাঁর বিচারবাদে একদিকে সংবেদন ও বুদ্ধি, অন্যদিকে বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব সৃষ্টি করেছেন। হেগেল দ্বান্দ্বিকবাদে এক বৃহত্তর তত্ত্বের সাহায্যে এই দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাবের সমন্বয় সাধন করেছেন। এক বৃহত্তর ধারণায় বিপরীত ধারণার সমন্বয়ই দ্বান্দ্বিকবাদের মূল কথা। হেগেল বলেছেন—বুদ্ধির আকার যেহেতু সংবেদন-লভ্য অনুভবে লাগান যায়, সুতরাং বুদ্ধি ও সংবেদনের

১। Epistemological Dualism

২। Ontological Dualism

মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মিল আছে। বুদ্ধি ও সংবেদনে কোন মিল না থাকলে কখনও বুদ্ধির আকার সংবেদনা-লভ্য অনুভবে লাগত না। হেগেল মনে করেন, বুদ্ধি ও সংবেদন উভয়ই অদ্বয় চিন্তার[১] ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সংবেদনের সঙ্গে বুদ্ধির কোন মৌলিক তফাৎ নেই। এদের তফাৎ শুধু অদ্বয় চিন্তার প্রকাশের স্পষ্টতার মাত্রাভেদে। বুদ্ধিতে অদ্বয় চিন্তার প্রকাশ স্পষ্ট; কিন্তু সংবেদনে অস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধি ও সংবেদনের মধ্যে কোন অসমন্বিত দ্বৈতভাব নেই।

হেগেলের মতে বুদ্ধি বা মানবমন এবং বস্তু বা প্রকৃতি অদ্বয় চিন্তার দুটি বিভিন্ন প্রকাশ। যদি এরা এক অদ্বয় চিন্তার বিভিন্ন প্রকাশ না হত তবে মানব-মনের বুদ্ধির আকার বস্তুতে কখনই লাগত না। সুতরাং বুদ্ধির আকার লাগিয়ে যে অবভাস পাই তা বস্তু-স্বরূপের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কিত। কাজেই বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যেও কোন দ্বৈতভাব বা দ্বন্দ্ব নেই।

এইভাবে হেগেল কান্টের বিচারবাদের দোষত্রুটি দূর করে দ্বান্দ্বিকবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মতবাদ খণ্ডন করা শক্ত।

১। Absolute Thought

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি—বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদ

(The Nature of Object of Knowledge—
Realism and Idealism)

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক প্রকাশ করে। যিনি জানেন তাঁর নাম জ্ঞাতা, আর যে বস্তু জানা যায় তার নাম জ্ঞেয়। সমস্ত জ্ঞানেই কোন একজন লোক কোন একটি বস্তু জানে। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কই জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হ'ল—জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি কি? যা জানি তা কি জানার ওপর নির্ভর করে? না জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই থাকে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দুই দলের দার্শনিক দু'রকম ভাবে দিয়েছেন। একদলের মতে জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দর্শনের ইতিহাসে এই দলের নাম ভাববাদী দার্শনিক।[১] আর এক দলের মতে জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই বিরাজমান। এই দলের নাম বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক।[২] ভাববাদী দার্শনিকদের মত ভাববাদ[৩] ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ[৪] নামে পরিচিত।

যদি চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করা যায় তবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকেই প্রথমে পাওয়া যাবে। মানুষ প্রথমতঃ বস্তু জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র এই ধারণা নিয়েই চিন্তা শুরু করে। পরে বিচার-বিশ্লেষণের পর কেউ কেউ বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল—একরকম ভাবতে থাকেন। এঁরাই ভাববাদী দার্শনিক। সুতরাং কালানুক্রমিক বিচারে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ আগে, তারপর ভাববাদের উৎপত্তি। আমরা এই অধ্যায়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদের বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।[৫]

১। Idealists ২। Realists ৩। Idealism ৪। Realism

৫। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্'—এই দুটি শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আলোচনা করা যেতে পারে। দর্শনে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বলতে যা বোঝায়, সাহিত্যে কিন্তু তা আদৌ বোঝায় না। সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' বলতে বাস্তবতা বোঝায়, বস্তুস্বাতন্ত্র্য নয়। সাহিত্যের 'আইডিয়েলিজম্'ও ভাববাদ নয়, আদর্শবাদ। যখন কোন সাহিত্যিক সংসারে যা ঘটে, আছে বা থাকে তা আপন মনের রসায়নে রসায়িত ক'রে প্রকাশিত করেন, তখন আমরা তাঁকে বাস্তবধর্মী (Realistic) সাহিত্যিক বলি। কেউ কেউ অবশ্য এমন কথাও বলেন যে, যা ঘটে তা সবই সত্যি নয়। কবি বা সাহিত্যিক 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যা রচনা করেন, তাই সত্য।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) :

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে, জ্ঞানের বিষয় কোন রকমেই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞেয় বস্তুর একটি জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে। আমরা যখন কোন একটি স্থান প্রথম জানি তখন আমরা জানলাম বলেই স্থানটির সৃষ্টি হ'ল—এমন কথা সত্য নয়। স্থানটি আছে বলেই আমরা তা জানতে পারি। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে আমেরিকাকে কেউ জানত না। কিন্তু তা বলে তখন আমেরিকা ছিলই না—এমন কথা বলা যায় না। আসলে মানুষ যখন আমেরিকার কোন পরিচয়ই জানত না তখনও আমেরিকা ছিল। সুতরাং আমেরিকার অস্তিত্ব কোন মানুষের জ্ঞানের ওপর আদৌ নির্ভর করে না।

আমরা এখানে এই বিষয়ে কোন জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। কারণ এই পুস্তকে আমাদের আলোচ্য বিষয় দর্শন, সাহিত্য নয়। এখানে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, সমাজ ও সংসারের প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তাই বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য। সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে, সংসারে যা ঘটে তারই সহৃদয় প্রকাশ বুঝতে হবে। ঘটনা কিভাবে ঘটা উচিত তা নয়, কি ভাবে ঘটে—তাই যেখানে উপজীব্য তারই নাম বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য। বাংলার শরৎ-সাহিত্য বাস্তব-ধর্মী সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, ব্যথা ও বেদনা, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে, মানুষের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ ও সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র মানুষের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সমাজে কি হওয়া উচিত ছিল, কি হ'লে ভাল হ'ত—তার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বিশেষ কিছু বলেননি। সমাজে যা হয়, তা যে প্রায়ই কত দুঃখের, কত বেদনার তা-ই তাঁর আলোচনার বিষয়।

যখন কোন সাহিত্যিক যা ঘটে তার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যা ঘটা উচিত তার দ্বারা পরিচালিত হন, তখন তাঁকে বলব আদর্শবাদী সাহিত্যিক। কোন একটি বিশেষ আদর্শকে মনে রেখে সাহিত্যিক যখন তাঁর মানস কন্যা ও পুত্রদের সেই ছাঁচে গড়ে তোলেন তখন যে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় তার নাম আদর্শবাদী সাহিত্য। এখানে সমাজে কি ঘটে সে দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না; লেখকের আদর্শানুসারে কি ঘটা উচিত তারই ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর লেখক। কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি যে রোহিণীকে গুলি করে মেরেছেন তা একান্তভাবেই তাঁর আদর্শের খাতিরে। রোহিণীকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দুর্বলতা, কলঙ্ক ও ক্ষুধা নিয়ে বাঁচতে দেওয়াই উচিত ছিল—স্বাভাবিক মানুষের এই দাবী। যা স্বাভাবিক তা আদর্শের দৃষ্টিতে যতই খারাপ হোক না কেন, স্বাভাবিক বলেই তা সত্য।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, জ্ঞানের বিষয় না থাকলে কোন জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান বিষয় বা বস্তু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত (determined) হয়ে থাকে। কিন্তু, বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জ্ঞান ছাড়াও বস্তু থাকতে পারে।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের কোন আন্তরিক সম্পর্ক নাই। যখন কোন বস্তু আর একটি বস্তু ছাড়া কখনই থাকতে পারে না তখন সাধারণতঃ তাদের সম্পর্ককে আন্তরিক সম্পর্ক (Internal Relation) বলা হয়। যে কোন বস্তুই কোন মানুষের জ্ঞানের বিষয় না হয়েও অনায়াসে থাকতে পারে। সকল মানুষেরই অজ্ঞাত কোন বস্তু থাকা অসম্ভব নয়। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে আমেরিকা ত' ছিলই, মানুষ তা জানত না মাত্র।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের বিষয় বা বস্তু সংখ্যায় একাধিক। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুই ত' জানি। এই সমস্ত বস্তুরই জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে। সুতরাং সত্য বস্তুর অসংখ্যতা স্বীকার করতেই হবে।

সমস্ত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরাই বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষতা, জ্ঞান ও বস্তুতে আন্তরিক সম্পর্কহীনতা ও সত্য বস্তুর অসংখ্যতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু বস্তু কতটুকু পরিমাণে জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র ও বস্তুকে কিভাবে জানা যায় এবিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যে কোন বস্তুকেই আমরা বিশ্লেষণ করি না কেন তার দ্রব্যত্ব (Substantiality) ও কতগুলো গুণ পাওয়া যায়। 'কমলা লেবু'কে বিশ্লেষণ করলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আকার, ঘনত্ব প্রভৃতি কতগুলো গুন পাওয়া যাবে। এই গুণগুলো একত্রিত হয়ে যাতে থাকে তার নাম দ্রব্য। দ্রব্য বস্তু-গুণের আধার বিশেষ। বস্তুর দ্রব্যত্ব যে একান্তভাবেই জ্ঞানাতিরিক্ত এবিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু কোন বস্তুর গুণগুলোর সবই জ্ঞানাতিরিক্ত, না কিছু কিছু গুণ জ্ঞান-সাপেক্ষ—এ নিয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। যে সব বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যে বাস্তবতা ও আদর্শবাদ যথাক্রমে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদের চেয়ে একটু অন্য ধরনের। সুতরাং সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বলতে আমরা যে দর্শনের 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বুঝি না তা মানতেই হবে।

বস্তুর দ্রব্যত্ব ও সমস্ত গুণ জ্ঞানাতিরিক্ত বলে মনে করেন—তাঁদের নাম সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক (Naive Realists)। আর একদল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী আছেন যাঁদের মতে দ্রব্যত্ব ও কতগুলো গুণ জ্ঞানাতিরিক্ত বটে, কিন্তু অন্য কতগুলো গুন জ্ঞান-সাপেক্ষ। এঁদের নাম বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক (Scientific Realists)। প্রথম দলের দার্শনিকদের মতে বস্তু সরাসরিই জানা যায়। সেজন্য তাঁদের সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীও (Direct Realists) বলা হয়। দ্বিতীয় দলের মতে বস্তুর জ্ঞান বস্তুর প্রতীক বা ছাপের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ; বস্তু কখনই সরাসরি জানা যায় না। সেজন্য এঁদের প্রতীকবাদীও (Representationists) বলা হয়। প্রথম দলের মতবাদ সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Naive or Direct Realism) আর দ্বিতীয় দলের মত বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদ (Scientific Realism or Representationism) নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের পথ অনুসরণ করে আর একদলের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক দেখা দিয়েছেন। এঁদের মতবাদ নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-Realism) নামে খ্যাত। বিচারমূলক বা বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Critical Realism) নাম দিয়ে আধুনিক একদলের দার্শনিক এক নূতন রকমের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ পত্তন করেছেন। এঁদের বক্তব্য অনেকটা প্রতীকবাদেরই মত। আমরা এখন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ

(Naive or Direct Realism)

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথা—বস্তু বা বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে বিষয়ের দ্রব্যত্ব ও গুন—উভয়ই জ্ঞানাতিরিক্ত। আমরা বস্তুর যে সমস্ত গুন জানি তার সবগুলোই বস্তুতেই থাকে। বস্তুতে নেই এমন গুন কখনই জানা যায় না। বিষয় বা বস্তু না থাকলেও জ্ঞান হয় না। বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান বিষয় অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সরাসরিই বিষয় জানতে পারি। যা কিছু আমরা সরাসরি জানি তা সবই সত্যি।

এই মতবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ[১]-ও বলা যেতে পারে। বস্তু সরাসরি জানা যায় আর বস্তু না থাকলে জানা যায় না—এই ত' সাধারণ লোকের ধারণা। সাধারণ জ্ঞানের[২] সঙ্গে এই মতবাদের মিল আছে, সরল বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এই-ই সব চেয়ে বড় যুক্তি। এই মতবাদে সাধারণ লোকের সরল ধারণা পাওয়া যায় বলে এর নাম সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতানুসারে বিষয় সরাসরি বা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় বলে এর আর এক নাম সাক্ষাৎ বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদ।

সমালোচনা : এই মত সত্য হ'লে আমাদের কখনই ভুল জ্ঞান হওয়া উচিত নয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বিষয় না থাকলে জ্ঞানই হয় না। কিন্তু আমরা অনেক সময় যেখানে কিছু নেই সেখানে ভুল ক'রে কোন বস্তু দেখি।[৩] আবার কখনও কখনও এক বস্তুতে অন্য বস্তুরও জ্ঞান হয়।[৪] অন্ধকার রাত্রিতে অনেকেই ত' রজ্জুকে সর্প বলে মনে করে। রজ্জুতে সর্প নেই, অথচ সর্পের জ্ঞান হয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা এই জাতীয় জ্ঞানের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের ব্যাখ্যাও এই মতবাদে মেলে না। স্বপ্নে আমরা নানারকমের বস্তু দেখি। কিন্তু এসব বস্তু তেমনিভাবে জগতে প্রায়ই থাকে না। সুতরাং এই সব বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, এমন কথা বলা যায় কি ?

এই মতবাদের আর একটি ত্রুটিও লক্ষণীয়। এই মতানুসারে বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখা গেছে যে বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত নয় ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। একই জিনিস কারো কাছে সুস্বাদু, আবার কারো কাছে সুস্বাদু নয় বলে মনে হয়। কিন্তু কোন জিনিসই একই সঙ্গে সুস্বাদু ও সুস্বাদু নয়—দুইই হ'তে পারে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্বাদ বস্তুগত ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার—এমনই ভাবতে হবে। যে ব্যক্তি বস্তুর স্বাদ যেমন বলে মনে করে তার কাছে বস্তুর স্বাদ তেমনই বটে। ঠিক তেমনি ক'রে একই বস্তুর রূপ, গন্ধ ও স্পর্শ বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। সুতরাং এই গুণগুলোও ব্যক্তি-জ্ঞানসাপেক্ষ একথা বলতে হবে।

১। Common sense theory

২। Common sense

৩। যেখানে কিছু নেই সেখানে কিছু দেখাকে মনোবিজ্ঞানী 'Hallucination' বলে।

৪। Illusion

বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদ
(Scientific Realism or Representationism)

দার্শনিক জন লক্ সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দোষত্রুটি দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদের পত্তন করেছেন। লকের মতে বস্তুর সমস্ত গুণই একজাতীয় নয়। কতগুলো গুণ বস্তুগত আর কতগুলো গুণ ব্যক্তিগত বা জ্ঞান-গত। যে সমস্ত গুণ বস্তুগত তাদের নাম মুখ্য গুণ[১], আর যে সমস্ত গুণ ব্যক্তিগত বা জ্ঞানগত তাদের নাম গৌণ গুণ[২]। বস্তুর আয়তন, সংখ্যা, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণকে মুখ্যগুণ বলা হয়। এই সমস্ত গুণ সকল লোকের কাছেই একরকম বলে মনে হয়। কিন্তু আর কতগুলো গুণ আছে যা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি এই জাতের অন্তর্গত। এদের নাম গৌণ গুণ। বস্তুর দ্রব্যত্ব ও মুখ্য গুণগুলোই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। গৌণ গুণ একান্তভাবেই জ্ঞান-নির্ভর।

লকের সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গুণের এই দুই ভাগ স্বীকৃত ছিল। লক্ নিজের বক্তব্য তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত।

আমরা আগেই দেখেছি, সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের এই দোষ দূর করার জন্য লক্ প্রতীকবাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে আমরা কোন বস্তুই সরাসরি জানতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়পথে ছাপ বা প্রতীক এসে মনের পর্দায় দাগ কাটে। আমরা সরাসরি এই ছাপ বা প্রতীক বা ধারণাই জানতে পারি। যখন কোন প্রতীক বা ধারণা জানি, তখন এর পশ্চাতে যে বস্তু আছে, তাও জানি। সুতরাং বস্তু-জ্ঞান প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যখন প্রতীক বা ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় তখন আমরা সত্যজ্ঞান লাভ করি। আমাদের ধারণার সঙ্গে যখন বস্তুর মিল হয় না তখন জ্ঞান হয় মিথ্যা। এই মতানুসারে বস্তুর প্রতীকই আমরা সরাসরি জানি বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে প্রতীকবাদ।

১। Primary Qualities (যে সমস্ত গুণ বস্তুর শত পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে লক্ তাদের নাম দিয়েছেন মুখ্য গুণ)।

২। Secondary Qualities (এই গুণগুলি বস্তুর স্বরূপগত নয়, বস্তুর মুখ্য গুণের দ্বারা আমাদের মনে সংবেদন-সৃষ্টির কতকগুলি শক্তি।

এই মতের সমর্থকদের মতে এর সাহায্যে সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায়। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি, তখন সর্প আমাদের একটি ধারণা বা প্রতীক মাত্র। এই প্রতীকের সঙ্গে বস্তুর মিল নেই বলে সর্পজ্ঞান সত্য নয়, মিথ্যা।

সমালোচনা : ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে প্রতীকবাদের একটি বিশেষ গুন বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রতীকবাদ ভ্রান্তজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এ ছাড়াও প্রতীকবাদের আরও দোষত্রুটি আছে।

প্রথমতঃ, প্রতীকবাদের মতে বস্তু কখনই সরাসরি জানা যায় না। যা সরাসরি জানা যায় না তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। দার্শনিক বার্কলি এই সূত্র ধরেই জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। জন লক্ প্রতীকবাদের পত্তন করে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের শ্মশান-শয্যা রচনা করেছেন। কারণ বার্কলির ভাববাদ এই প্রতীকবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। বার্কলি বলেছেন, যা আমরা সরাসরি জানি তা সবই যদি আমাদের ধারণা হয় তবে একমাত্র ধারণাই আছে—একথা স্বীকার করতে হবে। আর একমাত্র ধারণাই সত্য, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু বলে কিছু নেই—একথা বললে বস্তুস্বাতন্ত্রাবাদের মূলোচ্ছেদ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই মত স্বীকার ক'রে নিলে জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। লক বলেছেন—ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হ'লে জ্ঞান সত্য হবে। কিন্তু তাঁর মতে বস্তু সরাসরি জানা যায় না। সুতরাং যে বস্তু আমরা জানি না তাঁর সঙ্গে ধারণা মিললো কি মিললো না তাও জানা যাবে না। আর তা জানা না গেলে বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-Realism) :

এইমাত্র দেখলাম, লকের প্রতীকবাদ বার্কলির ভাববাদের গোড়াপত্তন করেছে। তাই আধুনিক কালে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়ধ্বজা নিয়ে একদল উৎসাহী দার্শনিক প্রতীকবাদ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা দল পাকিয়েছেন, বার্কলির ভাববাদের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছেন আর দর্শনের মন্দিরে কোলাহল জমিয়েছেন প্রচুর। এঁরা ভীষণ রকমের বিদ্রোহী, আর এঁদের বিদ্রোহ মুখ্যতঃ বার্কলির ভাববাদের

বিরুদ্ধে। হেগেলের এবং বিশেষ করে ব্র্যাডলির পরব্রহ্মবাদকেও[১] এঁরা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। সোজা কথায় সমস্ত রকমের ভাববাদের কবর খননই এঁদের কাজ। দর্শনের ইতিহাসে এই উৎসাহী গোষ্ঠীর মতবাদ নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের মূলে রয়েছেন ব্রিটিশ দার্শনিক মুর ও রাসেল। আমেরিকার হোল্ট, মার্ভিন, মন্টেগ্ ও পেরী প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েছেন। ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজাণ্ডার নানা দিক থেকেই এই আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু আমেরিকার নব্যতন্ত্রীদের সঙ্গে ব্রিটিশ দার্শনিকদের কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্যও আছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর 'মাইণ্ড' পত্রিকায় 'ভাববাদ খণ্ডন' (The Refutation of Idealism) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের আন্দোলনের পত্তন করেন। অনেকে বলেন, য়ুরোপে ব্রেন্টানোর চিন্তায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত।[২] মুরের মূল কথা এই যে, জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় স্বতন্ত্র, সংবেদন (sensation) এবং সংবেদনের বিষয় (object of sensation) ভিন্ন, জ্ঞানের বিষয় না থাকলে জ্ঞান হয় না, সংবেদনের বিষয় না থাকলেও সংবেদন হ'তে পারে না। সংবেদনের বিষয়কে মুর ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense-datum) নামে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সন্নিকর্ষ হ'লে যা সরাসরি জানা যায়, যেমন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি তা-ই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান নয়; সংবেদনের বিষয়, সংবেদন নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বাহ্যবস্তু-লগ্ন এবং বাহ্যবস্তুরই অংশ, কিন্তু কিভাবে অংশ এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রকৃতি কি, এ বিষয়ে মুর কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেননি।

রাসেলও মুরের মত জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র এবং বিষয় ছাড়া যে সংবেদন হ'তে পারে না তা স্বীকার করেন। তিনিও মুরের মতই ইন্দ্রিয়োপাত্ত গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন,[৩] সংবেদনে যা সরাসরি জানা যায় তার নাম ইন্দ্রিয়োপাত্ত। বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি সরাসরি সংবেদনের বিষয় বলে তাদেরই ইন্দ্রিয়োপাত্ত নাম দেওয়া যায়। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ বিষয়ে রাসেল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এখানে সে আলোচনা অসম্ভব। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা রাসেল-রচিত 'মাই ফিলসফিকেল

১। Hegel's and specially Bradly's Absolute Idealism.

২। D. M. Datta: The Chief Currents of Contemporary Philosophy, ২৯৬-২৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। Russell: Problems of Philosophy, p 17.

ডেভলাপমেন্ট' গ্রন্থটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন।[১] ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ মুরের মতই রাসেলের কাছেও এক মহা সমস্যা এবং তাঁরা কেউই এই সমস্যার সঙ্গত সমাধান কিছু দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

লকের প্রতীকবাদ বার্কলির ভাববাদ সৃষ্টি করে ব'লে প্রথমেই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীরা প্রতীকবাদ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কোন প্রত্যক বা ধারণা নেই। বিষয় বা বস্তু আমরা সোজাসুজি জেনে থাকি। এঁদের কথা অনেকটা সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথার মত। সেজন্য অনেকেই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেরই নূতন সংস্করণ ব'লে মনে করেন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় সোজাসুজি এই জগতেরই বিষয়। ভাববাদীদের মতে, বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এঁরা ঠিক উল্টোভাবে বলেন—জ্ঞানই বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, এঁরা আরও সাংঘাতিক কথা বলেন। আমেরিকার নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে মন বিষয়েরই একটি সংস্থামাত্র; বিষয় ভিন্ন মন ব'লে আলাদা কিছু নেই। হোল্ট ত' মন বা চৈতন্যকে স্নায়বিক চক্রের বিশেষ সংক্ষোভ-নির্দিষ্ট বিশ্বের একটি অংশ বলে মনে করেন।[২] বস্তুর সঙ্গে স্নায়বিক চক্রের সন্নিকর্ষ হ'লেই বিশ্বের অন্যান্য বস্তু থেকে সেই বস্তুটি আলাদা হয়ে যায়। এই বস্তুই জ্ঞানের বিষয় আর এরই আর এক নাম মন।[৩] বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ জ্ঞানই মন বা চৈতন্য সৃষ্টি করে। জ্ঞান আর জ্ঞানের বিষয় একান্তভাবেই অভিন্ন। দুনিয়ায় মানসিক বা অধ্যাত্মিক[৪] বলে কিছু নেই, সবই বিষয় বা বিষয়-সম্ভূত। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। একটি বিশেষ মুহূর্তে 'ফুল' আমাদের জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল—জ্ঞান হবে কি করে? হোল্ট

১। D. M. Datta : The Chief Currents of Contemporary Philosophy গ্রন্থের ৩৭৩-৩৭৯ পৃষ্ঠায় মুর ও রাসেলের মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

২। 'Cross-section of the universe selected by the specific response of the nervous system'—Holt.

৩। Just as a searchlight, by playing over a landscape and illuminating now this object and now that, defines a new collection of objects, so the specific response of the organism, equipped with acentral nervous system, makes a definite collection of the objects'.—Dr. S. C. Chatterjee, The problems of Philosophy, ৮০ পৃষ্ঠা।

৪। Mental or Spiritual

বলবেন—আমাদের স্নায়ুর মধ্যে 'ফুল' সংক্ষোভ[১] সৃষ্টি করবে। ফলে, ফুলটি জগতের অন্য বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। কারণ ফুলটি স্নায়ুতে সংক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অন্য বস্তু তেমনভাবে স্নায়ুকে সংক্ষুব্ধ করে নি। এই দিক থেকে স্নায়ুর সংক্ষোভ-স্রষ্টা 'ফুল' অন্য বস্তু থেকে ত' আলাদাই হবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সংক্ষোভ-স্রষ্টা 'ফুল' জ্ঞানের বিষয়—এটাই জ্ঞান—আবার এই বস্তুই মন বা চৈতন্য। হোল্ট প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, ভাববাদী দার্শনিকেরা আত্মমুখী প্রবণতা[২] থেকে দুনিয়াকে বিচার করেন ব'লে তাঁদের কাছে বিষয় জ্ঞান-নির্ভর মনে হয়। সমস্ত বস্তুই আত্মার ওপর নির্ভর করে এরকম মনে করাই আত্মমুখী প্রবণতার লক্ষণ। আত্মমুখী প্রবণতার জন্য সমস্ত বস্তুকেই আত্ম-কেন্দ্রিক[৩] বলে মনে হয়। আত্মমুখী প্রবণতা মানুষের একটা দুর্বলতা বিশেষ। নিজেকে অহেতুক সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রস্থিত মনে করা দুর্বলতা ছাড়া আর কি হবে? এই দুর্বলতা দূর করতে পারলেই সত্যদৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে। আর তখন মনে হবে, বস্তু একান্তভাবেই জ্ঞানাতিরিক্ত, জ্ঞান বস্তুরই সৃষ্টি। এমন কি ভ্রম-প্রমাদের বিষয়ও অবাস্তব[৪] নয়।

ভাববাদীরা ভ্রম-প্রমাদের বিষয়কে জ্ঞানসাপেক্ষ ব'লে মনে করেন, আর এই যুক্তিতে সমস্ত বস্তুই জ্ঞানসাপেক্ষ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ভ্রম-প্রমাদের বস্তু আদৌ জ্ঞান-নির্ভর নয়। ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয়ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ ও বাস্তব। এখানে প্রশ্ন ওঠে—অন্ধকারে যখন রজ্জুতে ভুল ক'রে সাপ দেখি—তখন রজ্জু ও সর্প দুইই একসঙ্গে বাস্তব[৫] হবে কি করে? এই রকম ধরনের প্রশ্ন আশঙ্কা ক'রে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার জ্ঞানের বিষয়ই সৎ[৬]। এই সৎ বস্তু যখন দেশে ও কালে থাকে তখন তা সত্যজ্ঞানের বিষয় হয়, আর তখন তাকে স্থিতিসম্পন্ন বস্তু[৭] বলি। যে সৎ বস্তু দেশে ও কালে থাকে না তা যখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন আমাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়ে থাকে। এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয় স্থিতিসম্পন্ন না হ'লেও বাস্তব। এই বস্তু সৎ এবং কোন দিক থেকেই তা মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। রজ্জুতে যখন সর্প দেখি তখন সৎসর্পকে স্থিতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। এই বিশেষ

১। Irritation
২। Ego-centric Predicament
৩। Ego-centric
৪। Unreal
৫। Real
৬। Subsistent
৭। Existent

ক্ষেত্রে রজ্জু দেশে ও কালে থাকে, কিন্তু সর্প দেশে ও কালে থাকে না। একই দেশে ও কালে যদি রজ্জু ও সর্প দুই-ই থাকত তবে বিরোধ দেখা দিত। এখানে রজ্জু দেশকালস্থিত ও সর্প তা নয় বলে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আসলে সৎ বস্তুকে স্থিতিসম্পন্ন ব'লে মনে করার জন্যই ভ্রান্তজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। যে সৎবস্তু স্থিতিসম্পন্নও বটে তার জ্ঞানই সত্যজ্ঞান। বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের বাস্তবতা প্রমাণ করতে আরও অনেক জটিল যুক্তিজালও বিস্তার করেছেন[১]। তাঁরা বলেন, দু'টি বিপরীত শক্তি যদি সমান হয় এবং একটি বলের ওপর কাজ করে তবে বলটি স্থির থাকে। সেই ক্ষেত্রে বিপরীত শক্তির একত্র অবস্থান অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ। সুতরাং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ভ্রান্তির স্থলে রজ্জু ও সর্পের একত্র অবস্থানের কথা কল্পনা করা অসম্ভব কি?

তাঁরা আরও বলেন, আরসির সামনে যদি কতগুলো বস্তু থাকে তবে এই বস্তুদের একই সঙ্গে আরসির ভেতরে এবং আরসির সামনে দেখা যায়। একই সঙ্গে বস্তুদের যদি দুই স্থানে থাকা সম্ভব হয় তবে একই সঙ্গে কোন বস্তু সত্য এবং মিথ্যা হ'তে বাধা কি।

আমাদের মনে হয়, এই দুটি দৃষ্টান্তের একটিও নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য প্রমাণ করে না। ঊর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি যখন একটি বলের ওপর ক্রিয়াশীল হয় এবং বলটি স্থির থাকে তখন ঊর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতির পরিমাণ সমান হওয়ার জন্য তাদের কোন প্রভাবই থাকে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রটিকে বিরুদ্ধ বা বিপরীত বস্তুর একত্র অবস্থানের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। আর আরসির সম্মুখে স্থাপিত বস্তুদের যখন আরসির মধ্যেও দেখা যায় তখন আরসির সম্মুখে এবং আরসির মধ্যে একই সঙ্গে বস্তুগুলো বাস্তবতঃই থাকে না। আরসির মধ্যে যে বস্তু দেখা যায় তা আরসির সম্মুখস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্বমাত্র, সেই বস্তুই নয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে একই সঙ্গে বস্তুর বিভিন্ন দেশে অবস্থান প্রমাণ করে না।

মণ্টেগ্ অবশ্য হোল্ট যে ভাবে ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মানতে রাজী নন। মণ্টেগ্ বলেন, জ্ঞান ব্যাপারটিকে একটি ত্রিভুজের আকারে কল্পনা করা যেতে পারে। এই ত্রিভুজের তিন কোণে যথাক্রমে (১) আসল বাহ্য বস্তু (The actual external objcct or Oe), (২) উদ্ভূত মস্তিষ্ক-বৃত্তি (The cerebral state generated or Oc) এবং (৩) প্রত্যক্ষ বিষয় (The objcct perceived

১। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ের বিশদ আলোচনার জন্যে 'Holt and others'-বিরচিত 'The New Realism' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

or Op) রয়েছে। উদ্ভূত মস্তিষ্ক-বৃত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে। যদি উদ্ভূত মস্তিষ্ক-বৃত্তি একমাত্র আসল বাহ্য বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট হয় তবে উদ্ভূত মস্তিষ্ক-বৃত্তির ভিত্তিতে আমরা যথার্থতঃই তার কারণ আসল বাহ্যবস্তুকে জানতে পারি। এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবিষয় এবং আসল বাহ্যবস্তু অভিন্ন। কিন্তু একই কার্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময় হ'তে পারে তেমনি উদ্ভূত মস্তিষ্ক-বৃত্তি অনেক সময় কেবলমাত্র বাহ্য বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট নাও হ'তে পারে, তখন প্রত্যক্ষ-বিষয় এবং আসল বাহ্যবস্তু ভিন্ন হ'বে এবং জ্ঞান হ'বে মিথ্যা।[১] ভগ্ন যষ্ঠী যে মস্তিষ্ক-বৃত্তির সৃষ্টি করে, জলে নিমগ্ন ঋজু যষ্ঠীও সেই মস্তিষ্ক-বৃত্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু, প্রথম ক্ষেত্রে যখন আমরা মস্তিষ্ক-বৃত্তির ভিত্তিতে ভগ্ন যষ্ঠী জানি তখন জ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান হয় মিথ্যা।

মন্টেগ্ বহুকারণবাদ (Plurality of causes) স্বীকার করে ভ্রম-জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু, আমরা জানি বহুকারণবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়[২], সুতরাং এই ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়।

সমালোচনাঃ মহা আড়ম্বর ক'রে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভাববাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তা এক মহা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা তর্কের ঝড় তুলেছেন, ঝড়ে ধুলোও উড়েছে প্রচুর। দৃষ্টি তাতে আমাদের আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং সত্যদৃষ্টিলাভের পক্ষে এ এক মহা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক্, প্রশান্ত মুহূর্তে আলোচনা ক'রে দেখলে মনে হয় নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কতগুলো নূতন নূতন শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছুই দেবার নেই। ভাষার কুহেলিকা ছিন্ন করলে মনে হবে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেরই এ এক নূতন সংস্করণ। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতই—বস্তু সরাসরি জানা যায়—একথায় এঁরাও বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা সৎবস্তু, স্থিতিসম্পন্ন বস্তু প্রভৃতি বস্তুর নানা রকমফের স্বীকার করে এঁরা ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি, সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সৎব্যাখ্যা দিতে পারেন না। নব্যতন্ত্রীরা ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ধারণা তাতে তাঁদের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে—ভ্রান্তজ্ঞানের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

১। 'The source of error in other words is due to the plurality of causes and to the counter action of effects'—The New Realism, ২৯৮ পৃঃ

২। Mellone—An Introductory Text Book on Logic দ্রষ্টব্য।

আমেরিকার নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় অবাস্তব নয়। এরা সৎ, কিন্তু স্থিতিসম্পন্ন নয়। ভ্রান্তজ্ঞানে সৎ বস্তুকেই স্থিতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। প্রশ্ন হ'ল, এ রকম মনে করার কারণ কি? নিশ্চয়ই কারণটা ব্যক্তিগত ও মানসিক। কারণ, কোন কোন ব্যক্তির কাছেই এই ভ্রান্তজ্ঞান উৎপন্ন হ'য়ে থাকে; সকলের কাছে হয় না। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভ্রমের কোন ব্যক্তিগত বা মানসিক কারণ স্বীকার করেন না। আমাদের বিবেচনায় ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যায় নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এটাই ভ্রম।

দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যার অতি উৎসাহে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে সৎ বস্তুর সৃষ্টি করেছেন এ জগতে তার দেখা মেলে না। রাসেল এই বস্তুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—এগুলো মানসিকও নয় আবার জড়ীয়ও নয়[১]; এগুলোকে 'মাঝামাঝি পদার্থ'[২] বলা যেতে পারে। এই মাঝামাঝি পদার্থ একটা বিশেষ গঠন-প্রক্রিয়ায় মন বা চৈতন্যের সৃষ্টি করে আর অন্য এক গঠন-প্রক্রিয়ার জড়বস্তুর সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—মানসিকও নয় আবার জড়ীয়ও নয় এমন কোন মাঝামাঝি পদার্থ আছে কি? এ ত বুদ্ধিসৃষ্ট একটা কল্পনামাত্র। জগতে এমন ভৌতিক পদার্থ কখনই দেখা যায় না। আর তা ছাড়া এই পদার্থ মন বা জড়কে কি ক'রে সৃষ্টি করে তাও বোঝা যায় না। মন বা জড় উভয়ই পার্থিব বস্তু। কিন্তু মাঝামাঝি পদার্থ ত সেই অর্থে কখনই পার্থিব নয়। কারণ কেউ কোন দিন এই পদার্থ দেখেনি। কি ভৌতিক প্রক্রিয়ায় এই ভৌতিক পদার্থ জাগতিক মন ও জড়কে সৃষ্টি করে তা বোঝা যায় না।

তৃতীয়তঃ, ভাববাদ খণ্ডনের অতি উৎসাহে কোন কোন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক ত মন বা চৈতন্যকে বস্তু বা বিষয়ে পরিণত ক'রে ফেলেছেন। এঁদের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে এই দলেরই ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে মন বা চৈতন্যের বস্তু-অতিরিক্ত সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি মনে করেন, মনটা যেন আলোর মত জগতের কতগুলো বস্তুকে আলোকিত করে। আমরা এই আলোকিত বস্তুগুলিই জানি। আলো আর আলোকিত বস্তু কখনই এক হ'তে পারে না। বিশেষতঃ মন আর বিষয়কে ত একভাবে জানাই যায় না। মন কখনও জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না। মন জ্ঞাতা, কিন্তু জ্ঞেয় নয়। জ্ঞানের বিষয় হ'য়ে গেলে মন জ্ঞাতা থাকে না,

১। Neither mental nor physical
২। Neutral entities

জ্ঞেয় হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় হিসেবে জ্ঞাতা মনকে কখনই জানা যায় না। আলেকজেণ্ডারের মতে জ্ঞাতার পরিচয় একজাতীয় অনুভূতিজাত সম্ভোগের[1] মধ্যে পাওয়া যায় আর বিষয় সাধারণ জ্ঞানেই[2] লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং এই দিক থেকেও মন আর বিষয় কখনও এক হ'তে পারে না।

ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের এক নূতন ভাষ্য দিয়েছেন। আমরা এখন অতি সংক্ষেপে তাঁর জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করব।

মার্কিন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত অদ্ভুত রকম নূতন কথা বলার ঝোঁক আলেকজেণ্ডার সাহেবের নেই। তিনি অনেকটা সংযমী। তাই সহজ ভাবেই তিনি জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা শুরু করেছেন। সমস্ত কিছুই বিষয় বা বিষয়াকার— এমন অসত্যভাষণ তাঁর দর্শনে নেই। তিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে দুভাগে ভাগ করতে বলেন—মন ও বহির্বস্তু। এক ভাগের সঙ্গে আর একভাগের সংযোগ[3] ঘটলে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। ভেবে দেখতে হ'বে এ সংযোগ ঠিক কোন্ জাতের। ভাববাদীরা এই সংযোগে মনের অযথা প্রাধান্য দেন। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু কোন বস্তুর জ্ঞান না হ'লে বস্তুটি জানা যায় না, সুতরাং জ্ঞাত বস্তু ছাড়া বস্তুই নেই। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুর জ্ঞাততা ধর্ম জ্ঞান-নির্ভর বটে, কিন্তু বস্তু-সত্তা কখনই জ্ঞান-নির্ভর নয়। আমরা জানি না এমন অনেক বস্তুই আছে। মন বস্তুর চেয়ে উন্নত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে বস্তু মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মন ও বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ফলে জ্ঞান যে সংযোগের ফল তা কেবল দুটি স্বতন্ত্র বস্তুর সংযোগমাত্র। এ সংযোগ অতি সাধারণ একত্র সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। গাছের সঙ্গে ঘাসের, ডিমের সঙ্গে টেবিলের যেমন একত্র সমাবেশ হয়, জ্ঞানও তেমনি মনের সঙ্গে বস্তুর একত্র সমাবেশ মাত্র। ঘাস ও গাছ, ডিম ও টেবিল যখন একত্র সমাবিষ্ট হয় তখন সত্তার দিক থেকে একটি আর একটির ওপর নির্ভর করে না। জ্ঞানের বেলাতেও মন ও বস্তু যখন একত্র হয় তখন একটি আর একটির ওপর নির্ভর করতে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে জ্ঞানগত সমাবেশের সঙ্গে সাধারণ সমাবেশের কোন তফাৎই নেই কি? উত্তরে

১। Enjoying

২। Contemplated

৩। Compresence or Togetherness

আলেকজেণ্ডার সাহেব বলেন, সমাবেশের প্রকৃতির দিক থেকে জ্ঞান-গত সমাবেশ ও সাধারণ সমাবেশের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু সমাবিষ্ট বস্তর প্রকৃতির দিক থেকে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য সমাবেশে উভয় বস্তুই বিষয় মাত্র, কাজেই সেখানে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাবিষ্ট বস্তুর একটি অন্যটির চেয়ে একটু উন্নত ধরনের। মন বস্তুর চেয়ে উন্নত, তাই সে বস্তুকে জানতে পারে। কিন্তু তা বলে মন বস্তুকে সৃষ্টি করে এমন কথা বলা যাবে না।

মন যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুর সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয় তখন বস্তুর কতগুলো গুণ প্রয়োজন অনুসারে মন আলাদা করে নেয়। এই আলাদা করা গুণগুলো বস্তুরই গুণ। কখনও কখনও মনের এই নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বস্তুর নির্দেশে হয় না। তখন ভ্রান্ত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, মানসিক প্রক্রিয়ার জন্যই এরকম হ'য়ে থাকে। ব্যক্তিগত মানসিক প্রক্রিয়া বস্তু যেখানে আছে সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্য আর এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে। ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাস্তবই বটে, কিন্তু অংশগুলো বাস্তবে যেমনভাবে আছে তেমনভাবে ভ্রান্ত জ্ঞানে থাকে না। এই মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় নৈয়ায়িকদের 'অন্যথা খ্যাতিবাদ'-এর যথেষ্ট মিল আছে। নৈয়ায়িকদের মতে ভ্রমে যে বস্তু ভাসে তা মনের ধারণা মাত্র নয়। ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয় জাগতিক বস্তুই বটে। তবে বস্তুটিকে যথাস্থানে না দেখাতেই ভ্রান্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। অন্ধকারে লোকে রজ্জুতে যখন সর্প দেখে তখন অন্য সময় অন্যত্র যে সর্প দেখা গিয়েছিল তারই স্মৃতি রজ্জুতে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। সুতরাং এই ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সর্প দেখা যায় তা বাস্তবই বটে, তবে যে বিশেষ স্থানে তাকে দেখা যাচ্ছে সেখানে তা নেই।

সমালোচনা : এই জাতীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, ভ্রমে যে সর্প দেখি তা যদি অন্যত্র থাকে তবে সেই সর্প দর্শনে লোকে ভয় পাবে কেন? অথচ আমরা জানি অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দেখে অনেকেরই ভয় হয়। সুতরাং লোক-ব্যবহার অন্যথা খ্যাতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর একটা কথাও বলবার আছে। আলেকজেণ্ডার বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক হিসেবে জ্ঞানের বিষয়ে মনের কোন অবদান স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেছেন, মানসিক প্রক্রিয়াই (Squintment of mind) ভ্রমের জন্য দায়ী। একথা বললে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যে মানস-সৃষ্ট নয় তা মানা যাবে না।

আর তা হ'লে ভাববাদেরই জয় হ'বে। সুতরাং আলেকজেণ্ডার সাহেবের ভ্রান্তজ্ঞান-ব্যাখ্যা ভাববাদের পথই প্রশস্ত করে দেয়।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ
বা
বিচারমূলক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Critical Realism)

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অসুবিধেগুলি দূর করার জন্য একদল মার্কিন দার্শনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের নবভাষ্য রচনা করেছেন। ড্রেক, প্র্যাট্, সাণ্টায়ন প্রভৃতি দার্শনিক এই দলের স্রষ্টা।[১] এঁদের নবভাষ্য বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এক ভ্রান্ত মতবাদ থেকে দর্শন শুরু করেছেন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ধারণা বস্তু সোজাসুজিই জানা যায়। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে এইধারণা সর্বৈব মিথ্যা।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, বস্তু যদি সোজাসুজিই জ্ঞানের বিষয় হ'ত তবে ভ্রান্তজ্ঞানের কখনই উদ্ভব হ'ত না। যা আমরা সরাসরি জানি তা কখনও ভুল হতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভ্রান্তজ্ঞানের ত' অভাব নেই। অন্ধকার রাত্রে প্রায়ই ত' লোকে রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করে। সুতরাং বস্তু কখনই সরাসরি জানা যেতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞান বা চৈতন্য। কিন্তু তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে—বিভিন্ন লোক একই সময়ে একই বস্তু দেখে কি করে? রামবাবু যখন আকাশের চাঁদ দেখেন তখন চাঁদ বস্তুটাই যদি রামবাবুর জ্ঞান বা চৈতন্য হয় তবে সেই সঙ্গে সেই চাঁদই আবার শ্যামবাবুর জ্ঞান বা চৈতন্য হ'বে কি ক'রে? রামবাবুর ও শ্যামবাবুর একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ত' আর একই জ্ঞান নয়। সুতরাং একই বস্তু বিভিন্ন জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় কি করে? এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নয়। আসলে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা একই সময়ে কি করে বিভিন্ন লোক একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে তার সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

১। Drake, Lovejoy, Pratt, Rogers, Santayana, Sellars এবং Strong একত্রে 'The Essays in Critical Realism' নামে বই লিখেছেন।

তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞান সবসময় বস্তুর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্বীকার করতে পারে না। যে নক্ষত্র লক্ষ মাইল দূরে, তার আলো যখন বহু বছর পরে চৈতন্যে এসে পৌঁছায়, তখনই তার জ্ঞান হয়। তাই চেতনার সঙ্গে নক্ষত্রের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। নক্ষত্রের আলোর সঙ্গেই চৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিচয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের বেলায়ই ত' এ রকম ভাবা যেতে পারে।

চতুর্থতঃ, একই বস্তুর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হতে পারে। সুস্থ চোখ যে জিনিস 'সবুজ' দেখে, অসুস্থ চোখ তাকেই 'হলদে' দেখতে পারে। এসব উদাহরণের বেলায় যদি জ্ঞানের জিনিস বহির্বস্তু বলে মানতে হয় তবে বস্তুটি একই সঙ্গে 'সবুজ' ও 'হলদে' এমন অদ্ভুত কথা বলতে হবে। কিন্তু তা কি আর হয় ?

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা মানা যায় না বলে ভাববাদ মানবারও সঙ্গত কোন কারণ নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় বহির্বস্তু নয় বলেই তা মনের ধারণা মাত্র নয়। যখন একটা গোলাকার ফুটবল মাঠে গড়িয়ে যেতে দেখি তখন তা নিশ্চয়ই মনের ধারণা নয়। মনের ধারণা কখনই গোল হতে পারে না, আর তা মাঠে গড়িয়েও যেতে পারে না। সুতরাং যা জানি তা কখনই মনের ধারণামাত্র হ'তে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন ওঠে—আমরা সরাসরি কি জানি? বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মতে বহির্বস্তু মানবমনে এক রকম প্রভাব প্রেরণ করে। এই প্রভাবকে আশ্রয় করেই বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব। জ্ঞাতা যে জিনিস সোজাসুজি জানে সে জিনিস বহির্বস্তুও নয়, মনের ধারণামাত্রও নয় ; তা বহির্বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া একপ্রকার প্রভাব বিশেষ। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বস্তুর যে প্রভাব আমরা সোজাসুজি জানি তার নাম 'স্বভাব-বিমিশ্র'[১] বা 'আন্তর সত্তা'[২] দেওয়া যেতে পারে। এই 'স্বভাব-বিমিশ্র' বা 'আন্তর সত্তা' জড়ও নয় আবার চেতনও নয়, এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ বিশেষ।[৩] এই 'আন্তর সত্তা' গ্রহণ করবার পর মানুষ

১। Character complex
২। Essence
৩। Logical entities

Passmore : A Hundred years of Philosophy গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন—'Fore the more Conservative wing, in contrast, analysis, although not immediate apprehension, reveals the character—comp lex to be the property of a particular mental state, to the question where it exists, there is a clear answer in the mind'. স্বভাব-বিমিশ্র যদি মানসস্থিত কোন মানসিক বৃত্তির ধর্ম হয় এবং তা-ই যদি একমাত্র সরাসরি জানা যায় তবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এবং জ্ঞান স্বীকারের আর কোন যুক্তি থাকে না।

বহির্জগতে এদের বাস্তব উৎস কল্পনা করে নেয়। সে কল্পনা যেখানে যথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে সত্য, যেখানে অযথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে ভ্রান্ত।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা প্রত্যেক জ্ঞানেরই তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষকারী মন, বহির্বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত[১] এই তিন অঙ্গ। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদে ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বভাব-বিমিশ্র বা আন্তর সত্তা নামে পরিচিত। প্রত্যক্ষকারী মন সরাসরি আন্তর সত্তাই জানে। আন্তর সত্তা থেকে বহির্বস্তু কল্পনা করে নেওয়া হয়। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিষয় ভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা মন কখনই এক হ'তে পারে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, অনেকের মতে ব্রেন্টানো-শিষ্য মেইনঙ্ (Meinong) জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটি অঙ্গের (বাহ্য বস্তু, জ্ঞানের বিষয় এবং মানসিক ক্রিয়া—object, content and act) কথা বলে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বক্তব্য ভাল করে লক্ষ্য করলে এই মতবাদ প্রতীকবাদেরই নব সংস্করণ বলে মনে হয়। প্রতীকবাদী লকের মতে বস্তুর প্রতীক বা ধারণার মধ্য দিয়েই আমাদের বস্তু-জ্ঞান হ'য়ে থাকে। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতেও বস্তুর প্রভাব আন্তর সত্তা বা স্বভাব-বিমিশ্রের মাধ্যমেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। কিন্তু বৈচারিক মতবাদীরা নিজেদের প্রতীকবাদী বলে পরিচয় দিতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, যদিও বস্তু আন্তর সত্তার মাধ্যমেই জানা যায় তবুও বস্তু আমরা সরাসরিই জানি। মানুষ যখন চোখ দিয়ে কোন বস্তু দেখে তখন সে নিশ্চয়ই সরাসরিই বস্তুটি দেখে থাকে; চোখ দিয়ে দেখে বলে সে সরাসরি দেখে না, এমন কথা বলা যায় না। ঠিক তেমনি করে যদিও আমরা আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তু জানি তথাপি তা সরাসরিই জানি।

সমালোচনা :—বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বস্তুর আন্তর সত্তাই আমরা সরাসরি জানতে পারি। আন্তর সত্তা দেখে বস্তু-স্থিতি আমরা কল্পনা ক'রে নেই। আমরা যা কল্পনা করি তার সম্বন্ধে অতি সহজেই সংশয় পোষণ করা যেতে পারে। সুতরাং বস্তু-স্থিতিও সন্দেহের বিষয়।

১। Sense datum

দ্বিতীয়তঃ, বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তা কি ভাবে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত তা না জানলে আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞান কী করে সম্ভব তা ত' বোঝা যায় না। আর বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তার সঙ্গে দেশকালস্থিত বস্তুর কোন সম্পর্ক হতে পারে কি ?

তৃতীয়তঃ, বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তু জানলেও বস্তু সরাসরি জানা যায় বলে মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন—মানুষ যখন চোখ দিয়ে কোন বস্তু দেখে তখন ত' সে সরাসরিই দেখে। আমাদের মনে হয়, উদাহরণে যে তুলনা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। জ্ঞাতা যে চোখ দিয়ে দেখে সে চোখ ত' জ্ঞাতার দেহেরই অঙ্গ। সুতরাং অঙ্গী অঙ্গ দিয়ে সরাসরিই যে কোন বস্তু পাবে তাই স্বাভাবিক। কিন্তু আন্তর সত্তা ত' বস্তুর অঙ্গ নয়; কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তা দেশকালস্থিত বস্তুর অঙ্গ হ'তে পারে না। সুতরাং আন্তর সত্তার মাধ্যমে যখন বস্তু জানা যায় তখন বস্তু সরাসরিই জানা যায়, এমন কথা ভাবা যায় না। আসলে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতীকবাদেরই নামান্তর মাত্র।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হল। কিন্তু বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের কোন ভাষ্যই যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকলো না। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সমস্ত বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়াতে সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের চিরশত্রু ভাববাদ নিয়ে আলোচনা করব।

ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদের মতে বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। কোন বিষয়ই জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কও আন্তরিক।[১] জ্ঞান ছাড়া বিষয় ভাবাই যায় না। দুনিয়ায় একমাত্র জ্ঞানই স্বয়ংনির্ভর ও পরনিরপেক্ষ। বিষয় নিয়তই জ্ঞান-নির্ভর ও জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং বিষয়ের কোন আত্যন্তিক সত্তা[২] নেই। জ্ঞানই চরম সত্য ও সত্তা। জ্ঞানকে আত্মা, চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসাবেও ভাবা যেতে পারে।

১। Internal

২। Ultimate reality

ভাববাদের এই মূল বক্তব্যের পক্ষে নানা রকমের যুক্তির অবতারণা করা হয়। আমরা এখানে শুধু প্রধান যুক্তিগুলোরই উল্লেখ করব।[১]

(১) কখনও কখনও যেখানে যে বস্তু নেই সেখানে সেই বস্তু দেখা যায়। অন্ধকারে অনেক সময়েই আমরা রজ্জুকে সর্প মনে করে ভয় পাই। এই ক্ষেত্রে সর্প মনের একটি ধারণা মাত্র। যদি এই বিশেষ ক্ষেত্রে মনের ধারণাকে বাইরের বস্তু বলে মনে হয়, তবে বাইরের সমস্ত বস্তুই যে মনের ধারণা নয় তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ভাববাদীদের মতে ভ্রমে ভাসমান সর্পের মত সমস্ত বস্তুই মনের ধারণা।

(২) বিজ্ঞানীরা বলেন, অনেক নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোতে কোটি কোটি বৎসর কেটে যায়। এক কোটি বছর আগে যে আলো নক্ষত্র থেকে যাত্রা শুরু করেছে সে হয়ত আজ এসে আমাদের কাছে পৌঁছোল। ইত্যবসরে নক্ষত্রটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা যখন আজ নক্ষত্র দেখছি তখন সত্যি সত্যি নক্ষত্রটি আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ করা যেতে পারে। বিশেষতঃ নক্ষত্র না থাকলেও কখনও কখনও তার আলো আমরা দেখতে পারি সুতরাং বস্তু না থাকলেও তার জ্ঞান হতে পারে।

(৩) যখনই যে বস্তু জানা যায় তখনই তা জ্ঞাত বস্তু রূপে জানা যায়। সুতরাং না জানলে বস্তু থাকে এমন ত' কোন প্রমাণ নেই।

(৪) ডেকার্টে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত বস্তুকেই সংশয় করা যায়। কিন্তু সংশয়াত্মাকে সংশয় করা যায় না। যা সংশয় করা যায় না—তা-ই একমাত্র সত্য। সুতরাং আত্মাই চরম সত্য। আত্মা আবার জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানকেই পরম সত্য বলা যেতে পারে।

ডেকার্টে কি করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোলেন তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ডেকার্টে প্রথমে সব কিছুকেই সংশয় করে দার্শনিক চিন্তা শুরু করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বের বস্তুরাজ্য অতি সহজেই সংশয় করা যায়। অন্ধকারে যেখানে সর্প নেই সেখানে যেমন আমরা সর্প দেখি, তেমনি যেখানে জগৎ নেই, সেখানে জগৎ দেখি, এমন ত' অতি অনায়াসেই ভাবা যেতে পারে। গণিতের জ্ঞান সম্বন্ধেও সংশয় সম্ভব। এমন হতে পারে যে দুষ্ট স্রষ্টার কূট ইচ্ছায় সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়ার গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। সুতরাং গণিতের জ্ঞানও

১। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন যুক্তি উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁদের মতে বস্তু বা বিষয় যে জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র তা এত স্পষ্ট যে এর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

নিশ্চয়তা দাবী করতে পারে না। এরকম করে সব কিছুই সংশয় করা যায়। কিন্তু যিনি সংশয়াত্মা তাঁকে কখনই সংশয় করা যায় না। তাঁকে সংশয় করলে সংশয় করার কর্তাই যে কেউ থাকবে না। সংশয় করার কর্তা ছাড়া কি কখনও সংশয় হতে পারে? সুতরাং সংশয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সংশয়াত্মার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত আছে।

(৫) বার্কলি বলেন, যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণ পাওয়া যায় মাত্র। লকের মতে এসমস্ত গুণ একজাতীয় নয়—কতকগুলো মুখ্য আর কতকগুলো গৌণ। বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ; কারণ এগুলো ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই গুণগুলোকে ব্যক্তিনির্ভরও বলা যেতে পারে। কিন্তু বস্তুর আকৃতি, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণ লকের মতে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় না। সুতরাং এই সব মুখ্য গুণ। বার্কলি বলেন, বস্তুর, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যেমন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ নেয়, ঠিক তেমনি আকার প্রভৃতিও বিভিন্ন রূপ নেয়। সুতরাং আকার প্রভৃতি মুখ্য গুণও ব্যক্তিনির্ভর। লক গুণ ছাড়াও বস্তুতে গুণের আধার বলে এক অজ্ঞাত তত্ত্বের[১] অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই অজ্ঞাত তত্ত্বের নাম দিয়েছেন তিনি দ্রব্য। বার্কলি বলেন, অজ্ঞাত দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। যা জানি না তা আছে, এমন কথাও জানি না। সুতরাং বস্তুতে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই। এই রকম করে বার্কলি বস্তুকে ব্যক্তিনির্ভর কতগুলো ধারণার সমষ্টিতে পরিণত করলেন। প্রত্যেক বস্তুই কতগুলো গুণের সমষ্টিমাত্র, আর সব গুণই ব্যক্তির ধারণা মাত্র। সুতরাং বস্তু ব্যক্তির কতগুলো ধারণা ছাড়া আর কি হবে?

এই সব বিভিন্ন যুক্তির ওপরে ভাববাদের ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক ভাববাদের ভিৎ ভেঙ্গে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেন নি। ভাববাদের প্রকারভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তিগুলো আলোচনা করব।

ভাববাদের প্রকারভেদ:—আমরা দেখেছি, ভাববাদের মতে বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল; জ্ঞান বা চৈতন্য বা আত্মাই চরম সত্য ও সত্তা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভাববাদের মতে সত্তার স্বরূপ ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক।[২]

১। Know-not what (Substance)

২। Spiritual

বিষয় কার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল—এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাববাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বার্কলির মতে বিষয় ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ বিজ্ঞানবাদ[১] নামে পরিচিত। হেগেলের মতে বিষয় কোন ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়; এক অনন্ত জ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্য বিষয়ের নির্ভর। এই মতবাদ পরব্রহ্মবাদ[২] নামে পরিচিত। আর এক জাতের ভাববাদ হতে পারে যেখানে বিষয় কোন বিশেষ জ্ঞান-নির্ভর না হয়েও ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আর জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ্‌ এই মতবাদে বিশ্বাসী। আমরা এঁদের মতবাদই প্রথম আলোচনা করব। তারপর বিজ্ঞানবাদ ও পরব্রহ্মবাদ আলোচনা শেষে এই অধ্যায়ের উপসংহার হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা ভাল যে, ভাববাদ দুইদিক থেকে আলোচিত হ'তে পারে—জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে (From the standpoint of epistemology) এবং পরাবিজ্ঞানের দিক থেকে (From the standpoint of Metaphysics)। জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে যখন ভাববাদের কথা বলা হয় তখন ভাববাদের মূল বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল এবং এই অর্থে ভাববাদ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ, কারন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়।

পরাবিজ্ঞানের দিক থেকে যখন ভাববাদের কথা বলা হয় তখন ভাববাদের বক্তব্য এই যে, চরম সত্তা বা সত্য ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক (spiritual)। এই মতবাদ অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) নামে খ্যাত।

অনেক অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। প্লেটো তত্ত্ব বা সত্য আধ্যাত্মিক বা ভাবাত্মক একথা বললেও তত্ত্বের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করেন। এই অর্থে তিনি বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীও বটেন। প্লেটোর জাতি বা ধারণা (Universal or Idea) আধ্যাত্মিক, কিন্তু জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তাসম্পন্ন। লাইব্‌নিজ্‌ অধ্যাত্মবাদী, কিন্তু বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীও। কারণ তাঁর মতে সত্তা চিদরূপ, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননির্ভর নয়। হেগেলের মতে জ্ঞানের বিষয় অনন্ত জ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও ব্যক্তির জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তির জ্ঞানের দিক থেকে হেগেলকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী বলতে কোন বাধা নেই, যদিও আত্যন্তিক সত্তা অধ্যাত্মক, একথা হেগেল বলেন বলে নিশ্চয়ই তিনি অধ্যাত্মবাদী।

১। Subjective Idealism

২। Absolute Idealism

প্লেটোর অধ্যাত্মবাদ

প্রাচীন গ্রীস দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটোকে অধ্যাত্মবাদের আদি গুরু বলা যেতে পারে। তাঁর মতে সমস্ত ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তুই ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তু নিয়ে যে জগৎ গড়ে উঠেছে তাও অস্থির ও বিনাশী। সুতরাং এই জগৎ ও জগতের ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তু শাশ্বত নয়। যা বিশেষ নয়, ব্যক্তি নয়, সামান্য[১] বা জাতি তা ভঙ্গুরও নয়, ক্ষণস্থায়ীও নয়। কত ব্যক্তি জন্মাল আর মরল, কিন্তু মনুষ্যজাতির মরণ কখনও ঘটল না। জাতি বা সামান্যই শাশ্বত ও সনাতন। ব্যক্তির শত পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতির কোন পরিবর্তন হয় না। এই জাতি বা সামান্যই একমাত্র সত্য বস্তু। জাতি বা সামান্যকে প্লেটো কখনও কখনও আকার[২], কখনও বা ধারণা[৩] বলেছেন। ব্যক্তি যেন বস্তু[৪], আর জাতি তার আকার। যা আকার তা ধারণাও বটে। সমস্ত ধারণারই কোন না কোন বস্তু থাকে। জাতি হচ্ছে ধারণা আর ব্যক্তি হচ্ছে তার বস্তু।

ব্যক্তি নিয়ে যেমন এই ইন্দ্রিয়ের জগৎ, জাতি নিয়ে তেমনি ভাবের জগৎ[৫]। প্লেটোর মতে ভাবের জগৎ শাশ্বত ও সনাতন। সেই জগতের কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই, পরিণাম-পরিণতিও নেই। ভাবের জগৎ সত্যের জগৎ। ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিথ্যার জগৎ। প্লেটো বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের জগৎ যেন ভাবের জগতের ছায়া মাত্র। জাতি হচ্ছে কায়া আর ব্যক্তি হচ্ছে ছায়া। জাতি নিয়ে যে ভাবের জগৎ তা যেন কায়ার জগৎ। আর ব্যক্তি নিয়ে যে ইন্দ্রিয়ের জগৎ তা যেন ছায়ার জগৎ। ভাব বা ধারণাই কায়া, বস্তু ছায়া মাত্র। এই ভাব বা ধারণা প্লেটোর মতে জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়ে ভাবের জগতে বর্তমান বলে তাঁকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীও বলা হয়।

সমালোচনা :—প্লেটোর লেখা পড়লে কাব্য পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়। 'রিপাবলিক'-এর যে জায়গায় প্লেটো ছায়ার জগৎ আর কায়ার জগতের বর্ণনা দিয়েছেন সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্লেটোর চিন্তাধারা যেন মানুষকে এই ধূলিমলিন সংসার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উধাও করে নিয়ে চলে। অনুভূতি দিয়ে প্লেটোকে যখন বুঝতে চেষ্টা করি তখন সত্যিই তাঁকে অপূর্ব ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যখন তাঁর মতবাদ বিচার করি তখন নানা দোষ-ত্রুটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

১। Universal
২। Form
৩। Idea
৪। Matter
৫। Spiritual world

আমরা জানি জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি ছাড়া জাতিকে ভাবাই যায় না। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি কোন ব্যক্তিই নেই অথচ মনুষ্যজাতি আছে, এমন কখনই হতে পারে না। প্লেটো কিন্তু জাতি ও ব্যক্তির এই নিবিড় সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। প্লেটোর মতে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির দুস্তর ব্যবধান। জাতি যেন আকাশের ভাবের জগতের অধিবাসী, আর ব্যক্তি এই মলিন মাটির লোক। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন।[১]

দ্বিতীয়তঃ, জাতি ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে কি করে ভাবের জগতে থাকে, তা বোঝা যায় না। ব্যক্তি ছাড়া কোন জাতিই থাকতে পারে না। এমনিতে জাতি অমূর্ত। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যেই জাতি মূর্তি গ্রহণ করে। প্লেটোর ধারণা জাতি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে ব্যক্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে ভাবের জগতে থাকতে পারে। কথাটা সত্যি নয়।

তৃতীয়তঃ, ভাবের জগতের অধিবাসী 'জাতি'দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্লেটো পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি। কোথাও কোথাও তিনি 'শিব'[২]-এর ধারণাকে সকলের ওপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ধারণার মধ্যে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি. এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অতৃপ্তই থেকে গেছে।

লাইব্‌নিজের অধ্যাত্মবাদ

জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজের বুদ্ধিবাদ কিছু আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। এখন সত্তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আমরা আলোচনা করব। লাইব্‌নিজের মতে চরমতত্ত্ব অবিভাজ্য ও অস্তিত্ব-সম্পন্ন হবে। যা বিভাজ্য তা ভঙ্গুর। আর যা ভঙ্গুর তা কখনই সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং চরমতত্ত্ব বা সত্য অবিভাজ্য হ'বে। যার অস্তিত্ব নেই তার পূর্ণতা নেই, কারণ অস্তিত্ব পূর্ণতার অঙ্গ-বিশেষ। চরমতত্ত্ব কখনই অপূর্ণ হ'তে পারে না, সুতরাং চরমতত্ত্ব অস্তিত্ববান হবে।

১। বর্তমান লেখকের 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—প্লেটো-অ্যারিস্টটল' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থের ৭৫-৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। Good

এখন প্রশ্ন হল—অবিভাজ্য অথচ অস্তিত্ববান এমন তত্ত্ব কি আছে? লাইব্‌নিজ্‌ গ্রীসের পরমাণুবাদী[১] ও আধুনিককালের কার্টেজিয় দার্শনিকদের মতবাদ সমন্বিত করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। গ্রীসের পরমাণুবাদীদের মতে বস্তুর পরমাণুই আদিম তত্ত্ব। বস্তুকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যে সূক্ষ্মতম অংশ পাওয়া যায় ও যাকে আর ভাঙ্গা যায় না তারই নাম পরমাণু। লাইব্‌নিজ্‌ মনে করেন, পরমাণু জড়াত্মক[২] বলে তা কখনও অবিভাজ্য হ'তে পারে না। যা-ই জড়াত্মক তারই বিস্তৃতি আছে, কারণ বিস্তৃতিই জড়ের লক্ষণ। পরমাণু জড় বলে নিশ্চয়ই তা বিস্তৃতিসম্পন্ন হ'বে। আর যা-ই বিস্তৃতিসম্পন্ন তাই বিভাজ্য। সুতরাং জড়াত্মক পরমাণু কখনই চরমতত্ত্ব হ'তে পারে না।

কার্টেজিয় মতবাদে গাণিতিক বিন্দুকে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব বলা হয়েছে। এই বিন্দু নিঃসন্দেহে অবিভাজ্য। গণিতে বিন্দু বলতে এমন জিনিস বোঝায় যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিছুই নেই। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নেই তার বিস্তৃতিও নেই। আর যার বিস্তৃতি নেই তা বিভাজ্য নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই—গাণিতিক বিন্দু একান্তভাবেই অমূর্ত বস্তু। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিছুই নেই—এমন বস্তু জগতে থাকতে পারে না। সুতরাং গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য হ'লেও অস্তিত্বসম্পন্ন নয়। যা অস্তিত্বসম্পন্ন নয় তা কখনও চরমতত্ত্ব হ'তে পারে না।

গ্রীসের পরমাণুবাদ আর কার্টেজিয় মতবাদ আলোচনা ক'রে লাইব্‌নিজ্‌ এমন পরমাণুর সন্ধান করতে লাগলেন যা জড়পরমাণুর মত অস্তিত্বসম্পন্ন হবে ও কার্টেজিয় বিন্দুর মত অবিভাজ্য হবে। লাইব্‌নিজ্‌ ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত করলেন যে, পরমাণু যদি চেতন ও অধ্যাত্মক[৩] হয় তবেই তা একাধারে অবিভাজ্য ও অস্তিত্বসম্পন্ন হবে। সুতরাং লাইব্‌নিজের শেষ কথা দাঁড়াল এই যে—চেতন ও অধ্যাত্মক পরমাণুই[৪] চরমতত্ত্ব।

চঞ্চলতা, গতি ও অস্থিরতাই বিশ্বের প্রকৃতি। অবিরাম চলাই জগতের নিয়ম। সুতরাং বিশ্বের চরমতত্ত্ব গতিহীন বা অচঞ্চল হ'তে পারে না। লাইব্‌নিজ্‌ বললেন—চেতন পরমাণু স্বভাবতঃই গতিশীল। কিন্তু সমস্ত চেতন পরমাণুই সমানভাবে গতিশীল নয়। যে সমস্ত চেতন পরমাণুর গতিশীলতা বা সক্রিয়তা অন্য সমস্ত পরমাণু থেকে কম তারাই জড় বলে প্রতিভাত হয়। আসলে জড় চেতনই বটে, এখানে চৈতন্য অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন মাত্র। চরমতত্ত্ব যদি

১। Greek atomists
২। Material
৩। Spiritual
৪। Monad

এক হয় তবে কোন গতি থাকতে পারে না। একাধিক চরমতত্ত্বের অস্তিত্বই জাগতিক চঞ্চলতা ও অস্থিরতা ব্যাখ্যা করতে পারে। সুতরাং লাইব্‌নিজ্‌ বহু চেতন পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েছেন। তাঁর এই মতবাদ বহুতত্ত্ববাদী অধ্যাত্মবাদ[১] নামে পরিচিত।

লাইব্‌নিজ্‌ প্রত্যেক চেতন পরমাণুকেই অন্যনিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর বলে মনে করেন। কোন পরমাণুই অন্য পরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই অবস্থায় জগতের সুসমঞ্জস রচনা পারিপাট্যের ব্যাখ্যা হবে কি করে? অন্যনিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর চেতন পরমাণুগুলো এমন সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত আছে কেন? পারস্পরিক প্রভাবের অভাবে এদের উচ্ছৃঙ্খলতাই ত' স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে লাইব্‌নিজ্‌ এক পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার[২] উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সৃষ্টির সময়েই বিভিন্ন চেতন পরমাণুগুলোর মধ্যে এক শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'য়ে গেছে, আর ঈশ্বর এই শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন পরমাণুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমাণু[৩]। অন্য সমস্ত পরমাণু ঈশ্বর থেকেই এসেছে।

সমালোচনা :—লাইব্‌নিজ্‌ বহু চেতন পরমাণুর পরমত্বের বিশ্বাস নিয়ে দার্শনিক চিন্তা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে একাধিক স্বাধীন পরমাণুর পারস্পরিক শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করা যায় না তখন চরমতত্ত্ব হিসেবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হলেন। নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস লাইব্‌নিজের দার্শনিক জীবনের চরম পরাজয় সূচনা করে।

লাইব্‌নিজ্‌ শেষের দিকে সমস্ত চেতন পরমাণু ঈশ্বরের শৃঙ্খলা মেনে চলে, একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত চেতন পরমাণুই যদি পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে নিতে বাধ্য হয় তবে চেতন পরমাণুকে আর স্বনির্ভর বলা যায় না। লাইব্‌নিজ প্রথম জীবনে চেতন পরমাণুকে স্বনির্ভরই বলেছিলেন। এই দিক থেকে লাইব্‌নিজের প্রথম দিকের সঙ্গে শেষ দিকের চিন্তাধারার একটা বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

সর্বশেষে লাইব্‌নিজ্‌ চেতন পরমাণুদের মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপক হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হয়েছেন। লাইব্‌নিজের মতে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ চেতন পরমাণু। তিনি আরও মনে করেন যে, এক চেতন পরমাণু অন্য চেতন পরমাণুর উপর

১। Pluralistic Spiritualism
২। Pre-established Harmony
৩। Monad of monads

প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাহ'লে ঈশ্বর নিজে এক চেতন পরমাণু হ'য়ে কি করে অন্য চেতন পরমাণুদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন, তা বোঝা যায় না।

বিজ্ঞানবাদ ঃ বার্কলি

বিজ্ঞানবাদ ভাববাদের এক বিশেষ রূপ। বিজ্ঞানবাদ-মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় মন ও তার ধারণাই একমাত্র সত্য। ব্রিটিশ দার্শনিক বার্কলির নামের সঙ্গেই এই মতবাদ বিশেষ ভাবে জড়িত। বার্কলির বিজ্ঞানবাদ বুঝতে হ'লে দার্শনিক জন লকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। বার্কলির বিজ্ঞানবাদ লকের চিন্তাধারার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে।

জন লক প্রতীকবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, বস্তু কখনই সোজাসুজি জানা যায় না। বস্তু জানতে গেলেই ইন্দ্রিয়পথে তার ছাপ বা প্রতীক এসে মনে দাগ কাটে। এই ছাপ বা প্রতীকই আমরা সোজাসুজি জানি। লক ছাপ বা প্রতীকের নাম দিয়েছেন 'ধারণা'। যখন আমরা কোন ধারণা জানি তখন এর পেছনে যে একটা বস্তু আছে তাও জানি।

বার্কলি বলেন, আমরা যা সোজাসুজি জানি তা যদি সর্বদাই কোন না কোন প্রতীক বা ধারণা হয়, তবে প্রতীক বা ধারণাই একমাত্র আছে, একথা মানতে হবে। যে বস্তু আমরা কখনই সোজাসুজি জানি না তা আছে এমন কথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং বস্তু বলে কিছু নেই, যা আছে সবই মনের ধারণামাত্র। মন ছাড়া ত' আর মনের ধারণা থাকতে পারে না। কাজেই মন ও তার ধারণাই কেবলমাত্র আছে—একথা বলতে হবে। এভাবে লকের প্রতীকবাদ থেকে বার্কলি বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোলেন।

জন লকের জ্ঞান-তত্ত্ব (Epistemology) আলোচনা ক'রে কিভাবে বিজ্ঞানবাদে আসা যায় তার পরিচয় দেওয়া হ'ল। লকের বস্তুতত্ত্ব (Metaphysics) আলোচনা ক'রেও একই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বার্কলি সে-পথও অনুসরণ করেছেন।

জন লক মনে করেন, যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণ আর গুণের একটা আধার পাওয়া যায়। গুণ ও তার আধার ছাড়া বস্তু বলতে আর

কিছু নেই। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। আমরা যদি 'কমলালেবু'কে বিশ্লেষণ করি, তবে রঙ্, রস, গন্ধ, আকার, ঘনত্ব প্রভৃতি কতগুলো গুণ পাব। এই গুণগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। এরা যদি কোন একটা বিশেষ আধারে না থাকে তবে কখনই একত্র সন্নিবিষ্ট হ'তে পারে না। সুতরাং গুণের একটা আধার ভাবতে হয়। গুণ যেমন দেখা যায় এই আধার তেমন দেখা যায় না। জন লকের মতে এই আধারের নাম দ্রব্য[১]। দ্রব্য আর গুণ মিলেই বস্তু।

লক মনে করেন, সমস্ত গুণই একজাতের নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিভেদে প্রায়ই ভিন্ন হয়। সুস্থ চোখে যা 'সবুজ', অসুস্থ চোখে তাই 'নীল' বলে মনে হয়। বর্ণান্ধদের বেলায় ত প্রায়ই এমন হয়ে থাকে। বর্ণের মতই রস, গন্ধ প্রভৃতিও বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম বলে মনে হয়। লক বলেন, যদি এসব গুণ বস্তুতেই থাকত তবে সব মানুষই এদের একরকম দেখত। যেহেতু এই গুণগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, সেজন্য এদের বস্তুগত বলা যায় না। এরা ব্যক্তিগতই বটে। লক এদের নাম দিয়েছেন 'গৌন গুণ'[২]।

আর একজাতেরও গুণ আছে। আকৃতি, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত। এই গুণগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন রকমের হয় না। যে বস্তু গোলাকার তা সকলের কাছেই গোলাকার। সুতরাং এগুলোকে বস্তুগতই বলতে হবে। লক এদের নাম দিয়েছেন 'মুখ্য গুণ'[৩]।

বার্কলি বলেন, বস্তু বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণই পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় গুণের আধার বলে কিছুই পাই না। আর যা অভিজ্ঞতায় পাই না তা মানারও কোন যুক্তি নেই। বস্তুতে যে গুণগুলো জানি তা সবই একজাতের। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন বলে যদি ব্যক্তি-মন-নির্ভর হয়, তবে আকৃতি, আয়তন প্রভৃতিও ব্যক্তি-মন-নির্ভর হবে; কারণ, বস্তুর আকৃতি, আয়তন প্রভৃতিও সকলের কাছে একরকম নয়। দূরের লোক যা ক্ষুদ্রাকৃতি বলে মনে করে কাছের লোক তা-ই বৃহদাকারে পায়। সুতরাং বস্তু বলতে কতগুলো গুণ বোঝায় আর এই সব গুণই মনের ধারণামাত্র। তা ছাড়া বার্কলি 'এসে টুয়ার্ডস

১। Substance

২। Secondary Qualities

৩। Primary Qualities

এ নিউ থিওরি অব ভিশন'-এ বলেছেন, বস্তুর দূরত্ব, আয়তন এবং অবস্থান ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ। এই সাপেক্ষতা যদি মন-নির্ভরতার হেতু হয় (যেমন তথাকথিত গৌণগুণের বেলায় লকের দর্শনে হয়েছে) তবে দূরত্ব, আয়তন এবং অবস্থানকে মন-নির্ভর না বলার কোন যুক্তি নেই। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান লেখকের 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—লক, বার্কলি, হিউম' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ—প্রকাশিত) গ্রন্থের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। এখানে এ বিষয়ের আর বিস্তার সম্ভব নয়। এই আলোচনা থেকে বার্কলি সিদ্ধান্ত করলেন, আমরা যা কিছু জানি সবই মনের ধারণামাত্র।

অন্য দিক থেকেও একই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যে কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব ব্যক্তির জ্ঞান-সাপেক্ষ। যে শব্দ কেউ শোনে নি, যে বর্ণ কেউ দেখে নি, তা অস্তিত্বহীনই বটে। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তার প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা।[১]

সমালোচনা :—বার্কলি বলেছেন, প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা। এই মত সত্য হ'লে বস্তুর স্থায়িত্ব[২] ব্যাখ্যা করা যায় না। রান্নাঘরে উনুনে জল চাপিয়ে বাইরে গেলে ফিরে এসে দেখি—জল ফুটছে। বার্কলির কথা যদি সত্য হয় তবে রান্নাঘর, উনুন, জল এসব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ আমরা তাদের প্রত্যক্ষ করব। তা হ'লে ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই উনুন, জল প্রভৃতি ছিল না। কিন্তু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল ফুটল কি করে? উনুন, জল প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও থাকে, একথা মানতেই হ'বে।

বার্কলি মুশকিলে পড়লেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে বলতে হ'ল—আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি না তখনও যে বস্তু থাকে তার কারণ তখন তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং তিনি সব সময়েই সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। জাগতিক বস্তু তাঁরই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। যে বিজ্ঞানবাদ নিয়ে বার্কলি দার্শনিক যাত্রা শুরু করেছিলেন এভাবে তা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হ'ল। বস্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ব'লে আর বিজ্ঞানবাদ থাকে না। অশরণের শরণ ঈশ্বর বার্কলিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু বার্কলির নিজের মতবাদ বিজ্ঞানবাদ উদ্ধার পেল না। আসলে বিজ্ঞানবাদ কখনও বস্তুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না।

১। Esse est percipi

২। Continuity

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে অনেকেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুরের ছোট্ট প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন'[১] সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দর্শনে বিরাট বিপ্লব ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞানবাদকে এরকম স্পষ্ট ও তীব্র, এরকম নির্মম ও নির্ভীকভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা বিরল।

বিজ্ঞানবাদের মতে বস্তু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। মুর দেখাতে চান, এই সিদ্ধান্ত এক ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'জ্ঞান'কে বিশ্লেষণ করতে হ'লে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এই দুটো ভাগ স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞানবাদীরা এই সহজ তফাৎটা ধরতে পারেন না। 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান ও 'লাল রঙ্'-এর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই পার্থক্য জ্ঞানের জন্য নয়; কারণ জ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমান। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে যে এদের পার্থক্য জ্ঞানের বিষয়ের জন্য। বিষয়ের বিভিন্নতার জন্যই জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়। বিষয় যখন 'লাল রঙ্' তখন 'লাল রঙ্'-এর জ্ঞান হয়, আর বিষয় যখন 'নীল রঙ্' তখন 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান জন্মে। সুতরাং 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান ও 'নীল রঙ্'-এর মধ্যে প্রভেদ আছে। 'নীল রঙ্'-এর জন্যই 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান হয়। বিজ্ঞানবাদীরা একথা বুঝতে পারেননি। মুর আধুনিক কালের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের গুরু। তাঁর 'ভাববাদ খণ্ডন'কে ভিত্তি করেই নূতন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে। মুর এই নিবন্ধে বার্কলি প্রচারিত 'অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষ' (Esse est percipi) এই বচন নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কোন ভাবেই এই বচনের অর্থ নির্ণয় করা যায় না। আমরা তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সামান্য একটু অংশ এখানে উপস্থিত করছি। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণ আলোচনাটি মুর-বিরচিত 'Philosophical studies' গ্রন্থ থেকে পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

মুর বলেছেন, প্রত্যক্ষ বলতে আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বুঝি, কিন্তু, ভাববাদীরা 'প্রত্যক্ষ' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করেন এবং 'চিন্তন' (thinking) ও 'প্রত্যক্ষ' শব্দের দ্বারা বোঝান। এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই যে, 'সিরিস' গ্রন্থে বার্কলির কতগুলো মন্তব্য থেকে মনে হয়, তিনিও জীবনের শেষ দিকে 'অস্তিত্ব হয় চিন্তন' (Esse est concipi) এই মত গ্রহণ করেছিলেন।

'অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষ' এই বচনে 'হয়' এই সংযোজক অন্ততঃ তিন রকম অর্থ প্রকাশ করতে পারে। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পূর্ণ অভিন্নতা, দ্বিতীয়তঃ

১। Refutation of Idealism, প্রখ্যাত 'Mind' পত্রিকায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের আংশিক অভিন্নতা এবং তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্যের উপস্থিতি থেকে বিধেয়ের উপস্থিতির অনুমান-সম্ভাবনা।

সংযোজকের প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে 'অস্তিত্ব' এবং 'প্রত্যক্ষ' শব্দ দু'টির অর্থ অভিন্ন হ'বে, অর্থাৎ, অস্তিত্ব ও প্রত্যক্ষ—একটি আর একটির প্রতিশব্দ হ'বে। কিন্তু, এরা প্রতিশব্দ নয়। সুতরাং এই অর্থে সংযোজক গ্রহণ করা যায় না।

সংযোজকের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে বচনটি 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের অর্থের অংশ মাত্র বোঝায়', একথা বোঝাবে; যেমন 'সমস্ত মানুষ হয় প্রাণী'—এই বচনে প্রাণীত্ব মানুষের দ্যোতনার (connotation) অংশ মাত্র বোঝায়। কিন্তু, এইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ থেকে অস্তিত্ব অনুমান করা যাবে না যেমন কোন কিছুতে প্রাণীত্ব থাকলেই তা থেকে মনুষ্যত্ব অনুমান করা যায় না। এই ক্ষেত্রে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাতিরিক্তও কিছু বোঝাবে। বলা বাহুল্য, এই কথা বার্কলির মত ভাববাদীরা গ্রহণ করতে রাজী হবেন না।

সংযোজকের তৃতীয় অর্থই শুধু অবশিষ্ট থাকছে। এই অর্থে যদিও অস্তিত্ব বলতেই প্রত্যক্ষ বোঝায় না, বোঝায় ধরা যাক্ 'ক', তথাপি 'ক'এর সঙ্গে প্রত্যক্ষের এমন একটা অবিনাভাব সম্বন্ধ (inseparable relation) আছে যে, 'ক' কখনই প্রত্যক্ষ ছাড়া থাকতে পারে না (যেমন ধূম অগ্নি ছাড়া থাকতে পারে না)। এই অর্থ ভাববাদীদের বক্তব্য 'যেখানে যেখানে অস্তিত্ব আছে সেখানে সেখানে প্রত্যক্ষ আছে' সমর্থন করে।

কিন্তু, মূর বলেন, এই অর্থও গ্রহণযোগ্য নয়। এই অর্থ গ্রহণ করলে আলোচ্য বচনটি সংশ্লেষক এবং অনিবার্য বা নিশ্চিত (Synthetic and necessary) হ'বে; কারণ, এই বচন 'অস্তিত্ব' এবং 'প্রত্যক্ষ' এই দু'টি পদের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্বন্ধ প্রকাশ করে এবং দু'টি পদ সমার্থক নয়।

মূর আরও বলেন, এই বচন অনিবার্যভাবে সত্য এবং অখণ্ডনীয় হ'তে পারে তবেই যদি তা স্বতঃসিদ্ধ হয়। কিন্তু, যদি এই বচন স্বতঃসিদ্ধ হ'ত তবে এই বচন স্থাপনের জন্য কোন যুক্তি উত্থাপনের প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু ভাববাদীরা এই বচনের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, এই বচনটির স্বতঃসিদ্ধতা সম্বন্ধে ভাববাদীদেরই সংশয় আছে।

'অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষ' এই বচনের সমর্থনে কখনও কখনও যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, 'জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান ছাড়া অচিন্তনীয়।' এই বচন তা হলে অনিবার্য বলে মনে করা হচ্ছে এই কারণে যে, এর বিপরীত অচিন্তনীয়। কিন্তু, যে

বচনের বিপরীত বচন চিন্তা করা যায় না সে বচনকে বিশ্লেষক (Analytic) বলা হয়। কিন্তু, পূর্বেই 'অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষ' এই বচনটিকে সংশ্লেষক রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। সুতরাং ভাববাদীদের বক্তব্যের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তাঁদের মতে একই বচন (অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষ) একই সঙ্গে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক হ'তে পারে। সুতরাং তৃতীয় অর্থও গ্রহণ করা যায় না।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাব্লু. টি. স্টেস 'মাইণ্ড' পত্রিকায় 'রেফুটেশন অব রিয়েলিজম' (বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ খণ্ডন) নামক প্রবন্ধে ভাববাদীদের পক্ষ থেকে মুরের এই সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা তা পাঠ করলে এই প্রসঙ্গে ভাববাদীদের বক্তব্য জানতে পারবেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পেরী 'আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা' (Ego-centric Predicament) শিরোনামায় জার্ন্যাল অফ ফিলসফি, সাইকোলোজি অ্যাণ্ড সাইন্টিফিক মেথড্স-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি ভাববাদ-খণ্ডনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পেরী এই প্রবন্ধে বলেছেন, আত্মাকে কেন্দ্রে না রেখে বিষয়ের জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। অর্থাৎ, কোন না কোন আত্মা না থাকলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না। এই অবস্থাকেই 'আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পেরী বলেন, এই সঙ্কটাবস্থাকে ভিত্তি করে বার্কলীর মত ভাববাদীরা এমন অনুমান করেছেন যা ভ্রান্ত। পারিভাষিকভাবে একেই আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা-ভিত্তিক ভ্রান্তানুমান (The fallacy of argument from the ego-centric predicament) বলা হয়। অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব-প্রমাণের অসম্ভাবনাকে ভাববাদীরা অজ্ঞাত বস্তুর নাস্তিত্বের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন। পেরী ভাববাদীদের এই অনুমানেরই নাম দিয়েছেন আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা-ভিত্তিক অনুমান এবং তাঁর মতে এই অনুমান ভ্রান্ত। অনুমানটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির দ্বারা অসমর্থিত অন্বয়ী পদ্ধতিভিত্তিক বলে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে। যে সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বশীল বলা যায় তা সবই আত্মার দ্বারা জ্ঞাত বলে প্রত্যক্ষ করা যায় (অন্বয়ী পদ্ধতি—Method of agreement)। কিন্তু, যদি না বলা যায় যে, আত্মার অজ্ঞাত কতগুলো বস্তুর নাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় (ব্যতিরেকী পদ্ধতি—Method of difference), তবে অজ্ঞাত বস্তুর নাস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় না। এইরূপ বলা যায় না বলে ভাববাদীদের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হতে পারে না।

আরোহানুমান (Inductive argument) না করে অবরোহানুমানও (Deductive argument) করা যায়। সেই ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা হবে উপাত্ত এবং ভাববাদীরা এই অবস্থাকে একটি স্বতঃপ্রমাণ বিশ্লেষণাত্মক বচন (self-evident analytic proposition) রূপে প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে তাঁদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করবেন। তাঁদের অবরোহানুমানটি নিম্নরূপ হবে—

কোন কিছুই জ্ঞানের বিষয় না হ'লে অস্তিত্ববান বলে জ্ঞাত হয় না
(আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কটাবস্থা)

∴ কোন কিছুই জ্ঞানের বিষয় না হ'লে অস্তিত্ববান হয় না
(ভাববাদী সিদ্ধান্ত)

উপাত্তটি গ্রহণ করতে আপত্তি করার কারণ নেই, কিন্তু, উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় না। কারণ, সিদ্ধান্তে উপাত্তের বিধেয়াংশের 'বলে জ্ঞাত' অংশটি অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভাববাদীদের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগও উত্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি পিতা, তিনি আবার পুত্র, ভ্রাতা, প্রভু প্রভৃতিও হ'তে পারেন। কিন্তু, কেউ যদি মনে করেন যে, সে ব্যক্তি পিতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না তবে যে ভ্রান্তির উদ্ভব হয় তার নাম একান্ত বিশেষের ভ্রান্তি (The fallacy of exclusive particularity)। ভাববাদীরা যখন বলেন, যেহেতু সমস্ত জ্ঞাত বস্তুই জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং তারা একান্ত ভাবেই মনের সামগ্রী এবং মনের ওপর নির্ভর না করে থাকতে পারে না, তখন তাঁরা এই ভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। তাঁরা ভুলে যান যে, বিষয় জ্ঞানের বিষয় ছাড়াও বহির্জগতে অবস্থিত হ'তে পারে।

এই ভ্রান্তি থেকেই আর একটি ভ্রান্তির উদ্ভব হ'তে পারে। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীরা তার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক পরিচয়ের ভিত্তিতে লক্ষণ-নির্ণয়ের ভ্রান্তি (The fallacy of definition by initial predication)। কোন একটি জিনিসের পরিচয় প্রথম যে ভাবে লাভ করা যায় তার থেকে একান্ত বিশেষের ভ্রান্তির মাধ্যমে যদি তাকেই তার একমাত্র পরিচয় বলে মনে করা হয় তবে এই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়ে থাকে। একটি শিশু যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার পিতা বলে জানে তখন সে এইরকম বয়স্ক সমস্ত ব্যক্তিদেরই কারও নাম কারও পিতা বলে মনে করে এবং প্রশ্ন করে—'এ কার বাবা?' এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিচয়ের ভিত্তিতে লক্ষণ-নির্ণয়ের ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় জ্ঞানের বিষয়

বলে হওয়ার জন্য যখন ভাববাদীরা মানে করেন যে বস্তুর লক্ষণ জ্ঞানের বিষয় ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না তখন তাঁরা এই ভ্রান্তিতে পড়েন।

ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার মুরের সুরেই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখনই যে বস্তু জানি তখনই তা জ্ঞাত বস্তু হিসেবেই জানি। এর থেকে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, জ্ঞাত না হয়ে কোন বস্তুই থাকতে পারে না। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, বিজ্ঞানবাদীদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বস্তুর 'জ্ঞাততা' ধর্ম জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বয়ং বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়।

বিজ্ঞানবাদ থেকে এক জাতীয় বিশ্রী আত্মকেন্দ্রিকতা (Solipsism) আত্মপ্রকাশ করে। বার্কলি বলেছেন, প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা। তাই যদি সত্যি হয়, তবে আমি আর আমার ধারণাই ত শুধু আছে। এই জাতীয় ভাবনা চরম আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক। যে কোন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোকই আত্মকেন্দ্রিকতা সমর্থন করতে পারেন না।

আভিনেরিয়াস বলেছেন, বিজ্ঞানবাদ এক অদ্ভুত প্রক্ষেপ[১] প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, তখন অনেক লোকই একসঙ্গে সেই চাঁদ দেখে। বিজ্ঞানবাদী বলবেন, চাঁদ কোন এক ব্যক্তির মনের ধারণামাত্র। তাই যদি হয়, তবে এতগুলো লোক একসঙ্গে চাঁদ দেখবে কি করে? একজনের মনের ধারণা ত আর সবাই দেখতে পারে না এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিমনের ধারণা অন্য মনে প্রক্ষিপ্ত হয়, একথাই ভাবতে হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা একান্তভাবেই অবিশ্বাস্য।

এমনি করে বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই উত্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু তা আর করে লাভ কি। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি, বিজ্ঞানবাদ আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ নয়। সুতরাং এবার ভাববাদের অন্য আর এক রূপের আলোচনা করা যাক্।

কাণ্টের ভাববাদ

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লব এনেছে। এই বিপ্লবের নাম দেওয়া হয়েছে কোপারনিকান বিপ্লব। জ্যোতির্বিদ্যায় কোপারনিকাসের আগে টলেমির

১। Projection

প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। তিনি মনে করতেন পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারিদিকে ঘোরে। কোপারনিকাস এই ধারণার মূলে আঘাত করলেন। তিনি বললেন—পৃথিবীই ঘুরছে, সূর্য একান্ত ভাবেই স্থির। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই নূতন চিন্তাধারাকে কোপারনিকান বিপ্লব নাম দেওয়া হয়েছে। কাণ্টের দাবী—তিনিও দর্শনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিপ্লব এনেছেন। কাণ্টের আগে দার্শনিকদের ধারণা ছিল জ্ঞান বস্তুর ওপরেই নির্ভর করে; বস্তু আছে বলেই জ্ঞান হয়। কাণ্ট এসে বললেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপরেই নির্ভর করে।

কাণ্টের সিদ্ধান্ত ভাববাদের জোর বৃদ্ধি করেছে। ভাববাদীদের মতে বিষয় জ্ঞান-নির্ভর। পরবর্তী কালে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের পরব্রহ্ম-বাদ[১] কাণ্টের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। হেগেলের পরব্রহ্মবাদ ও তার পরিণতি খণ্ডন করা শক্ত। ভাববাদের এই চরম পরিণতির জন্য শেষ পর্যন্ত কাণ্টই দায়ী। অনেক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক সেজন্য কাণ্টের ওপর বিরক্ত। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ত' কাণ্টকে আধুনিক দর্শনের 'দুর্ভাগ্য'[২] বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের ধারণা, গালাগাল দিয়ে কোন মতবাদ খণ্ডন করা যায় না। যুক্তির বিরুদ্ধে উষ্মার কোন স্থান নেই, পাল্টা যুক্তিরই আছে। কাণ্টের দার্শনিক চিন্তাধারায় হয়ত অনেক দোষই আছে। কিন্তু, সমস্ত জ্ঞান-ব্যাপার বিশ্লেষণ করতে কাণ্ট যে বুদ্ধি, ধৈর্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সমস্ত দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা শক্ত। সমস্ত দেশের সমস্ত কালের দার্শনিকদের মধ্যে কাণ্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

কাণ্টের মতে প্রত্যেক জিনিসের যেমন আকার ও বস্তু থাকে, জ্ঞানেরও তেমনি আকার ও বস্তু আছে। এই দুটো ছাড়া কোন জ্ঞানই হ'তে পারে না। বুদ্ধি[৩] জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে, আর বস্তু সংবেদন[৪] থেকেই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব থেকে সংবেদনের সম্মুখে যা প্রদত্ত হয় তার নাম অনুভব[৫]। অনুভব দেশ ও কালের মধ্যেই উপস্থাপিত হ'তে পারে। দেশ ও কাল অনুভবের দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার[৬]। এরা পূর্বতঃসিদ্ধ এজন্যে যে এদের ছাড়া কোন অনুভবই সম্ভব নয়। কাণ্ট দেশ ও কালে লব্ধ অনুভবের নাম দিয়েছেন

১। The Absolute Idealism of Hegel
২। Misfortune
৩। Understanding
৪। Sensibility
৫। Intuition
৬। A priori forms of Intuition

আভাস[১]। এই আভাস জ্ঞান নয়। আভাস যখন দ্রব্য, কার্য, কারণ প্রভৃতি বুদ্ধির বিভিন্ন আকারে আকারিত হয় তখনই জ্ঞান পাওয়া যায়। কাণ্টের মতে বুদ্ধির আকারে[২] আকারিত আভাসের নাম অবভাস[৩]। অবভাসই জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের দ্বারাই গঠিত হয়।[৪]

জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের দ্বারা গঠিত হ'লেও কাণ্ট জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুস্বরূপের[৫] অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সংবেদন নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুভব লাভ করে। সুতরাং সংবেদন অনুভবের স্রষ্টা হ'তে পারে না। অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। কাণ্টের মতে যা জানা যায় তা অবভাস মাত্র। অবভাস জ্ঞানের দ্বারাই গঠিত। বস্তু-স্বরূপ কখনই জানা যায় না, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে—কাণ্টের ভাববাদ একটু নূতন ধরণের। তাঁর মতে বস্তু-স্বরূপ জ্ঞাননির্ভর নয়। সুতরাং বস্তু-স্বরূপের দিক থেকে তিনি ভাববাদী নন। কিন্তু, কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের দ্বারা গঠিত। এই দিক থেকে কাণ্ট ভাববাদের সমর্থক। কাণ্টের মতে অবভাস জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে আবভাসিক ভাববাদী[৬] বলেন আর তাঁর মতবাদের নাম দেন 'আবভাসিক ভাববাদ'[৭]।

বস্তু-স্বরূপ জানা না গেলেও কাণ্ট তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কাণ্টের চিন্তাধারায় এ একটা দুর্বলতা বিশেষ। যা জানি না তা আছে, এমন কথা বলা যায় না। পরবর্তী কালের ভাববাদী দার্শনিকেরা এজন্য কাণ্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। ফিক্‌টে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতি সকলেই কাণ্টের এই দুর্বলতার প্রতি ক্ষমাহীন কটাক্ষ করেছেন। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ আলোচনা করব।

১। Appearance
২। Categories of understanding
৩। Phenomenon
৪। এই প্রসঙ্গে 'Understanding makes Nature' কাণ্টের এই কথা স্মরণীয়।
৫। Thing-in-itself
৬। Phenomenalistic Idealist
৭। Phenomenalistic Idealism

ফিক্‌টে ও শেলিং-এর মধ্য দিয়ে কাণ্টের চিন্তাধারার হেগেলীয় পরব্রহ্মবাদে পরিণতি

আমরা দেখেছি, বস্তু-স্বরূপ জানা না গেলেও কাণ্ট বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি ও সংবেদনের সমন্বয়েই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সংবেদন নিষ্ক্রিয়ভাবে বহির্বিশ্ব থেকে অনুভব লাভ করে। বুদ্ধি তাতে সক্রিয় ভাবে নিজ আকার লাগিয়ে দেয়। সংবেদন যখন নিষ্ক্রিয় ভাবে অনুভব লাভ করে তখন সংবেদন কখনই অনুভবের স্রষ্টা হ'তে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন ওঠে অনুভব এল কি ক'রে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনুভবের উৎস হিসেবে কাণ্ট বস্তু-স্বরূপ মানতে বাধ্য হয়েছেন। কাণ্ট কিন্তু একথাও বলেন যে, বস্তু-স্বরূপ জানা যায় না।

বস্তু-স্বরূপ জানা যায় না অথচ আছে—একথা কাণ্টের পরবর্তী দার্শনিকদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। এ সমস্যার দুটো সমাধান হতে পারে: হয় বস্তু-স্বরূপ কোন না কোন ভাবে জানা যায়—একথা প্রমাণ করা, অথবা বস্তুস্বরূপ বলে কিছু নেই একথা মেনে নেওয়া।

জেকবি প্রথম বিকল্প বেছে নিয়েছেন। তাঁর মতে অপরোক্ষ অনুভূতিতে[১] বস্তু-স্বরূপ জানা যায়। কাণ্টের মতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হতে গেলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব পাওয়া দরকার। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কোন অনুভব হয় না। কাজেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে না। জেকবি মনে করেন, অপরোক্ষ অনুভূতিতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হয়। কাণ্টের সমর্থকেরা জেকবির এই ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে অপরোক্ষানুভূতি জ্ঞান নয়, অনুভূতি মাত্র। অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। দর্শনে এই ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন স্থান নেই। সুতরাং তাঁরা দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে কাণ্টের বস্তু-স্বরূপের কোন অস্তিত্বই নেই।

ফিক্‌টে অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তু-স্বরূপ মানতে রাজী নন। তাঁর মতে 'মন' বা অহংই[২] চরমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন—সংবেদন নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তিনি সংবেদনের নিষ্ক্রিয়তা কাণ্টের পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত নন। তাঁর

১। An immediate kind of feeling

২। Ego

মতে নিষ্ক্রিয়তা সক্রিয়তার স্বল্পতামাত্র। বুদ্ধি সংবেদনের চেয়ে বেশী সক্রিয়। সে জন্য বুদ্ধির সঙ্গে তুলনায় সংবেদনকে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপের জন্য আমরা অনুভব লাভ করি না। মনই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে নিজেকে বিভক্ত ক'রে থাকে। মনেরই এক অংশ থেকে অনুভবের উৎপত্তি। সুতরাং সংবেদনের নিষ্ক্রিয়তা মনের আত্ম-বিভাগের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'মন' বা 'অহং'ই চরমতত্ত্ব। নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভের জন্য 'অহং' নিজেকে বস্তুরূপে বিক্ষিপ্ত[১] করে। সুতরাং বস্তু 'অহং'-এরই বিক্ষেপ বিশেষ।

শেলিং ফিক্‌টের "সমস্ত বস্তুর 'অহং'এ পর্যবসান" তত্ত্বে বিশ্বাস ক'রেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ফিক্‌টের বিজ্ঞানবাদ থেকে শেলিং পরব্রহ্মবাদের দিকে এগিয়ে যান। তিনি মানুষের মনে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে একই মৌলিক নিয়মের খেলা দেখতে পান। সুতরাং মন ও বিশ্বপ্রকৃতি মূলতঃ অভিন্ন বলেই তাঁর ধারণা হয়। তিনি মন ও বিশ্বপ্রকৃতিকে এক পরব্রহ্মের[২] দ্বিমূর্তি বলে মনে করেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি যেন 'দৃশ্য আত্মা'[৩] আর আত্মা বা মন যেন 'অদৃশ্য প্রকৃতি' (Invisible Nature)। যে পরব্রহ্ম এই দুই তত্ত্বকেই আত্মস্থ করেন তিনি উভয়-মধ্যস্থ অবিনাতত্ত্ব বিশেষ (Principle of Identity)।

হেগেল কাণ্টের মতবাদের ওপরই তাঁর দার্শনিক চিন্তার ইমারৎ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু ফিক্‌টের মত তিনিও কাণ্টের 'বস্তু স্বরূপ'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না ; তাঁর মতেও মনই চরমতত্ত্ব। দার্শনিক চিন্তায় হেগেল ফিক্‌টেকে ছাড়িয়ে গেছেন। শেলিং-এর মত তিনিও বিশ্বাস করেন, যে মন চরমতত্ত্ব তা কোন ব্যক্তি-মন নয় ; আসলে তা এক পরম মন বা পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম ব্যক্তি-মন ও প্রকৃতি উভয়ই আত্মস্থ করে। তবে হেগেল শেলিং-এর মত পরব্রহ্মকে মন বা প্রকৃতি-মধ্যস্থিত এক অবিনাতত্ত্ব বলে মানতে রাজী নন। তিনি মনে করেন, শেলিং জগৎ ও মনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে এক অবিনাতত্ত্বের জয়গান করতে গিয়ে অস্বীকার করেছেন। হেগেলের মতে শেলিং-এর পরব্রহ্ম যেন এমন এক রাত্রি যেখানে সমস্ত গরুই কালো বলে মনে হয়। হেগেল মনে করেন,

১। Projected

২। Absolute Reality

৩। Visible Soul

জোর করে জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করা নির্মোহ মনের পরিচায়ক নয়। সুতরাং পরব্রহ্ম এক অবিনাতত্ত্ব নয়, 'পরব্রহ্ম বৈচিত্র্য-সঞ্জীবিত এক ঐক্যতত্ত্ব বিশেষ।'[১] বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রাপ্তিই এই পরব্রহ্মের লীলা। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা পরব্রহ্মকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করে।

হেগেলের পরব্রহ্মবাদ

য়ুরোপীয় দর্শনে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের পরব্রহ্মবাদে। হেগেলের মতে পরব্রহ্মই চরমতত্ত্ব। এই পরব্রহ্ম নিষ্কল ও নির্গুণ নয়। এ ব্রহ্মের মধ্যে চিদচিৎ সমস্ত কিছুরই অবিসংবাদিত স্থান আছে। বস্তুতঃ চিদচিৎ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর বিকাশ ও প্রকাশ। তিনি অসীম হওয়া সত্ত্বেও সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করাই তাঁর লীলা।

পরব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। হেগেলের এই পরব্রহ্ম জীবন্ত ও গতিশীল। তাঁর গতি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলে। পরব্রহ্মেই এই গতির শুরু আর সেখানেই এর শেষ।

দ্বান্দ্বিক গতিতে বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ[২]—এই তিন মুহূর্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাদে যা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে সম্বাদে তা এক উচ্চ ধারণায় সমন্বিত হয়। কিন্তু এই সম্বাদ লীলার সমাপ্তি নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বই লীলার প্রাণ। সম্বাদ চরম প্রশান্তিরূপে স্থায়ী না হ'য়ে আবার সে নিজের বিরোধ সৃষ্টি করে ও নূতন সম্বাদের প্রয়োজন হয়। এরকম নানা বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্ম আপনার বিচিত্র লীলা চালিয়ে যান। এই লীলায় নূতন পুরাতনকে পরিত্যাগ করে না, নিজের মধ্যেই গ্রহণ করে নেয়। নূতনের মধ্যে পুরাতনের হয় পুনর্জন্ম ও পূর্ণতর প্রকাশ। এখানে কিছুই হারায় না, সবই পূর্ণ ব্রহ্মের প্রসাদে নূতন জীবনে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। নানা বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্মের অব্যাহত লীলা চলেছে। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছে।

পরব্রহ্মের লীলায় বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ অসংখ্য। কিন্তু সাধারণভাবে পরমলীলার তিনটি বিশেষ মুহূর্তই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ শুদ্ধ

১। Absolute is the principle of Identity in Difference.

২। বাদ=Thesis, প্রতিবাদ=Anti-thesis, সম্বাদ=Synthesis

সার্বভৌমিক প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। এর নাম শুদ্ধ প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি।[১] লীলার দ্বিতীয় স্তরে প্রতিবাদরূপে সৃষ্ট হয় জড় জগৎ।[২] তৃতীয় স্তরে বাদ প্রতিবাদের সমন্বয় রূপে সৃষ্টি হয় আত্মসচেতনতায় উপলব্ধ ধর্ম, শিল্প ও দর্শন।[৩] দর্শনের মধ্য দিয়েই পরব্রহ্মের চরম পরিচয় লাভ করা যায়।

মানুষের চিন্তার মধ্যে যে একটা বিরাট বিস্তৃতি ও মহিমা আছে—আমরা তা হেগেলের চিন্তাধারায় পাই। যাঁরা হেগেলের সমালোচক তাঁরাও হেগেলের মহত্ত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। হেগেলের মতে জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একটি সম্পর্ক বিশেষ। যেহেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই চরমতত্ত্ব পরব্রহ্মের দু'টি অংশ, সুতরাং এদের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক। কাজেই হেগেলের দর্শনে জ্ঞানের সম্পর্ক—সমস্যা অতি সহজেই মিটে যায়। বিষয় বা বস্তু পরব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু তা কোন বিশেষ মনের অংশ নয় বা বিশেষ মনের ওপর নির্ভরশীলও নয়। সুতরাং কোন বিশেষ মনের কাছে বিষয় মন-বহির্ভূতই বটে। কাজেই বিজ্ঞানবাদে যে সমস্ত অসুবিধে হয়েছিল তা এখানে হতেই পারে না আর এই মতবাদের সঙ্গে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের কোন বিরোধ নেই। পরব্রহ্ম মানুষের মধ্যেও আছেন আবার তিনি মানুষের বাইরেও আছেন। সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই পরমকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করবার চেষ্টা করবে আর তার ফলে নীতি ও ধর্মের তাৎপর্য অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যাবে। মানুষের মূল্যবোধও এই মতবাদে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অসীম পরব্রহ্ম সসীম মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্রহ্ম সত্য, শিব ও সুন্দরের পরিপূর্ণ পরিপূর্তির জাগ্রত প্রকাশ। সুতরাং সসীম মানুষের মধ্যে এই মূল্যের প্রকাশ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হবে। এই সমস্ত নানা দিক থেকে বিবেচনা ক'রেই ভাববাদের যতগুলো রূপ আমরা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে হেগেলের পরব্রহ্মবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।

হেগেলের পরবর্তীকালে হেগেলপন্থীরা দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণপন্থীরা চরমতত্ত্বের স্থিরতার ওপর অধিকতর

১। Logic as thesis

২। Nature as anti-thesis

৩। Spirit as Synthesis

গুরুত্ব দিয়েছেন, আর বামপন্থীরা গুরুত্ব দিয়েছেন গতির ওপর। ব্রেডলি প্রভৃতিরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, ইটালীর ক্রোচে এবং জেন্টিলে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের। হেগেলপন্থীদের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডক্টর হীরালাল হালদার বিরচিত 'নিও হেগেলিয়ানিসম্' এবং যোয়াড্-বিরচিত 'ইনট্রোডাক্শান টু মডার্ন ফিলসফি' গ্রন্থ দু'টি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেশ ও কাল (Space and Time)

জ্ঞানের আকার (Categories of Knowledge)

বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের বিষয় প্রায়ই দেশে ও কালে থাকে। শুধু তাই নয়। বিষয়ের মধ্যে দ্রব্যগুণের[১] সম্পর্ক ও কার্যকারণতত্ত্ব[২] বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যখন আমরা বলি 'ফুলটি সাদা' তখন ফুল বলতে কোন একটা দ্রব্য বুঝি আর এও জানি যে এই দ্রব্যের সাদা রঙ বলে একটি গুণ আছে। আবার যখন বলি 'আগুনে মোম গলে,' তখন আগুনের সঙ্গে মোম গলার একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করি। এমনি ক'রে জ্ঞানের ব্যাপারে দেশ ও কাল, দ্রব্য ও গুন, কার্য ও কারণ প্রভৃতি কতগুলো তত্ত্বের হামেশাই ব্যবহার হয়ে থাকে। এদের মত যে সমস্ত তত্ত্বের ব্যবহার জ্ঞানের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য পশ্চিমের দর্শনে তাদের নাম দেওয়া হয় 'জ্ঞানের আকার'।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় যা-ই হোক না কেন, জ্ঞানের আকার সাধারণ-ভাবে সর্বত্রই প্রযোজ্য। 'আকাশ নীল', 'ঘাস সবুজ', 'গোলাপ লাল' প্রভৃতি যা-ই আমরা বলি না কেন—দ্রব্যগুণ সম্পর্ক সর্বত্রই আছে। এমনি ক'রে দেশ ও কালও যে সাধারণতঃ সর্বত্রই থাকে তা প্রমাণ করার দরকার নেই। জ্ঞানের বিষয় ত কোন একটা বিশেষ দেশে ও কালে থাকবেই। কার্যকারন-সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান ব্যাপারের মধ্যে সাধারণভাবে কার্যকারণতত্ত্বের উপস্থিতি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞানের আকারের ঠিক সংখ্যা কত এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে জ্ঞানের আকার সংখ্যায় দশটি। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের আকার বারটি। হেগেলের মতে সত্তরটি আকার আছে। সোপেনহাওয়ার ত' সমস্ত আকার-গুলোকে এক কার্যকারণতত্ত্বে পরিণত করার প্রয়াসী। এই মত-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মত বেছে নেওয়া সত্যিই শক্ত। জ্ঞানের আকারের সংখ্যা যা-ই

১। দ্রব্য-গুণের সম্পর্ক—Substance-attribute Relation

২। কার্যকারণতত্ত্ব—Causal relation

হোক্ না কেন, এদের মধ্যে দ্রব্য-গুন, দেশ-কাল ও কার্যকারণই যে সবচেয়ে মৌলিক ও প্রয়োজনীয়—একথা অধিকাংশ দার্শনিকই স্বীকার করেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেশ ও কালের স্বরূপ ও পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রব্য-গুন ও কার্যকারণতত্ত্বের আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেশ ও কাল

জগতের দিকে তাকালেই বিভিন্ন বস্তু যে দেশে ও কালে রয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারি। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ওপর-নীচ, ভেতর-বাইর, দূরত্ব ও দিকের সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণতঃ আমরা কোন বস্তুকে অন্য আর একটা বস্তুর ওপরে বা নীচে, ভেতরে বা বাইরে, দূরে বা কাছে, উত্তরে বা দক্ষিণে, পূর্বে বা পশ্চিমে থাকতেই দেখি। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর এ সমস্ত সম্পর্কই দৈশিক সম্পর্ক। এ ছাড়াও বস্তুদের মধ্যে আর এক জাতের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এক বস্তু অন্য আর এক বস্তুর আগে বা পরে স্থানান্তরিত বা পরিবর্তিত হচ্ছে—এও আমরা প্রতিনিয়ত দেখি। বস্তুর মধ্যে এই আগে পরের সম্পর্ক কালিক সম্পর্ক সূচনা করে। সুতরাং বিষয়ের রাজ্যে দেশ ও কালের অপরিহার্যতা স্বীকার করতেই হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল—এই দেশ ও কালের আসল রূপ কি ?

সাধারণ দৃষ্টিতে দেশ ঃ

(১) সাধারণতঃ দেশ আমাদের কাছে সীমাহীন ও অনন্তবিস্তৃত ব'লেই মনে হয়। যে দিকেই তাকাই না কেন অসীম দেশ চোখের সামনে বিস্তৃত দেখতে পাই। দেশের সীমা নেই, কারণ দেশের যেখানেই সীমা টানি না কেন তারপরও আবার দেশই দেখতে পাই। দেশেই দেশের সীমা টানা যায়। সুতরাং অসীম এই দেশ।

(২) অসীম দেশকে কখনও কখনও আমরা খণ্ড খণ্ড ক'রেও দেখি। আমার লেখবার টেবিলটা যে দেশ জুড়ে আছে, ঘরের আলমারিটা সে দেশ জুড়ে নেই বলেই ত ধারণা হয়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। অসীম দেশকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি বটে, আসলে অসীম দেশ কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড দেশের সমষ্টিমাত্র নয়। দেশ স্বরূপতঃ অসীম। আমাদের প্রয়োজনে ও জাগতিক ব্যবহারের সুবিধের জন্য আমরা অসীম দেশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি।

(৩) সাধারণ দৃষ্টিতে দেশকে ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট[১] ব'লেই মনে হয়। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা—এই তিন মিলেই যেন দেশের পরিচয়। যে কোন ঘন বস্তুই এই তিন মাত্রা বিশিষ্ট। সরল রেখা শুধু দৈর্ঘ্যযুক্ত এবং সমতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থযুক্ত। সরলরেখার প্রস্থ নেই আর সমতলের নেই গভীরতা। সরলরেখা ও সমতল তাই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিশেষ।

(৪) সাধারণ দৃষ্টিতে দেশকে কতগুলো বিন্দুর একত্র সমাবিষ্ট রূপ ব'লে মনে হয়। বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব, দিক ও অবস্থানের একটা বিশিষ্ট প্রকাশও সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে কাল ঃ

কালের ধারণা সাধারণতঃ পারম্পর্যবোধ থেকেই জন্মে। পর পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মনে হয় যেন কালও চলেছে।

(১) কাল অনাদি ও অনন্ত। যদি এর কোন আদি থাকত তবে তা কালেই থাকত। কালের অন্তও ত' কোন একটা বিশেষ কালেই সম্ভব। সুতরাং কালের আদি আর অন্ত খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

(২) কালের অনন্ত ভাগ কল্পনা করা যেতে পারে। যদি তা না যেত তবে কালের অংশ থাকত না আর তা হ'লে মুহূর্ত ব'লেও কিছুই থাকত না। কিন্তু আমরা ত' অনন্ত মুহূর্তেই বিশ্বাস করি।

(৩) কালের অনন্ত ভাগ কল্পনা করা গেলেও এই ভাগগুলো মিলে কখনও পূর্ণকাল সৃষ্টি করে না। কাল এক ও অদ্বিতীয়। কালের বিভিন্ন অংশ এই অদ্বিতীয় কালের খণ্ডিত অংশবিশেষ।

(৪) কালের একটা প্রবাহ আছে। এই প্রবাহে পূর্ব ও উত্তর তরঙ্গের কল্পনা করা যেতে পারে। এই তরঙ্গগুলো মিলেই চলমান কালের প্রবাহ। সাধারণ ভাবে লোকেরা দেশ ও কাল এভাবে বুঝলেও দার্শনিকেরা বিচার বিশ্লেষণ করে প্রত্যক্ষগত দেশ ও কাল এবং সামান্য ধারণাগত দেশ ও কালের মধ্যে পার্থক্য করেন। আমরা এবার সে প্রসঙ্গ আলোচনা করবো।

প্রত্যক্ষগত দেশ ও কাল (Perceptual Space and Time)

প্রত্যক্ষের সাহায্যে জগতের বিভিন্ন বস্তু যে কোন না কোন দেশ জুড়ে আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেও একটা দৈশিক

১। Three-dimensional

সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা দেখি, ঘরের টেবিলটা খাটের চেয়ে অনেকটা দূরে, আবার চেয়ারটা টেবিলের খুব কাছেই। কখনও বা দেখি টেবিলটা চেয়ারের সম্মুখভাগে আর আয়নাটা টেবিলের ওপরে। দূরে-কাছে, ওপরে-নীচে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে আমরা দৈশিক সম্পর্ক প্রকাশ করি। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের সাহায্যে দেশ ও দৈশিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে দেশকে প্রত্যক্ষগত দেশ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষগত দেশ বস্তুভেদে বিভিন্ন বলে মনে হয়। ঘরের টেবিলটা যে দেশ জুড়ে আছে, সোফাটা সে দেশ জুড়ে নেই। এমনি করে সমস্ত বস্তুই যেন বিভিন্ন দেশ অধিকার করে আছে। বলা বাহুল্য, এই দেশ অসীম হতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষগত দেশ এক নয়, অনেক এবং অনেক অসীম দেশ অসম্ভব। এক দেশ অন্য দেশের সীমা সূচনা করে।

আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত কত কিছুই ঘটছে। গতি, চলা আর পরিবর্তনই ত' দুনিয়ার নিয়ম। শীতে যে গাছ পত্রশূন্য, মৃতপ্রায় দেখি, বসন্তের হাওয়া লাগলেই আবার তা পুনর্জন্ম লাভ করে। কত পাতা, কত ফুল, কত সৌন্দর্য তাকে ভর করে বিকশিত হয়ে ওঠে তার হিসেব নেই। ভোর হয়। আবার দিনের আলো সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়; ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে কালের পরিচয় আমরা পাই তার নাম প্রত্যক্ষগত কাল। এই কাল যেন বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে। বস্তুর পরিবর্তন যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি তেমনি এই কালও প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে এই কালও বিভিন্ন বলে মনে হয়। এই কাল অনাদি বা অনন্ত নয়। প্রত্যক্ষগত কালের আদিও আছে, অন্তও আছে। যে কোন বিশেষ কালেরই যে আদি ও অন্ত আছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

সামান্যধারণাগত দেশ ও কাল (Conceptual Space and Time)

প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্নতা আলাদা করে যখন সমগ্র দেশের ধারণা করি তখন তার নাম দেওয়া হয় সামান্যধারণাগত দেশ। আমরা যখন 'মানুষ' এই সামান্যধারণা ব্যবহার করি তখন বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে তাদের সাধারন গুণগুলোই বুঝি। ঠিক তেমনি সামান্যধারণাগত দেশ বলতেও আমরা প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে তাদের সাধারণ সমগ্রতাই বুঝি। সামান্যধারণাগত দেশ প্রত্যক্ষগত দেশের মত বিভিন্ন

নয়। এই দেশ এক ও অবিভাজ্য। প্রত্যক্ষধারণাগত বিভিন্ন দেশ এই এক ও অবিভাজ্য দেশেরই সীমিত প্রকাশ মাত্র বলে মনে করা হয়। সামান্য-ধারণাগত দেশের সীমা নেই। কারণ, সামান্যধারণাগত দেশ মাত্র একটি হওয়ায় তার সীমা যদি কিছু থাকে তবে তা সেই দেশেই থাকবে এবং তারপরেও দেশ থাকবে। অর্থাৎ, দেশের সীমা বলে কিছু নেই।

বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন কাল থেকে বিভিন্নতা বাদ দিয়ে যখন আমরা এক অখণ্ড কালের ধারণা করি, তখন সেই কালকে সামান্যধারণাগত কাল বলা হয়। এই সামান্যধারণাগত কাল এক ও অখণ্ড। আমরা মনে করি এ যেন একটা প্রবাহ। বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তন-নিরপেক্ষভাবেই যেন এই কাল থাকতে পারে। জাগতিক শত পরিবর্তন-নিরপেক্ষভাবে যে অনাদি ও অনন্ত কালপ্রবাহ চলেছে তারই নাম সামান্যধারণাগত কাল। এই কাল অনাদি ও অনন্ত, এক ও অবিভাজ্য।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আসলে বিভিন্ন দেশ যোগ করে এক অখণ্ড দেশ সৃষ্টি হয় না। অখণ্ড দেশই আছে। আমরা প্রয়োজনে ও জাগতিক ব্যবহারের সুবিধের জন্য এই অখণ্ড দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ভাবি। কাল সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। এক অখণ্ড কালই আছে। খণ্ডকাল আমাদের প্রয়োজনের সৃষ্টিমাত্র। তা হলে প্রশ্ন উঠবে—সামান্য ধারণাগত দেশ ও কাল প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে সৃষ্টি হয়, এর মানে কি? উত্তর সহজ। এক অখণ্ড দেশ ও কাল আমরা প্রথমেই জানতে পারি না। জানতে গেলে প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কালই আমরা প্রথমতঃ জানি। তারপর এই বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে চিন্তা করে এক অখণ্ড দেশ ও কালের ধারণা লাভ করি। সুতরাং জানার দিক থেকেই প্রত্যক্ষগত দেশ ও কাল থেকে সামান্যধারণাগত দেশ ও কালের ধারণা হয়। আসলে এক অখণ্ড দেশ ও কালই আছে। বিভিন্ন দেশ ও কাল লোকব্যবহারের সৃষ্টিমাত্র।

দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি

(Origin of the Ideas of Space and Time)

দেশ ও কালের ধারণা মানুষের মনে কি করে এল—এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁদের বিভিন্ন মত এখানে আলোচনা করব।

(১) রিড্, মার্টিনিউ প্রভৃতি অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা[১] মনে করেন, দেশ ও কাল আমরা সোজাসুজি অপরোক্ষানুভূতিতে[২] পাই। দেশ ও কাল পরস্পর-নিরপেক্ষ দুটি স্ব-নির্ভর তত্ত্ব।

(২) বার্কলি, হিউম, মিল প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে দেশ ও কালের ধারণা প্রত্যক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান দূরত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার পর দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়। নিজেদের মনের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে কাল সম্বন্ধে আমরা ধারণা ক'রে থাকি।

(৩) কাণ্ট বলেন, বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি দেখে দেশের ধারণা হ'তে পারে না। অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি কিছুই দেশের ধারণা ছাড়া বোঝা যায় না। সুতরাং বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতির ওপর দেশের ধারণা নির্ভর করে না, দেশের ধারণার ওপরই বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ভর করে। ঠিক তেমনি ক'রে মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা থেকেও কালের ধারণা লাভ করা যায় না। কালের ধারণা না থাকলে পরিবর্তনই বোঝা যায় না। পরিবর্তন বুঝতে গেলে কালের ধারণা থাকা আবশ্যক। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা কোন অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যায় না। সমস্ত অভিজ্ঞতাই দেশ ও কালের ধারণার ওপর নির্ভর করে।

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল অভিজ্ঞতার পূর্বতঃসিদ্ধ আকার মাত্র। দেশ ও কাল পূর্বতঃসিদ্ধ এই অর্থে যে, দেশ ও কালের ধারণা ছাড়া কোন অভিজ্ঞতাই হয় না।

দেশ ও কাল নিশ্চয়াত্মক ধারণা।[৩] দেশ ও কালস্থিত সমস্ত বস্তুর অভাব আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু দেশ ও কালের অভাব ভাবা যায় না। কোন নিশ্চয়াত্মক ধারণাই অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে যা-ই লাভ করা যাক্ না কেন তা-ই সংশয়যোগ্য। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাত ও পূর্বতঃসিদ্ধই বটে।

বিশেষতঃ দেশ ও কালের ধারণা যদি অভিজ্ঞতা-প্রসূত হ'ত তবে কোন সামান্য বচনই[৪] এদের ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠতে পারত না। জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানে বহু সামান্য বচনের ব্যবহার পাওয়া যায়, আর জ্যামিতি ও

১। Intuitionists
২। Intuition
৩। Necessary ideas
৪। Universal Proposition

গতিবিজ্ঞান যথাক্রমে দেশ ও কাল নিয়েই আলোচনা করে। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলেও দেশ ও কালকে প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাতই বলতে হবে।

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল সামান্য ধারণা[১]ও নয়। দেশ ও কাল যদি সামান্যধারণা হ'ত তবে প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে বিভিন্নতা আলাদা করেই এই সামান্যধারণা লাভ করা যেত। কাণ্ট মনে করেন, বিভিন্ন দেশ ও কাল অখণ্ড দেশ ও কাল খণ্ডিত করেই লাভ করা যায়। অখণ্ড দেশ ও কালই আগে থাকে আর তা খণ্ডিত হয়েই বিভিন্ন দেশ ও কালের সৃষ্টি হয়।

আমরা দেশকে অসীম আর কালকে অনাদি ও অনন্ত বলে জানি। যদি দেশ বিভিন্ন দেশের সামান্যধারণা থেকে উৎপন্ন হ'ত তবে বিভিন্ন দেশেরই অসীমতা থাকত। কিন্তু খণ্ড খণ্ড দেশ অসীম, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু কোন বিশেষ কালই অনাদি ও অনন্ত নয়। সুতরাং বিভিন্ন বিশেষ কালের সামান্যধারণা হিসেবে অনাদি ও অনন্ত কালকে ভাবা যায় না। সুতরাং দেশ ও কাল সামান্যধারণা নয়।

কাণ্ট এই সমস্ত দিক আলোচনা করে দেশ ও কালকে মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার বলে অভিহিত করেছেন। দেশ ও কালের ধারণা মনে থাকে বলে সমস্ত অভিজ্ঞতার আগেই এদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, এমন কথা কাণ্ট বলেন না। মানুষের মনে এসমস্ত ধারণার সম্ভাবনা থাকে। অভিজ্ঞতার সময়ই এদের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—দেশ ও কাল যদি মনের আকার মাত্রই হয় তবে জগতের বস্তু আমরা দেশে ও কালে দেখি কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হেগেল বলেন, দেশ ও কাল পরব্রহ্মের আকার। পরব্রহ্মই চরম সত্য। মানুষের মন ও জগৎ উভয়ই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং দেশ ও কাল যেমন মানুষের মনের আকার, ঠিক তেমনি তা জাগতিক বস্তুরও আকার। যেহেতু দেশ ও কাল জাগতিক বস্তুর আকার, সেই জন্যই আমরা সমস্ত বস্তু দেশে ও কালে দেখি।

(৪) আধুনিক কালে দেশ ও কাল সম্বন্ধে আইনস্টাইন যে মতবাদ প্রচার করেছেন, সাধারণভাবে তা-ই স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর মতে দেশ ও কাল আলাদা

১। Concept

নয়। দেশ ছাড়া কাল বোঝা যায় না, আবার কাল ছাড়াও দেশ বোঝা যায় না। সুতরাং দেশ ও কাল না বলে দেশ-কাল বলাই ঠিক।[১]

দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার গতির ওপর দেশ ও কাল নির্ভর করে। এক অসীম দেশ বা এক অখণ্ড কাল (cosmic space and time) বলে কিছু নেই।[২]

দেশ ও কাল সম্বন্ধে দার্শনিকেরা তিনটি সমস্যা নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। এই তিনটি সমস্যা হ'ল (১) দেশ ও কাল কি বিষয়গত না আত্মগত? (Are Space and Time objective or subjective ?) (২) দেশ ও কাল কি নিরপেক্ষ না সাপেক্ষ? (Are Space and Time absolute or relative ?) এবং (৩) দেশ ও কাল কি আত্যন্তিক সত্তাসম্পন্ন, না নয়? (Are Space and Time real or unreal ?) আমরা এই তিনটি সমস্যাই সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

দেশ ও কাল বিষয়গত না আত্মগত ?
(Are Space and Time Objective or Subjective ?)

দেশ ও কাল বিষয়গত না আত্মগত—এ এক জটিল প্রশ্ন। সত্যি সত্যিই জগতে দেশ ও কাল ব'লে জ্ঞাতা এবং জ্ঞাননিরপেক্ষ কোন বস্তু আছে কি? না, দেশ ও কাল জ্ঞাতা মনের আকার বা জ্ঞান-নির্ভর মাত্র? এই দুটি প্রশ্নই আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক এসব প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

(ক) দেশ ও কাল বিষয়গত ঃ

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে দেশ ও কালের জ্ঞাতানিরপেক্ষ বিষয়গত সত্তা আছে। এরা যেন দুটি আধারের মত যথাক্রমে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে ধারণ করে আছে। এই মতে দেশ ও কালের সঙ্গে বস্তু ও ঘটনার এক আধার-আধেয় সম্পর্ক রয়েছে। দেশ ও কাল সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই ধারণা নিউটন, গ্যালিলিওর মত বৈজ্ঞানিকেরাও সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে দেশ ও কাল যেন দুটি বিষয়গত আধার। সমস্ত বস্তুই দেশে থাকে আর সমস্ত ঘটনাই কালে ঘটে।

১। আইনস্টাইনের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষের দিকে দ্রষ্টব্য।

২। এই বিষয়ের দার্শনিক আলোচনার জন্য রাসেল-রচিত 'ABC of Relativity' পাঠ করা যেতে পারে।

ডেকার্টের মতে জড় একটি দ্রব্য।[১] বিস্তৃতি জড়ের স্বরূপ। বিস্তৃতি ছাড়া জড় থাকতে পারে না, আবার জড় ছাড়াও বিস্তৃতি থাকতে পারে না। বিস্তৃতি ও দেশ সমার্থক। সুতরাং দেশ জড়ের স্বরূপ। অর্থাৎ দেশ বিষয়গত সত্তাসম্পন্ন।

স্পিনোজার মতে ঈশ্বরই পরমতত্ত্ব ও সত্য। ঈশ্বরের অনন্ত গুণ। বিস্তৃতি বা দেশ এই অনন্ত গুণের অন্যতম গুণ অর্থাৎ দেশ বা বিস্তৃতি ঈশ্বরে বর্তমান। স্পিনোজার দর্শনে, যা ঈশ্বর তাই প্রকৃতি।[২] সুতরাং ঈশ্বরের গুণ দেশপ্রকৃতিরও গুণ। কাজেই স্পিনোজার মতে দেশ বিষয়গত।[৩]

আধুনিক কালে আলেকজেণ্ডার দেশ-কালকে বিশ্বের চরমতত্ত্ব বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে দেশ-কালই জগতের সমস্ত বস্তুর উপাদান। নিউটনের মত তিনি দেশ ও কালকে পরস্পরনিরপেক্ষ ব'লে মানতে রাজী নন। তাঁর মতে দেশ ও কালের পরস্পরনিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। দেশ ছাড়া কাল ভাবা যায় না, আবার কাল ছাড়াও দেশ ভাবা যায় না। দেশ বলতে আমরা কতগুলো বিন্দুর একত্র সমাবেশই বুঝি। কিন্তু বিন্দুগুলো যদি পর পর না থাকে তবে কোন দেশ সৃষ্টি হয় না। 'পরপর' বা পরম্পরা কাল সূচনা করে। সুতরাং দেশের ধারণার মধ্যেই কালের ধারণা নিহিত। অন্যদিকে কালের ধারণার মধ্যেও দেশের ধারণা আছে। কাল বলতে আমরা পারম্পর্য বুঝি। কিন্তু শুধু পারম্পর্য বোধগম্য নয়। 'ক' যদি 'খ'র পরে হয় তবে 'ক' ও 'খ' খানিকটা দেশ জুড়ে থাকবেই। সুতরাং পরম্পরা বুঝতে গেলে দেশের ধারণা আপনি এসে যায়। কাজেই কাল কখনই দেশ ছাড়া হয় না। সুতরাং দেশ-কাল একান্তভাবেই পরস্পরসাপেক্ষ। আলেকজেণ্ডারের মতে অচ্ছেদ্য দেশ-কাল বিশ্বের আদিম উপাদান। জড়, প্রাণ, মন সব কিছুই দেশ-কাল থেকে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে বার্গসঁর বক্তব্য ও আলোচনা করা যেতে পারে। বার্গসঁর মতে কালই চরমতত্ত্ব। কাল বলতে অবশ্য তিনি পারম্পর্য বোঝেন না। তাঁর মতে কাল এক অনাদি, অনন্ত প্রবাহ বিশেষ। এই প্রবাহে কোথাও কোন ছেদ নেই,

---

১। Matter is a substance

২। God=Nature

৩। অবশ্য হেগল ও আর্ডমন স্পিনোজার দর্শনে ঈশ্বরের গুণ বিষয়গত নয়, বিষয়ীগত, এই মত প্রচার করেছেন। এই মত গ্রহণ করলে স্পিনোজার মতে দেশ বিষয়ীগত হ'বে, বিষয়গত হবে না

বিরাম নেই। আমরা যে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ব'লে কালের তিন ভাগ করি, বার্গসঁর মতে তা কখনই পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। বর্তমান অতীতে গিয়ে মিশেছে আর অতীত ভবিষ্যতের কোলে এলিয়ে পড়েছে। অবিরাম গতিই কালের প্রকৃতি। কালই একমাত্র সত্য।

বুদ্ধি দিয়ে প্রবহমান কালকে সম্পূর্ণভাবে কখনই জানা যায় না। যখনই আমরা কালকে বুদ্ধি দিয়ে জানতে চেষ্টা করি তখনই তার অখণ্ডতা নষ্ট হ'য়ে যায়; প্রবাহ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে বলে মনে হয়। বুদ্ধি দিয়ে কালকে জানার সময় যে স্থিরতার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় তারই নাম দেশ। সুতরাং বার্গসঁর মতে দেশ ব'লে কোন সত্যবস্তু নেই। দেশ বুদ্ধিসৃষ্ট এক ধারণামাত্র, কালই পরমতত্ত্ব ও সত্য। অন্তরের গভীরতায় এই কালের সঙ্গে একাত্ম হ'য়েই তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই কাল বিষয়গত।

এই প্রসঙ্গে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচলিত 'প্রতীয়মান বর্তমান' (Specious present) বলে একটি কথার তাৎপর্য আলোচনা করা যেতে পারে। দার্শনিকেরা বলেন, যাকে আমরা বর্তমান বলি বা যা বর্তমান বলে প্রতীয়মান হয় তাতে বস্তুতঃ অতীত এবং ভবিষ্যৎও বিদ্যমান। ১০টার সময় ক্লাস আরম্ভ করার জন্য যে ঘণ্টাধ্বনি করা হয় তার কোন্ অংশটা বর্তমান, আর কোন্‌টা অতীত এবং কোন্‌টাই বা ভবিষ্যৎ তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় কি? আসলে এই ঘটনায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে তাদের পার্থক্য করা মুশকিল। সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রেই অনুরূপ ব্যাপার বর্তমান। সেজন্যই অনেক দার্শনিক বলেন, যা বর্তমান বলে প্রতীয়মান তা আসলে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের একটি প্রবাহ।

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষজাত ধারণাবিশেষ :

আমরা লাইব্‌নিজের ভাববাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, চিৎপরমাণুই[১] তাঁর মতে চরমতত্ত্ব। দুনিয়ার পরিবর্তন ও গতি সব সময়েই চলেছে। গতিশীলতা চিৎপরমাণুর স্বরূপগত ব্যাপার। এই চিৎপরমাণু জড় বা জড়াত্মক নয়। সুতরাং বিস্তৃতি বা দেশ এই চিৎপরমাণুর কোন ধর্ম হ'তে পারে না। কোন কোন চিৎপরমাণুর গতিশীলতা অন্য চিৎপরমাণুর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং যে সমস্ত চিৎপরমাণুর গতিশীলতা কম তাদের যে সমস্ত চিৎপরমাণুর গতিশীলতা বেশী তাদের তুলনায় নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। এই সব চিৎপরমাণুতে নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তি

১। Monad

বোধের জন্য এদের জড় বলে ধারণা হয়। যা জড় তার বিস্তৃতিও আছে। সুতরাং চিৎপরমাণুর নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তিবোধের জন্যেই বিস্তৃতি বা দেশের ধারণা হয়। কাজেই দেশ-বিষয়ক ধারণা অভিজ্ঞতাজাত ভ্রান্ত ধারণাই বটে। বস্তুতঃ চিৎপরমাণুর দেশগত কোন ধর্ম নেই।

লাইব্‌নিজ মনে করেন, কালের ধারণাও চিৎপরমাণুর পারস্পরিক সম্পর্কের ভ্রান্তিবোধ থেকে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। তাঁর মতে প্রত্যেক চিৎপরমাণু স্বনির্ভর। এক চিৎপরমাণু কখনই অন্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু দুনিয়ার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা মনে করি, এক চিৎপরমাণু যেন অন্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার কালেই সম্ভব। সুতরাং চিৎপরমাণুর পারস্পরিক প্রভাবের ভ্রান্ত ধারণা থেকেই কালের ধারণার উৎপত্তি হয়। কাল বস্তুগত নয়, একান্তভাবেই অভিজ্ঞতাজাত ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ। দেশ ও কালের অস্তিত্ব আমরা অভিজ্ঞতাতেই লাভ করি। এদের প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাত বা বিষয়গত কোন সত্তা নেই।

বার্কলি দেশ ও কাল উভয়কেই প্রত্যক্ষজাত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যক্ষের বিস্তৃতিই (space is extended perceptions) দেশ এবং প্রত্যক্ষের পারম্পর্য (Sequence of perceptions) কাল। প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত দেশ ও কালের কোন সত্তা নেই। বার্কলি 'এসে টুয়ার্ডস এ নিউ থিওরি অব ভিসন'-এ বলেছেন, আমরা যাকে দূরত্ব বলি তা দর্শন এবং স্পর্শন এই দু'টি ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-ভিত্তিক। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠকেরা বর্তমান লেখকের 'পাশ্চত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—লক, বার্কলি, হিউম' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-প্রকাশিত) গ্রন্থটি পাঠ করলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

কাণ্ট এই সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন। কাণ্ট মনে করেন, দেশ ও কাল যদি অভিজ্ঞতাজাত ধারণা মাত্র হয়, তবে দেশ-নির্ভর জ্যামিতি ও কালনির্ভর গতিবিজ্ঞান কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানে সর্বজনগৃহীত সামান্যজ্ঞান[১] লাভ করা যায়। অভিজ্ঞতায় কখনও সামান্যজ্ঞান পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় আমরা কয়েকজন লোককে মরতে দেখি। কিন্তু 'সকল মানুষ মরে' এমন সামান্যজ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতায় হ'তে পারে না। অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান কখনও সর্বজনগৃহীতও হয় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতা

১। Universal Knowledge

ভিন্ন ভিন্ন রকমই হয়। সুতরাং অভিজ্ঞতা সর্বজনগ্রাহ্য কোন জ্ঞান দিতে পারে না। কাজেই জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞান কখনই অভিজ্ঞতাজাত ধারণা দেশ ও কাল-নির্ভর হ'তে পারে না। দেশ ও কাল প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাতই হ'বে। কাণ্টের মতে দেশ ও কাল মনের পুর্বতঃসিদ্ধ আকারমাত্র। আমরা তাঁর মতবাদ পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এখন তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

দেশ ও কাল মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার মাত্র :

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল বিষয়গত নয়। যদি বিষয়গত হত তবে জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানের মত সর্বজনগৃহীত নিশ্চিত বিজ্ঞান কখনই দেশ ও কালের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হতে পারত না। কোন বস্তুই নিশ্চিত নয়। কারণ, সমস্ত বস্তুরই বিপরীত ভাবা যেতে পারে। যে ফুলকে সাদা বলি তাকে লাল ভাবতেও কোন আপত্তি নেই। 'সোনার পাথরের বাটি' বললে যেমন চিন্তার মধ্যেই বিরোধিতা দেখা দেয়, এই ক্ষেত্রে তেমন কোন বিরোধিতা দেখা যায় না। এমনি ক'রে দেখান যেতে পারে যে, কোন বস্তুই সন্দেহাতীত নয়। সুতরাং জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানের মত নিশ্চিত শাস্ত্র কখনই বস্তু-নির্ভর হ'তে পারে না। কাজেই দেশ ও কাল বস্তুগত নয়।

কিন্তু সেজন্য দেশ ও কালকে অধ্যাসরূপাত্মকও বলা চলে না। যদি দেশ ও কাল অধ্যাসরূপাত্মক হত তবে দেশ-নির্ভর জ্যামিতি আর কাল-নির্ভর গতিবিজ্ঞান কখনই নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারত না।

দেশ ও কালকে সামান্যধারণা[১]ও বলা যায় না। কারণ, কোন অভিজ্ঞতাই দেশ ও কাল ছাড়া হয় না। এই বিষয় আমরা দেশ ও কালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সুতরাং দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাজাত নয়। আর অভিজ্ঞতা-জাত নয় এমন কিছু কখনই সামান্যধারণা হ'তে পারে না। অভিজ্ঞতায় বিশেষের (Particulars) জ্ঞান না পেলে কখনই সামান্যধারণার সৃষ্টি হয় না। অভিজ্ঞতায় কতগুলো মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কি 'মানুষ' এই সামান্যধারণা কখনও করা যায় ?

কাণ্ট এই সমস্ত নানা রকমের সম্ভাব্যতা বিচার ক'রে বললেন—দেশ ও কাল মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকারই (A-priori forms of Intuition) হবে। কাণ্ট দেশ ও কালকে পুর্বতঃসিদ্ধ আকার বলতে কি বোঝেন, তা আমরা দেশ ও কালের

১। Concept

উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কাণ্টের মতে দেশ ও কালের আকার ছাড়া কোন জ্ঞানই হতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব থেকে আমরা যা পাই, কাণ্ট তার নাম দিয়েছেন অনুভব।[১] এই অনুভব দেশ ও কালের মধ্যেই গৃহীত হ'য়ে থাকে। কোন কিছু জানতে হ'লেই মন বস্তুর ওপর দেশ ও কালের আকার লাগিয়ে দেয়। দেশ ও কালের আকার মনের আকার। সুতরাং দেশ ও কালের মধ্যে কখনই বস্তু-স্বরূপকে জানা যায় না। যখনই দেশ ও কালের মধ্যে বস্তু-স্বরূপ[২] উপস্থাপিত হয় তখন তা আভাস[৩] রূপ ধারণ করে। আভাস অভিজ্ঞতা-লভ্য বস্তু। সেজন্য কাণ্ট বলেন, দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাতেই সত্য, বস্তু-স্বরূপের প্রসঙ্গে এদের কোন সত্যতা নেই।[৪] তবে দেশ ও কাল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। দেশ ও কাল সমস্ত মানুষেরই জ্ঞানের আকার। বার্কলির সঙ্গে কাণ্টের পার্থক্য এই যে, বার্কলির মতে দেশ ও কাল প্রত্যক্ষজাত এবং কাণ্টের মতে তারা প্রত্যক্ষজাত নয়, তাদের ছাড়া প্রত্যক্ষই হ'তে পারে না। এরা প্রত্যক্ষের আকার এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব।

কে. পিয়ার্সন 'গ্রামার অব সায়েন্স' নামক পুস্তকে কাণ্টের মতবাদই সমর্থন করেছেন। তিনি মনে করেন, দেশ ও কাল এই জগতের কোন বিষয় নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বস্তুকে এদের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।[৫]

কিন্তু এই মতবাদে দেশ ও কাল সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে তা সমর্থিত হয় না। আমরা জাগতিক বস্তু দেশে ও কালেই দেখতে পাই। দেশ ও কাল যদি মনের আকার হয় তবে তা জগতের বস্তুতে কি করে থাকে, তা ঠিক বোঝা যায় না। সেজন্য **হেগেল** দেশ ও কালকে পরব্রহ্মের আকার বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তি-মন ও জগৎ পরব্রহ্মের দুই প্রকাশ। সুতরাং দেশ ও কাল যেমন মনোগত ঠিক তেমনি বিষয়গত বা বস্তুগতও বটে।

আধুনিক কালে দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতবাদই সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। আইনস্টাইনের মতে দেশ ও কাল পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। দেশবিচ্ছিন্ন কাল বা কালবিচ্ছিন্ন দেশ ভাবা যায় না।

১। Intuition

২। Thing-in-itself

৩। Appearance

৪। Space and Time are empirically real but transcendentally ideal.

৫। "Space and Time are not the realities of the phenomenal world, but modes under which we perceive things apart".

সুতরাং দেশ ও কাল না বলে দেশ-কাল বলাই উচিত। দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করে। দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করলেও দেশ-কাল আত্মগত এমন মনে করার কারণ নেই। কোন জিনিস সাপেক্ষ (Relative) হলেই তা আত্মগত হয় না। যেমন বিভিন্ন মানুষের অবস্থান অনুসারে তাদের কাছ থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব বিভিন্ন হতে পারে। তাতে দূরত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থান সাপেক্ষ হবে। কিন্তু, সেজন্য দূরত্ব আত্মগত, এমন বলা যায় না। দূরত্ব বিষয়-গতই। তেমনি বলা যায়, দেশ-কাল সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বিষয়গত।

আইনস্টাইনের মত দেশ-কালাপেক্ষিকতাবাদ (Space-time Relativity) নামে পরিচিত। আমরা এবার এই মতবাদের সামান্য পরিচয় দেব। এই মতবাদ অত্যন্ত কঠিন। গণিতশাস্ত্রে এবং পদার্থবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা না থাকলে এ মতের তাৎপর্য বোঝা যায় না। সেজন্য আমাদের আলোচনা হবে খুবই প্রাথমিক এবং অগভীর।

দেশ ও কাল কি সাপেক্ষ না নিরপেক্ষ ? (Are Spacc and Time Absolute or Relative ?)

নিউটন মনে করতেন, দেশ ও কাল যেন নিত্যকাল ধরেই একই রূপে রয়েছে। দেশ বস্তুর আধার, কাল ঘটনার আধার। বস্তু দেশে থাকে, কালে ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়। দেশ ও কাল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। একটি আর একটির ওপর কোন দিক থেকেই নির্ভরশীল নয় বা একটি আর একটির সাপেক্ষ নয়। এই মতবাদ দেশ ও কাল নিরপেক্ষতাবাদ (Absolute theory of Space and Time) নামে পরিচিত। দেশ ও কাল-নিরপেক্ষতাবাদ সমর্থন করা শক্ত। যদি প্রশ্ন করা যায় —দেশস্থিত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে দেশটা কেমন বা কালে ঘটেছে এমন ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে কালটাই বা কেমন, তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। আসলে বস্তুশূন্য দেশ বা ঘটনাশূন্য কাল আমরা প্রত্যক্ষ করি না। যাকে আমরা সাধারণতঃ শূন্য দেশ বলি তা দু'টি বস্তুর দ্বারা সীমিত দেশ এবং যাকে আমরা শূন্য কাল বলি তা বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা ব্যবহিত কাল। তা হ'লে প্রশ্ন হবে বিজ্ঞানীরা এবং অনেক দার্শনিক এ মত মেনেছেন কেন ? আমাদের মনে হয়, অনেক দার্শনিক যে এ মত মেনেছেন তার কারণ এ মত বিজ্ঞানীরা মানেন এবং বিজ্ঞানীরা যে এ মত মেনেছেন তার কারণ নিউটনের গতির নিয়ম (Newtonian Laws of motion) দেশ ও কাল যে নিরপেক্ষ, এ মত না মানলে ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্তমানে অবশ্য বিজ্ঞানীরা আর এ মত মানেন না। তাঁরা আইনস্টাইনের নেতৃত্বে পদার্থবিজ্ঞানে

দেশ-কালাপেক্ষিকতাবাদ (The Relative Theory of Space-Time) স্বীকার করেছেন এবং এই মতের ভিত্তিতেই গতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দার্শনিকেরা এই ব্যাপারে কি ভাবে বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধতা করতে পারেন তা বলা শক্ত।

আইনস্টাইনের নেতৃত্বে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় দেশ ও কাল সম্বন্ধে যে নূতন ধারণার স্থষ্টি হয়েছে তা পুরাতন মতবাদ থেকে দুই দিক দিয়ে স্বতন্ত্র।

প্রথমতঃ, সাধারণতঃ দেশ ও কালকে ভিন্ন জিনিস বলে মনে করা হয়েছে। সাধারণ লোকের ধারণা দেশ বিস্তৃতি বোঝায় আর কাল বোঝায় পারম্পর্য। বিস্তৃতি পারম্পর্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পারম্পর্যও বিস্তৃতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। কিন্তু আইনস্টাইন মনে করেন, দেশ ও কাল ভিন্ন নয়। আসলে কাল দেশেরই চতুর্থ মাত্রা[১] বিশেষ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা—দেশের এই তিন মাত্রা। পারম্পর্য দেশের চতুর্থ মাত্রা। পারম্পর্য বলতে কাল বোঝায়। আইনস্টাইন মনে করেন, চারমাত্রা বিশিষ্ট দেশ-কালই আসল বস্তু। দেশ ও কাল দেশ-কাল-এর বিভিন্ন দিক মাত্র। দেশ স্বরূপতঃই কালিক সত্তা বিশিষ্ট। কালও স্বরূপতঃ দৈশিক সত্তা-সম্পন্ন। আসলে দেশ-কাল পরস্পর অবিচ্ছন্ন একই সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। স্বর্যে যদি কোন মানুষের অবস্থান সম্ভব হয় তবে তার দেশ-কাল পৃথিবীর লোকের দেশ কাল থেকে ভিন্ন হবে, কারণ স্বর্যের গতি আর পৃথিবীর গতি এক নয়।

দেশ-কাল সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ দেশ কালাপেক্ষিকতাবাদ নামে পরিচিত। এই মতে দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির উপর নির্ভরশীল হ'লেও তা কখনও আত্মগত নয়। এই আপেক্ষিকতাবাদই দেশ-কাল সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

এই মত অনুসারে এক অখণ্ড কাল বা এক অসীম দেশ বলে কিছু নেই। রাসেল বলেন, দর্শনের ক্ষেত্রে একথার প্রভাব খুব বেশী। এর ফলে আমাদের জড়জগৎ-সম্পর্কিত ধারণায় বিস্তর পরিবর্তন এসেছে।[২] আজ বলতে হয় যে, জগৎ বস্তুর সমাহার নয়, ঘটনার সমাহার (a system of events)। এই বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।

১। Forth dimension

২। 'For philosophy, the most important thing about the theory of Relativity is the abolition of the one cosmic time and the one persistent space and the substitution of space-time in place of both. This is a change of quite enormous importance, because it alters fuudamentally our notion of the structure of the physical world.'

দেশ ও কাল কি আত্যন্তিক সত্তাসম্পন্ন, না নয় ?

তর্কবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে যে ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ আছে তা কখনও সত্য হ'তে পারে না। 'সোনার পাথরের বাটি' একটি স্ববিরোধ-সম্বলিত ধারণা। যে বাটি সোনার তা আবার পাথরের হ'তে পারে না। স্ববিরোধ-যুক্ত বলে 'সোনার পাথর বাটি' কোন সত্য ধারণা নয়। কোন কোন দার্শনিকের মতে দেশ ও কালের ধারণার মধ্যেও স্ববিরোধ রয়েছে। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা কখনই সত্য হ'তে পারে না। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জিনো ও আধুনিক কালের কাণ্ট ও ব্রেড্লি সাহেবের মতে দেশ ও কালের আত্যন্তিক সত্তা নেই। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ বিচার করে দেখব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জিনো মনে করেন, কোন রকমের গতিই সম্ভব নয়। গতি বলতে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়াই বোঝায়। কিন্তু এই দুই বিন্দুর মধ্যে অনন্ত সংখ্যক বিন্দুই থাকতে পারে, কারণ দেশ অনন্তভাগে ভাগ করা যায়। সুতরাং এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়া কখনই সম্ভব হবে না। যদি একটি বাণের গতির কথা চিন্তা করি তবে বলতে হবে বাণটি হয় যেখানে আছে সেখানেই আছে, অথবা যেখানে আছে সেখানে নেই। বাণটি যদি যেখানে আছে সেখানেই থাকে তবে গতি সম্ভব নয়, আর যেখানে বাণটি নেই সেখানে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। জিনো আচিলেস্ এবং কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দিয়ে ও গতির অসম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, আচিলেস্ যদি কচ্ছপকে ১০ মিনিট আগে দৌড়োতে দেয় তবে আচিলেস্ (কচ্ছপের চেয়ে যতই দ্রুত দৌড়োক না কেন) কখনই কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। মনে করা যাক্ কচ্ছপ ১০ মিনিটে 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দু পর্যন্ত ছুটে গেছে। আচিলেস্ 'খ' বিন্দুতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে কচ্ছপ 'গ' বিন্দুতে চলে যাবে। আচিলেস্ 'গ' বিন্দুতে পৌঁছোলে কচ্ছপ 'ঘ' বিন্দুতে চলে যাবে। এমনি করে কখনই আচিলেস্ কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। অথচ বাস্তবে এরূপ হওয়া অসম্ভব।

এই রকম ধরণের অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় বলে জিনোর মতে গতির এবং কালের ধারণা সত্য নয় এবং এদের আত্যন্তিক সত্তা নেই।[১]

দর্শনের ক্ষেত্রে দেশ ও কালের অসীমতার সমস্যা (The problem of infinity) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাটা এই যে দেশ ও জগৎ সসীম এবং অসীম,

১। কাল আমরা গতির ভিত্তিতেই জানি। গতি অসত্য বলে কালকেও অসত্য বলা হয়েছে।

কাল এবং কালে উৎপন্ন ঘটনা সান্ত ও অনন্ত দুইই বলা যায়; অথচ একই সঙ্গে দুই-ই হ'তে পারে না, আবার যদি কোন একটি বিকল্প গ্রহণ করা যায় তবে অন্য বিকল্প-সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়।

কাণ্ট 'অ্যান্টিনমি'র কথা বলেছেন। অ্যান্টিনমির ক্ষেত্রে একই রকম প্রামাণ্য বিশিষ্ট দুই প্রকার যুক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ দু'টি সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। এই দুই প্রকার যুক্তির একটি শুদ্ধ, অন্যটি অশুদ্ধ, এমন কথা আমরা বলতে পারি না। ফলে যে বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত হয় তারই আত্যন্তিক সত্তা নেই, এমন কথা বলতে হয়।

দেশ ও কালের এবং দেশ ও কালস্থিত সমস্ত বস্তুরই অসীম বিস্তৃতি এবং অনন্ত বিভাজ্যতা (Infinite extent and infinite divisibility) প্রসঙ্গে অ্যান্টিনমির উদ্ভব হয়।

কালের অসীমতা বলতে যদি কলের আদি নেই বোঝায় তবে যে কোন মুহূর্তে অসীম কাল গত হয়েছে বা চলে গেছে, একথা বল:তে হয়। কিন্তু, অসীম কাল চলে গেছে, একথা বলা যায় না।

আর যদি বলি কাল সসীম তবে কালের আরম্ভ বা আদি থাকবে এবং তা থাকবে কালেই। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—কোন্ কাল হবে কালের এই আদি কাল? আর এই দুই কালের মধ্যে ভেদরেখাই বা কি হবে? সুতরাং কাল অসীম নয় বলে সসীম আবার সসীম নয় বলে অসীম—দুই-ই বলা যায়। কিন্তু, কাল অসীম ও সসীম দুই-ই এক সঙ্গে হ'তে পারে না।

দেশ যদি অসীম হয় তবে যে কোন দেশেই অসীম দেশ আবদ্ধ, একথা বলতে হয়। কিন্তু, সসীম দেশে অসীম দেশ আবদ্ধ থাকবে কি করে? আর যদি দেশ হয় সসীম তবে দেশেই তা সীমিত হবে এবং প্রশ্ন উঠবে—দেশের সঙ্গে যে দেশ সীমা টানছে তার সম্বন্ধ কি? বা দুই দেশের ভেদরেখা কোথায়? উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ অসীম নয় বলে সসীম এবং সসীম নয় বলে অসীম, দুই-ই হ'তে পারে। কিন্তু, দেশের পক্ষে একই সঙ্গে সসীম ও অসীম হওয়া সম্ভব নয়।

দেশ যদি অনন্ত বিভাজ্য হয় তবে যে কোন ক্ষুদ্র ও সীমিত দেশই অনন্ত বিভাজ্য হবে। কিন্তু, কোন ক্ষুদ্র ও সীমিত দেশের অনন্ত অংশ চিন্তা করা কঠিন। আবার যে কোন সাবয়ব দ্রব্যেই অবয়ব বা অংশ থাকে এবং এই অংশ হয় নিরংশ। কিন্তু, দেশ বা দেশাস্থিত বস্তু যদি অনন্ত বিভাজ্য হয় তবে নিরংশ কোন দেশ বা দেশস্থিত বস্তু পাওয়া যাবে না। কালের অনন্ত বিভাজ্যতা

সম্বন্ধেও এই জাতীয় সমস্যা উঠতে পারে। কিন্তু, কাণ্ট তা আলোচনা করেন নি। এই সমস্ত কথা বিবেচনা ক'রে কাণ্ট বলেছেন, দেশ ও কালের আত্যন্তিক সত্তা নেই, এরা আভাস মাত্র (appearances)।

মন্তব্য ঃ জিনো গতির অসম্ভাবনা সম্বন্ধে যে সমস্যা তুলেছেন তা দেশ ও কালের অনন্তবিভাগ কল্পনার ফলে উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুতঃ দেশ ও কাল অনন্ত-বিভাজ্য নয়। আমরা দেশ ও কালকে এমনভাবে কল্পনা করি। দার্শনিক বার্গসঁ কালকে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। কালের এই ধারণা গ্রহণ করলে জিনোর সমস্যা উঠতেই পারে না।

দেশ ও কাল অনন্ত বিভাজ্য নয় বলে কাণ্ট দেশ ও কালের অনন্তবিভাজ্যতা প্রসঙ্গে যে অ্যাণ্টিনমির কথা বলেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। তবে কাণ্ট দেশ ও কালের অসীম বিস্তৃতি প্রসঙ্গে যে অ্যাণ্টিনমির কথা বলেছেন তার সমাধান আবশ্যক। এই বিষয়ে এ. সি. ইউইং যা বলেছেন তা আমাদের সঙ্গত বলেই মনে হয়। তিনি বলেন দেশ ও কালের অসীম বিস্তৃতি বাস্তবতার দিক্ থেকে না দেখে সম্ভাব্যতার দিক থেকে দেখতে হবে। যে কোন খণ্ড দেশ বা কালেই অসীমতার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু বাস্তব অসীমতা নেই। এইভাবে দেখলে অসীমতার সমস্যা সহজেই দূর করা যায়। আমরা যখন ক্রমাগত গুণে চলি তখন অসীম সংখ্যা বস্তুতঃই গুনেছি, এমন নয়, তবে সীমাহীনভাবে গুণে চলার সম্ভাবনা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। এইভাবেই 'অসীম' শব্দটি গ্রহণ করতে হবে (A. C. Ewing : The Fundamental Questions of Philosphy, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক কালে ব্রেড্লিও দেশ ও কালের ধারণার মধ্যে নানারকম স্ববিরোধ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একদিক থেকে দেশ ও কাল সম্পর্ক মাত্র নয়, আবার অন্যদিক থেকে দেশ ও কাল সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছুই হ'তে পারে না। একই সঙ্গে দেশ ও কাল সম্পর্ক ও সম্পর্ক নয় হ'তে পারে না। সুতরাং ব্রেড্লির মতে দেশ ও কাল আভাস মাত্র (appearance), এদের আত্যন্তিক সত্তা নেই।

এখন ব্রেড্লির বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক্।

(ক) দেশ একটা সম্পর্ক মাত্র নয়

সম্পর্কিত হওয়ার মত দুটো বস্তু না থাকলে কখনও সম্পর্ক হয় না। দেশ বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ নিয়েই গড়ে উঠেছে। এই বিস্তৃত অংশগুলো একান্তভাবেই নিরেট (solid), কখনই সম্পর্ক মাত্র নয়। ডান বাম প্রভৃতি দৈশিক সম্পর্ক বিভিন্ন

দেশকেই সম্পর্কিত করে। এই বিভিন্ন দেশগুলো সম্পর্কমাত্র নয়। দেশ যদি শুধু একটা সম্পর্ক হ'ত তবে সম্পর্কিত বস্তু ছাড়াই এই সম্পর্ক ভাবতে হ'ত। যখনই সম্পর্কিত বস্তুগুলো গ্রহণ করা হয় তখনই বোঝা যায় দেশ কখনও কতকগুলো সম্পর্কের সম্পর্কমাত্র হতে পারে না। দেশ সম্পর্কমাত্র নয়।

(খ) দেশ একটা সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না

যে কোন দেশই কতকগুলো অংশের সমষ্টি হবে। যদি এই অংশগুলো দেশ না হয় তবে অংশের সমষ্টি কখনই দেশ হতে পারে না। দেশের অংশ বিস্তৃতই হবে। যদি তা বিস্তৃত হয়, তা'হলে আবার তার অংশ থাকবে, এই অংশের আবার অংশ থাকবে ; এমনি করে শেষাংশ আর কখনই পাওয়া যাবে না। যে কোন বিস্তৃত জিনিসই একটা সমষ্টি। এই সমষ্টি আবার কতগুলো বিস্তৃতিরই সম্পর্ক। এই বিস্তৃতিগুলোও আবার কতগুলো বিস্তৃতির সম্পর্ক। এমনি করে বিস্তৃতির অনন্ত সম্পর্কই পাওয়া যাবে।

অনুরূপ ভাবে যুক্তি করেই ব্রেড্‌লি দেখিয়েছেন যে, কাল একটা সম্পর্কমাত্র নয় আবার তা সম্পর্ক ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে না। সুতরাং দেশের মত কালও স্ববিরোধযুক্ত বলে সত্য নয়, আভাস মাত্র। অবশ্য ব্রেড্‌লি মনে করেন, এই সমস্ত আভাসই পরমতত্ত্ব ও পরম সত্য পরব্রহ্মের কোলে স্থান পায়। ব্রেড্‌লির পরব্রহ্ম (Absolute) কিছুই প্রত্যাখ্যান করে না, সবই নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। **তাই ব্রেড্‌লির মতে দেশ ও কাল দেশকালোত্তীর্ণ পরব্রহ্মের আভাস মাত্র।** (Space and Time are the appearances of a Reality which is spaceless and timeless.)

সমালোচনা :—আমাদের মনে হয়, ব্রেড্‌লি দেশ ও কালকে কতগুলো অংশের সমষ্টি মনে করেছেন বলে নানা রকমের জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসলে দেশ ও কাল কতগুলো অংশের সমষ্টিমাত্র নয়। দেশ ও কাল নিরংশ। দেশ ও কালের এই ধারণা নিলে ব্রেড্‌লির সমস্যা অন্তর্হিত হয়।[১]

১। ব্রেড্‌লি আত্যন্তিক সত্তা বা পরব্রহ্মর প্রকৃতি একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর মতে আত্যন্তিক সত্তা এক অসীম অভিজ্ঞতা (Infinite experience) ; আন্তর বিভাগ সত্ত্বেও ব্যক্তির মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় আত্যন্তিক সত্তায় তা বর্তমান বলে তাকে ব্যক্তি (Individual) বলে উল্লেখ করা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান দেশ-কালাপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করে দেশ-কালের সত্তা অস্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দার্শনিক আলেকজেণ্ডার দেশ-কালকেই ত আত্যন্তিক সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন।

আত্যন্তিক সত্তাকে এই অর্থে গ্রহণ করলে প্রত্যক্ষগত দেশ ও কালের আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করা যায় না ; কারণ এরা সসীম অভিজ্ঞতার 'এখানে' এবং 'এখন' (Here and Now)-এর সঙ্গে যুক্ত ; আবার সামান্যধারণাগত দেশ ও কালেরও আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করা যায় না, কারণ এদের আন্তর বিভাগের কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং এরা ব্যক্তি নয়।

ব্রেড্‌লি আরও বলেন, দেশ ও কালকে আত্যন্তিক সত্তাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করলে গুণ এবং সম্বন্ধের অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। এই অনবস্থা দোষ থেকেই দেশ ও কালের অসীম বিস্তৃতি ও অনন্ত বিভাজ্যতার অ্যাণ্টিনমির উদ্ভব হয়। সুতরাং দেশ ও কালের আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য A. E. Taylor বিরচিত Elements of Metaphysics গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ অধ্যায় (Book III, chapter IV) দ্রষ্টব্য।

ব্রেড্‌লি আত্যন্তিক সত্তার প্রকৃতি যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে না বুঝলে প্রত্যক্ষগত ও সামান্যধারণাগত দেশ ও কাল সম্বন্ধে ব্রেড্‌লির মত গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। গুণ এবং সম্ব ে র অনবস্থা প্রসঙ্গে ব্রেড্‌লি যা বলেন তার ভিত্তি দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট মতবাদ। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই মত খণ্ডন করব। দেশ ও কাল প্রসঙ্গে যে অ্যাণ্টিনমির উদ্ভব হয় তার সমাধান আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

সপ্তম অধ্যায়

দ্রব্য ও কারণ

(Substance and Cause)

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্য ঃ

সাধারণতঃ লোকে জগৎটাকে কতগুলো পরস্পরনিরপেক্ষ বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করে। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সবই পরস্পরনিরপেক্ষ বস্তু। এই জাতীয় প্রত্যেক বস্তুতেই রূপ, রস, গন্ধ, আকার, আয়তন ঘনত্ব প্রভৃতি গুণের মধ্যে কতগুলো গুন নিশ্চয়ই থাকে। বিভিন্ন গুণের আধার বস্তুগুলিকে সাধারণতঃ দ্রব্য বলা হয়।

এই সমস্ত দ্রব্য শত পরিবর্তনের মধ্যেও কম-বেশী অপরিবর্তিত থাকে। টেবিলের রঙ্ চটে যেতে পারে, নানা রকমের অত্যাচারের ফলে টেবিলের স্বাভাবিক আকার বিকৃত হতে পারে; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও লোকে টেবিলকে টেবিলই বলবে। একজন লোক বেড়িয়ে এসে ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। বেড়ানো আর শোওয়া—নিশ্চয়ই দুটি ভিন্ন অবস্থা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির যে দুটি ভিন্ন অবস্থা, তা স্বীকার করতে হয়। অবস্থার পরিবর্তনে ব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয়নি। শত পরিবর্তনের মধ্যে যা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে তারই নাম দ্রব্য।

অপরিবর্তিত থাকে বলে দ্রব্যকে ক্রিয়াশীলতার উৎস বলা যেতে পারে। অপরিবর্তিত দ্রব্য আছে বলেই পরিবর্তন সম্ভব। পরিবর্তনের কখনও পরিবর্তন হয় না। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রব্য গুন ও কর্মের আশ্রয়। বস্তুর ঐক্য এবং স্থায়িত্ব ব্যাখ্যার জন্য দ্রব্য স্বীকার করা হয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্যকে গুণের আধার বলা হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল—দ্রব্যের সঙ্গে গুণের এই সম্বন্ধ কি যুক্তিগ্রাহ্য? চিনি বলতে তার মিষ্টত্ব, শ্বেতত্ব প্রভৃতি গুণের সমষ্টি ছাড়াও আর একটু কিছু বুঝি। এই 'আর একটু কিছু' হচ্ছে সেই জিনিস যার এই সব গুণগুলো আছে। এরই নাম দ্রব্য। কিন্তু, চিনির সমস্ত গুণ বাদ দিলে ত' আর কিছুই থাকে না। তবে গুণের আধার দ্রব্য কোথায়?

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তাতে অসুবিধে আছে বলেই নানা রকমের দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা দ্রব্যের

এক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে দ্রব্যের রূপ অন্য রকমের। কাণ্ট দ্রব্যের অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়ে হেগেলের মত একটু অন্য রকমের। আমরা এখন এই সব বিভিন্ন মত আলোচনা করব।

বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্য

বুদ্ধিবাদীদের মতে যা স্বনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ স্থিতিসম্পন্ন তার নাম দ্রব্য। অন্যনিরপেক্ষতা দ্রব্যের স্বরূপ। গুণ দ্রব্যের ওপরই নির্ভরশীল। দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। সুতরাং গুণ দ্রব্য নয়। গুণ দ্রব্যে আশ্রিত এবং দ্রব্য গুণের আশ্রয়।

ডেকার্টে মনে করেন, ঈশ্বর, মন ও জড়—এই তিনটিই দ্রব্য। মন ও জড় ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ ঈশ্বরই এদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মন ও জড় কি করে ঈশ্বরসাপেক্ষ হয়েও দ্রব্য হয়—তা বোঝা গেল না। ডেকার্টের মতে অন্যনিরপেক্ষতাই দ্রব্যের স্বরূপ। এই লক্ষণ অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরই দ্রব্য হতে পারে, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই কারও ওপরই নির্ভরশীল নয়। ডেকার্টের দ্রব্যের সংজ্ঞা থেকে স্পিনোজা এই সিদ্ধান্তই করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। মন ও জড় ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে পরিচিত দুটি গুণ। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ও সত্তা। অন্য সমস্তই ঈশ্বরের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। এইভাবে স্পিনোজা বিশ্বের চরম সত্তা অস্বীকার করলেন। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। কিন্তু মানুষ এরকম দর্শনে তৃপ্ত রইল না। যেখানে দার্শনিকের ব্যক্তিত্বই নেই সেখানে তাঁর কথার মূল্য কি? বিশেষতঃ সত্য যদি এক পূর্ণ ও অনন্ত দ্রব্য হয় তবে ত' কোন পরিবর্তন ও গতিই সম্ভব নয়। এক পূর্ণ তত্ত্বের কখনও পরিবর্তন হয় না, কারণ পরিবর্তন হ'লে পূর্ণ আর পূর্ণ থাকে না। যা অনন্ত তারও পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হ'লে অনন্তের যে অন্ত হয়। কিন্তু দুনিয়ায় পরিবর্তন ত' প্রতিনিয়তই দেখা যায়। সুতরাং এই পরিবর্তন অস্বীকার করলে চলবে কেন?

সেজন্য লাইব্‌নিজ্‌ দ্রব্যের সংজ্ঞাই বদলে দিলেন। তাঁর মতে অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে থাকতে পারাই দ্রব্যের লক্ষণ নয়, অন্যনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারাই দ্রব্যের স্বরূপ। এই অর্থে দ্রব্য এক নয়, বহু। বহু দ্রব্যই একসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। লাইব্‌নিজ্‌ এই দ্রব্যের নাম দিয়েছেন 'চিৎপরমাণু'[১]।

১। Monad

চিৎপরমাণু অবিভাজ্য। যে-কোন জড়াত্মক বস্তুই বিভাজ্য। সেজন্য লাইব্‌নিজের 'চিৎপরমাণু' জড়াত্মক নয়, চেতন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, অন্যনিরপেক্ষতা বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্যের স্বরূপ। তবে অন্যনিরপেক্ষতা কোন কোন বুদ্ধিবাদীদের মতে অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং কোন কোন বুদ্ধিবাদীদের মতে অন্যনিরপেক্ষ কর্মক্ষমতা বোঝায়।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে দ্রব্য

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জানার একমাত্র উপায়। অভিজ্ঞতা দুই দিক থেকে হ'তে পারে—সংবেদনের দিক[১] আর অন্তর্দর্শনের দিক।[২] সংবেদনের দিক থেকে বাইরের বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তর্দর্শনে মানসিক অবস্থার জ্ঞান হয়।

সংবেদনের সাহায্যে আমরা বস্তুর গুণ জানতে পারি। গুণাতিরিক্ত কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় সংবেদনে পাওয়া যায় না। সুতরাং বস্তুর মধ্যে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই।

অন্তর্দর্শনে সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি কতগুলো মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং মনের দিক থেকেও দ্রব্য বলে কিছু নেই। ঈশ্বর নামে কোন অসীম দ্রব্যও নেই, কারণ সংবেদন বা অন্তর্দর্শন কোন ভাবেই এমন দ্রব্য জানা যায় না। যে কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীর পক্ষে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদী দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

জন লক গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখনই যে কোন বস্তু দেখি না কেন তখনই সোজাসুজি তার কতগুলো গুণ পাই। কিন্তু গুণগুলো ত' আর হাওয়ায় ভাসতে পারে না। এরা কোথাও না কোথাও থাকবে। লক এই সমস্ত গুণের আধার বা আশ্রয় হিসেবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই দ্রব্য কখনই জানা যায় না।

১। From Sensation

২। From Reflection

আমরা বস্তুর গুণই শুধু জানতে পারি। সে জন্যই লক দ্রব্যের নাম দিয়েছেন 'অজ্ঞাত তত্ত্ব'।[১]

সাধারণ লোকের মতই লক তিন জাতীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য ; সুখ দুঃখ প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে আত্মা ;[২] আর সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান হিসেবে ঈশ্বর—এই তিন জাতীয় দ্রব্য।

বার্কলি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বহির্বিশ্বে গুণ ছাড়া গুণের আধার হিসেবে কোন কিছু জানা যায় না। লকের "অজ্ঞাত তত্ত্ব" মানার কোন অর্থ নেই। যা জানি না তা আছে, এমন কথা বলা যায় না। কোন কিছু আছে বললে তার সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান সর্বদাই প্রকাশ পায়। সুতরাং 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' আছে, এমন কথা বলা যায় না।

বহির্বিশ্বে যদি কোন 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' না থাকে তবে অনুরূপ যুক্তিতে অন্তর রাজ্যেও আত্মা বলে কোন 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' থাকতে পারে না। কিন্তু বার্কলি সহজ যুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি বিভিন্ন ধারণার আধার হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, অনুভূতির[৩] মধ্য দিয়ে এই আত্মাকে জানা যায়। বার্কলি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন।

হিউম জড় দ্রব্য বা আত্মা কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বে যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ ছাড়া কোন অজ্ঞাত তত্ত্ব জানা যায় না, তেমনি আমাদের অন্তর-রাজ্যেও সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতগুলো মানসিক অবস্থা ছাড়া আত্মা বলে কোন অপরিবর্তিত তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং জড়দ্রব্য ও আত্মা বলে কিছুই নেই। হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে সংবেদন ও অন্তর্দর্শনই জ্ঞানলাভের দুই পথ। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঈশ্বর নেই।

আমরা আগেই দেখেছি, কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীই দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। হিউম একজন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে সমস্ত রকম দ্রব্যের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দুনিয়ায় পরিবর্তমান পরস্পর-অসংলগ্ন কতগুলো গুণই আছে ; গুণের আধার বলে কিছু নেই।

১। Know-not-what

২। জড় দ্রব্য—Physical substance ; আত্মা—Soul substance

৩। Notion

কাণ্টের মতে দ্রব্য ঃ

কাণ্ট মনে করেন, যদি আমরা কোন অপরিবর্তিত সত্তায় বিশ্বাস না করি তবে পরস্পর-অসংলগ্ন পরিবর্তমান গুণ কখনই জানা যায় না। এমন একটা 'জিনিস' থাকবেই যাকে অবলম্বন করে পরিবর্তমান গুণ বা অবস্থা থাকতে পারে। পরিবর্তন বোধগম্য করতে হ'লে এক অপরিবর্তিত সত্তায় বিশ্বাস করতে হয়। অপরিবর্তিত বলে কিছু না থাকলে পরিবর্তন হ'তে পারে না। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতায় কতগুলো পরিবর্তমান গুণই পাই। অপরিবর্তিত কোন সত্তা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। সুতরাং কাণ্ট মনে করেন, অপরিবর্তিত সত্তা বা দ্রব্য প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞানের আকারই হবে।[১] দ্রব্য জ্ঞানের একটা আকার। কোন প্রত্যক্ষের ওপরই তা নির্ভরশীল নয়। যখনই আমরা পরিবর্তমান গুণগুলোকে জানি তখনই এই জ্ঞানের আকার দিয়েই জানি। এই অপরিবর্তিত সত্তা বা দ্রব্যের মাধ্যমে জানি বলেই পরিবর্তমান গুণগুলোর পরিবর্তমানতার একটা অর্থ বোঝা যায়। দ্রব্য আমাদের মন-নিরপেক্ষ সত্তাসম্পন্ন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত পরিবর্তন দেখি তা অর্থপূর্ণ করার জন্য দ্রব্য একান্তভাবেই আবশ্যক। এই দ্রব্য জ্ঞানের আকার বিশেষ। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই দ্রব্যের সত্যতা স্বীকার করা যেতে পারে। দ্রব্যের জ্ঞাননিরপেক্ষ কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই।

কাণ্ট দ্রব্যের আত্যন্তিক সত্তা অস্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু-স্বরূপ[২] আছে। এই বস্তু-স্বরূপে দ্রব্যের কোন ব্যবহার হ'তে পারে না। একমাত্র জ্ঞানের বিষয়েই দ্রব্যের ব্যবহার হয়। জ্ঞানের বিষয় বস্তু-স্বরূপ নয়, অবভাস মাত্র[৩]। কাণ্ট জ্ঞানের বিষয় বা অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন, দ্রব্যের কোন বস্তু-স্বরূপগত সত্তা নেই।

হেগেল মনে করেন, অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে কোন আত্যন্তিক পার্থক্য নেই। মানব মন ও বস্তু-স্বরূপ উভয়ই এক পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার বস্তু-স্বরূপের আকারও বটে। মনের আকারে আকারিত অবভাস আর বস্তু-স্বরূপে কোন আত্যন্তিক ভেদ নেই। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার দ্রব্য বস্তু-স্বরূপেরও আকার বটে।

১। A-priori category of the Understanding
২। Thing-in-itself
৩। Phenomenon

দ্রব্য গুণের আধার মাত্র নয়। হেগেল মনে করেন, দ্রব্য ছাড়া যেমন গুণ থাকতে পারে না, গুণ ছাড়াও তেমনি দ্রব্য থাকতে পারে না। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রত্যেক বাস্তবতত্ত্বেরই অচ্ছেদ্য দুই দিক রয়েছে—এক সত্তার দিক আর একটা গুণের দিক। এদের একটা ছাড়া আর একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। দ্রব্য তার বিচিত্র ও পরিবর্তমান গুণের মধ্য দিয়ে নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। দ্রব্য ও গুণ সম্পূর্ণ একও নয়, আবার তারা সম্পূর্ণ পৃথকও নয়। আসলে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্য আছে। দ্রব্যের এই ঐক্য গুণের পার্থক্যের মধ্য দিয়েই বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়।

হেগেলের মতে সমস্ত গুণের পরিপূর্ণ ঐক্য যে দ্রব্যে বর্তমান তা-ই পরম দ্রব্য (Ultimate substance) এবং এই দ্রব্য ও পরব্রহ্ম (Ultimate Reality or Absolute) অভিন্ন। এই দ্রব্য এক ও অদ্বিতীয়। তবে ঐক্যের মাত্রাভেদ আছে। যে কোন কিছুতেই ঐক্য আছে তা-ই দ্রব্য তবে পরম দ্রব্য নয়। ঐক্যের মাত্রা যে দ্রব্যে যত বেশী সে দ্রব্য তত বেশী পরব্রহ্মের সন্নিকটবর্তী। ঐক্যের মাত্রা অনুসারে দ্রব্যের মাত্রাভেদ করা যায়। তবে পরমদ্রব্যের মাত্রা নেই।

আমাদের ধারণা—হেগেলের এই মতবাদই দ্রব্য সম্বন্ধে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ। দ্রব্যকে গুণের আধার বললে তার পরিচয় আমাদের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। দ্রব্যকে গুণাতিরিক্ত স্বনির্ভর সত্তা বললে গুণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার গুণগুলোই দ্রব্য বললে গুণগুলোর ঐক্য ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু যদি হেগেলের মত সত্তা ও গুণের সমষ্টিকেই দ্রব্য বলা হয় তবে কোন অসুবিধা হয় না। আমরা অভিজ্ঞতায় সত্তা ও গুণ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধই দেখতে পাই। বিচিত্র গুণের মধ্য দিয়েই সত্তার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা—একথাও স্বীকার করতে হয়। সুতরাং সব দিক থেকেই হেগেলের মতবাদ আমাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েকজন অত্যাধুনিক দার্শনিকের অভিমত

আমরা দেখেছি, গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে না। আবার দ্রব্য ছাড়াও গুণ থাকতে পারে না। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। দ্রব্য গুণের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। দ্রব্য যেমন গুণ ছাড়া থাকতে পারে না গুণও তেমনি দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না।

আধুনিক কালে ব্রেড্‌লি এই ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাঁর মতে—দ্রব্য ও গুণ এই আকারের সাহায্যে বস্তু-স্বরূপকে জানা যায় না। দ্রব্য ও গুণের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ আছে। যা স্ববিরোধযুক্ত তা কখনও সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কখনই বাস্তবতত্ত্ব হ'তে পারে না। 'আকাশ নীল' এই বচনে 'আকাশ' দ্রব্য আর 'নীল' গুণ। এই বচনে দ্রব্য যদি গুণ থেকে একান্ত পৃথক হয় তবে 'আকাশ নীল' একথা বলা যায় না। আর যদি তারা একান্ত অভিন্ন হয় তবে 'আকাশ নীল' একথা বলার কোন অর্থ হয় না। 'রাম রাম' এমন কথা কি কেউ বলে? হয় দ্রব্য ও গুণ এক হবে, না হয় ত এরা পৃথক হবে। কিন্তু যদি এই দুই সম্ভাবনার কোনটাই সম্ভব না হয়—তবে দ্রব্য ও গুণকে মিথ্যা ধারণাই বলতে হয়। আগেই দেখান হয়েছে দ্রব্য গুণ থেকে পৃথকও হ'তে পারে না, আবার তা একও হ'তে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কোন বাস্তবতত্ত্ব হ'তে পারে না। এরা প্রকাশ বা আভাসমাত্র।[১] অবশ্য ব্রেড্‌লির মতে সমস্ত আভাসই শেষ পর্যন্ত চরমতত্ত্ব পরব্রহ্মের কোলে ঠাঁই পায়। পরব্রহ্ম কিছুই মিথ্যা বা তুচ্ছ বলে প্রত্যাখ্যান করেন না। পূর্ণের প্রসাদে সকল অপূর্ণেরই পূর্ণের মধ্যে একপ্রকার সদ্‌গতি হয়।

ব্রেড্‌লির এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে দুটো কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে।

প্রথমতঃ—দ্রব্য ও গুণ যদি মিথ্যা বা আভাসমাত্র হয়, তবে তা চরমতত্ত্ব পরব্রহ্মের মধ্যে স্থান পায় কি করে? সত্যের মধ্যে কি মিথ্যা থাকতে পারে? ব্রেড্‌লির মতে পরব্রহ্ম সৎ ও সত্য। এই পরব্রহ্মের মধ্যে কি ভাবে দ্রব্য ও গুণের মত মিথ্যা বস্তুর স্থান হ'তে পারে—তা আমরা বুঝি না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রেড্‌লি মনে করেছেন, দ্রব্য ও গুণ হয় এক হবে না হয় ত তারা একন্তভাবেই পৃথক হবে। এই দুই সম্ভাবনা ছাড়া ব্রেড্‌লি তৃতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা দ্রব্য ও গুণের যে সম্পর্ক স্বীকার করেছি তাতে এই তৃতীয় সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আমাদের মতে দ্রব্য ও গুণ একান্তভাবে একও নয়, আবার তারা একান্তভাবে পৃথকও নয়। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্য আছে। গুণের বৈচিত্র্যের মধ্যেই দ্রব্যের

১। Appearance

ঐক্য সম্যকভাবে বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণের এই সম্পর্ক স্বীকার করলে ব্রেড্লির মতবাদ গ্রাহ্য হ'তে পারে না।*

আলেকজেণ্ডারের মতে দেশ-কাল[১] বা শুদ্ধ গতিই[২] পৃথিবীর আদিম উপাদান। এই দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই শুদ্ধগতির কোন না কোন পরিণতি বিশেষ। গতিই জাগতিক সমস্ত বস্তুর যথার্থ সত্তা। সুতরাং কোন বস্তুই একেবারে গতিহীন হ'তে পারে না। তবে নিজ সীমার মধ্যে বস্তু যে তার কাঠামো কম বেশী বজায় রেখে চলে তাকেই দ্রব্য বলা যেতে পারে। যে কোন বস্তুকে দু'টি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে—একটা হ'ল স্থিতির দিক, আর একটা হ'ল গতির দিক। বস্তুকে যখন স্থিতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম দ্রব্য, আর যখন গতির দিক থেকে দেখি তখন তা কারণ।

রাসেলের মতে দ্রব্য নামক আকার সাধারণ জ্ঞানের আলোচ্য 'বস্তু'[৩] নামক ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, চিরস্থায়ী বস্তু বলে কিছু নেই। আধুনিক কালে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই এই চিরস্থায়ী দ্রব্যের ধারণা অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করেছে। তাঁর মতে বিশ্বের সরলতম উপাদান[৪] হচ্ছে ঘটনা[৫]। ঘটনাই বিশ্বের সমস্ত বস্তুর একমাত্র একক। সমস্ত বস্তুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। দুনিয়ায় অপরিবর্তিত সত্তা বলে কিছু নেই। যাকে আমরা বহির্বিশ্বে বস্তু নামে অভিহিত করি তা কতগুলো ঘটনার সমাহার (a certain string of events) মাত্র। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে স্বীকৃত দেশকালাপেক্ষিকতাবাদ এবং পরমাণুবাদ তাঁকে এইরূপ চিন্তায় বাধ্য করেছে। আত্মা বলে যে কোন স্থির দ্রব্য নেই, এ বিষয়ে হিউমের যে মত তা রাসেলও গ্রহণ করেছেন।[৬]

---

*ব্রেড্লি দ্রব্য, গুণ এবং সম্বন্ধ (Substance, quality and relation) বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তা বিস্তৃতভাবে 'Appearance and Reality' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা A. E. Taylor. বিরচিত 'Elements of Metaphysics' গ্রন্থের Book II Chapter II তে দ্রষ্টব্য।

১। Space-Time
২। Pure Motion
৩। Object
৪। Simplest elements
৫। Events
৬। রাসেলের মতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনার জন্য Library of Living Philosophers Series-এ Philosophy of Bertrand Russel গ্রন্থের Metaphysics of Bertrand Russell প্রবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য।

রাসেলের বন্ধু হোয়াইটহেড[১]ও ঘটনার অস্তিত্বই স্বীকার করেন। তিনি ঘটনার প্রবাহের কথা বলে তাদের পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধের কথা বলেন। দ্রব্যের তাত্ত্বিক সত্তা (metaphysical reality) তিনি স্বীকার করেন না। তবে তিনি দ্রব্য স্বীকারের ব্যবহারিক প্রয়োজন স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দ্রব্যের ভিত্তিতে বস্তুর প্রতিভাত স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

আধুনিক কালের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক যাঁরা লজিক্যাল পজিটিভিষ্ট নামে খ্যাত তাঁরা হিউমের মতই দ্রব্য স্বীকার করেন না[২]। তাঁদের মতে দ্রব্য একটি অর্থহীন শব্দ, কারণ, দ্রব্য শব্দের দ্বারা অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করা যায় এমন কিছুই বোঝায় না।

মন্তব্য : আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত মত প্রচার করেছে তাতে একেবারে গতিহীন, সম্পূর্ণ স্থির কোন দ্রব্য স্বীকার করা যায় না। তবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কম বেশী অপরিবর্তিত দ্রব্যের কথা আমরা ভাবতে পারি। আমরা এই অর্থেই 'দ্রব্য' গ্রহণ করেছি। তা ছাড়া বস্তুর ঐক্য ব্যাখ্যার জন্য জ্ঞানের আকার রূপে দ্রব্য স্বীকার না করে দার্শনিকের উপায় কি ? আমাদের মনে হয়, হিউম যে অর্থে দ্রব্য অস্বীকার করেছেন সে অর্থেই আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অনেক দার্শনিক 'দ্রব্য' বর্জন করেছেন। কিন্তু সেই অর্থে 'দ্রব্য' গ্রহণ না করে আমরা এই অধ্যায়ে দ্রব্য বলতে যা বুঝেছি সেই অর্থে 'দ্রব্য' গ্রহণ করলে তাও বর্জনীয় কি ? এই বিষয়ে খোলা মনে স্থির মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

দ্রব্যের ধারণার উৎপত্তি :

সাধারণ লোক মনে করে, দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই লাভ করা যায়। জড় দ্রব্য বহিঃপ্রত্যক্ষের মধ্য দিয়েই জানা যায়। আন্তরপ্রত্যক্ষ আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে আমরা কোন দ্রব্যই পাই না। প্রত্যক্ষে কতগুলো গুণের পরিচয়ই পাওয়া যায়। গুণাতিরিক্ত কোন চিরস্থায়ী দ্রব্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। অভিজ্ঞতা-বাদীরা একথা ঠিকই বলেছেন। অবশ্য লক অভিজ্ঞতাবাদী হয়েও জড়দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে তিনি যে যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদী

১। Process and Realiy গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

২। Hospers : An Introduction to Philosophical Analysis গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

দার্শনিক ছিলেন না—একথা সবাই স্বীকার করে। হিউম সমস্ত রকম দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তিনিই সত্যিকারের স্ববিরোধ-বিমুক্ত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে দ্রব্যের ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান থেকেই লাভ করেছিলেন। আমরা এখন এই ধারণা বংশানুক্রমে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে থাকি। আমাদের পক্ষে দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষনির্ভর নয় এই ধারণা সহজাতই বটে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে কোন দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রত্যক্ষ থেকেই দ্রব্যের ধারণা লাভ করেছিলেন—একথা মানা যায় না।

অপরোক্ষানুভূতিবাদীদের[১] ধারণা, আমরা আত্মসচেতনতার[২] মধ্যে সোজাসুজি দ্রব্যের ধারণা লাভ করি। আমরা যখনই আত্মসচেতন হই, তখনই বুঝি আমাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী আত্মা আছে। নিজেদের আত্মার চিরস্থায়িত্ব বুঝতে পেরে প্রকৃতিতেও কোন কোন চিরস্থায়ী বস্তু আছে, এমন কথা আমাদের মনে হয়।

হিউম মনে করেন, অন্তর্দর্শনের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী আত্মারই পরিচয় পাওয়া যায় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতগুলো পরিবর্তমান মানসিক গুণই অন্তর্দর্শনে লাভ করা যায়। সুতরাং অপরোক্ষানুভূতিবাদীরা যে বলেন, আত্ম-সচেতনতায় চিরস্থায়ী আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথা মানা যায় না।

পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দ্রব্যের ধারণা কোন রকমের প্রত্যক্ষ থেকেই লাভ করা যায় না। **কাণ্টও** একথার সত্যতা স্বীকার করেন। তাঁর মতে দ্রব্যের ধারণা অভিজ্ঞতার প্রাক্‌সিদ্ধ আকার।[৩] অপরিবর্তিত দ্রব্যের ধারণা না থাকলে অভিজ্ঞতায় পরিবর্তমান যে সমস্ত গুণ পাই তা বোধগম্য হয় না। অপরিবর্তিত কিছু থাকলেই পরিবর্তন বোঝা যায়। সুতরাং কাণ্টের মতে দ্রব্য প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞানের আকার বিশেষ। এই আকার প্রত্যেক মানুষের মনেই থাকে। জ্ঞানের সময় এই আকারের ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং কাণ্টের মতে দ্রব্য মনের এক আকার বিশেষ।

১। Intuitionists
২। Self-consciousness
৩। A-priori category

হেগেল বলেন, মনের আকার বস্তুরও আকার ; কারণ, মন ও বস্তু একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং দ্রব্য শুধু জ্ঞানের বিষয়ের পক্ষেই সত্য নয়, দ্রব্য বস্তুস্বরূপের পক্ষেও সত্য।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তই করব যে, দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। দ্রব্যের ধারণা প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। তবে এই ধারণা শুধু মনের আকার নয়, বস্তুস্বরূপেরও আকার।

কারণ (Cause)

জাগতিক সমস্ত বস্তু ও ঘটনা পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। কতগুলো ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বা ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক সাধারণ সংযোগ সম্পর্ক মাত্র। আমাদের প্রতক্ষ্যজ্ঞানে যত কাক দেখেছি, সবই কালো। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন একটা সাদা কাক দেখব না এমন কথা বলা যায় না। কাকের সঙ্গে কালো রঙের সম্পর্ক সাধারণ সংযোগ সম্পর্ক মাত্র। আকাশে ধূমকেতু উঠলো— রাজা মারা গেলেন। আকাশের ধূমকেতুর সঙ্গে রাজার মৃত্যুর সম্পর্ক একান্তভাবেই আকস্মিক। আকাশে ধূমকেতু দেখা দেওয়া সত্ত্বেও রাজা মারা না গেলে আমরা আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু আগুনের সামনে ঘি রাখলে যদি তা না গলে তবে সত্যিই আশ্চর্য হই। বৃষ্টি হ'ল অথচ মাটি ভিজল না—এমন ভোজবাজি কখনই সত্য হ'তে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় যতবার বৃষ্টি হ'তে দেখেছি, ততবারই ত' মাটি ভিজেছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে বৃষ্টি হ'লেও মাটি ভিজবে। আগুন পোড়ায়, জল তেষ্টা মেটায়—এই জাতীয় ব্যতিক্রমহীন পারস্পরিক সম্পর্কও প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাওয়া যায়। এই রকম ব্যতিক্রমহীন অপরিবর্তনীয় সম্পর্কগুলোকে সাধারণ সম্পর্ক বলা যায় না। এই সম্পর্কের নাম কার্যকারণ সম্পর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—কার্যই বা কি আর কারণই বা কি ? উত্তরে বলা যায়— যার জন্য কিছু ঘটে তার নাম কারণ আর যা ঘটে তাই কার্য। "আগুন পোড়ায়"—এই জ্ঞানে আগুন কারণ আর পোড়ানো তার কার্য।

বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কখনও কখনও বলা হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করে না, তার অর্থ এই যে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিষয়ে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আধুনিক বিজ্ঞান মানে না। সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞান এক অর্থে কার্য-কারণ সম্বন্ধ কখনই পরিত্যাগ করতে পারে না। জ্ঞাত বিষয়

থেকে অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করা যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দরকার তেমনি দরকার সাধারণ মানুষের জীবনে। এই অনুমান না করা গেলে বিজ্ঞান ও জীবন দুই-ই অচল। কার্য-কারন-সম্বন্ধ আর যা-ই বোঝাক না কেন, তা জ্ঞাত ক্ষেত্রে যা ঘটেছে অজ্ঞাত ক্ষেত্রেও তা ঘটবে, এমন অনুমান যে করা যায় তা বোঝায়। এইরূপ অনুমান না করতে পারলে জীবনে কোন পরিকল্পনাই করা যায় না, বিজ্ঞানে সামান্যীকরণ (Generalisation) সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আরোহানুমানের ভিত্তি আর সাধারণ জীবনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা একমাত্র কার্য-কারন-সম্বন্ধের সাহায্যেই করা যায়।

তা ছাড়া জগতে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখতে পাই তার ব্যাখ্যা একমাত্র কারণের সাহায্যেই দেওয়া যায়। সুতরাং পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য ও কারণের প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়।

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তা কার্য ও কারণের স্বরূপ ও তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাথমিক কথা মাত্র। বিভিন্ন দার্শনিকেরা কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে, কার্য-কারণ সম্পর্ক যত সহজ বলে মনে হচ্ছে আসলে তা তত সহজ নয়। আমরা এই কার্য-কারণ সম্পর্কের স্বরূপ বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে 'কারণ' একটি শক্তি

(The theory of Cause as Power or the Activity theory of Cause)

সাধারণ লোক কারণ বলতে শক্তি[১] বোঝে। যা সক্রিয়ভাবে কার্য উৎপন্ন করে তারই নাম কারণ। কারণ যেন একটা শক্তির ব্যবহার করে, আর তার ফলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। দার্শনিক জন লকও এই অর্থেই 'কারন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধারণ লোকের মত তিনিও মনে করেন, কারণ কার্যোৎপাদনের শক্তিবিশেষ। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যখন কোন কাজ করি তখন আমাদের শক্তির ব্যবহার করতে হয়। নিষ্ক্রিয়ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে কোন কাজই হয় না। অনুরূপভাবে সাধারণ লোক মনে করে, বাইরের জগতেও কার্য উৎপন্ন করতে শক্তির দরকার হয়। সুতরাং শক্তিই

১। Power

কারণ। কার্য-কারণের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক ও সার্বত্রিক[১] সম্পর্ক রয়েছে। একটি বিশেষ কারণই চিরকাল একটি বিশেষ কার্যকে উৎপন্ন করতে পারে। ঘি আগুনের কাছে রাখলে তা গলবেই—জমবে না।

দার্শনিকদের মধ্যে লক, বার্কলি প্রভৃতি যাঁরা কারণকে শক্তি বলে মনে করেন তাঁরা হয় জড় বস্তুকে প্রাথমিক কারণ বলে মন বা আত্মাকেই বলেন আত্যন্তিক কারণ এবং শেষ পর্যন্ত চরম কারণ বলেন ঈশ্বরকে (যেমন লক), অথবা ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত কারণ রূপে জীবাত্মা এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার নিমিত্ত কারণ রূপে ঈশ্বর (যেমন বার্কলি) স্বীকার করেন। অর্থাৎ, কারণবাদ ঈশ্বরবাদে পর্যবসিত হয়। অবশ্য এমন কিছু দার্শনিকও আছেন যাঁরা কারণকে শক্তি বলে মনে করে যে কোন কারণই সম্পূর্ণ সচেতন বস্তু না হলেও অন্ততঃ অর্ধচেতন হবে, এমন কথা বলেন। এঁদের ক্ষেত্রে কারণবাদ ঈশ্বরবাদে পর্যবসিত না হলেও সর্বচেতনবাদ (Panpsychism)-এ পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ, কারণকে শক্তি বললে হয় ঈশ্বরবাদ নয়ত সর্বচেতনবাদ মানতে হয়। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা স্টাউট-বিরচিত 'মাইণ্ড অ্যাণ্ড ম্যাটার' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (Book I) দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

কারণ সম্বন্ধে শক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমাদের কার্যের কারণ শক্তি বলে উপলব্ধি করলেও সর্বত্রই কারণ শক্তি হবে, এমন মনে করার ভিত্তি কি? সাদৃশ্যানুমান যদি ভিত্তি হয় তবে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না, কারণ সাদৃশ্যানুমান কিছুই প্রমাণ করতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি[২] কি করে অন্য এক দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির রূপ গ্রহণ করে, তাই কার্য-কারণ সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে কার্যের অব্যবহিত পূর্বে উৎপন্ন শক্তিকে 'কারণ' বলা হয়। এই শক্তির জন্য অন্য যে সমস্ত উপকরণের অপেক্ষা আছে তা সাধারণ লোকে কারণের আওতায় ফেলে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ও এই শক্তি যে সমস্ত উপকরণের অপেক্ষা করে তাদের সমস্তই 'কারণ' শব্দে বোঝান।

১। Universal and necessary

২। Energy

আরিস্টটলের মতে 'কারণ'

প্রাচীন গ্রীস দেশের দার্শনিক আরিস্টটল 'কারণ'-এর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কোন একটি কার্যের উৎপত্তি আমরা চার রকম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কার্যকে দেখার সময় তার কারণকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়। আরিস্টটল মনে করেন, একটি কার্যের চতুর্বিধ কারণ থাকতে পারে। আরিস্টটল এই চতুর্বিধ কারণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মার্বেল পাথর থেকে মার্বেলের প্রতিমূর্তি নির্মাণরূপ কার্যটি গ্রহণ করেছেন। আরিস্টটল মনে করেন, প্রত্যেক কার্যেরই উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, আকার কারণ ও উদ্দেশ্য কারণ[১]—এই চতুর্বিধ কারন আছে। উদ্ধৃত উদাহরণে যে মার্বেল পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মিত হয়েছে তার নাম উপাদান কারণ। শিল্পী মূর্তি নির্মাণের জন্য যে শক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন তা মূর্তি নির্মাণরূপ কার্যের নিমিত্ত কারণ। শিল্পী মূর্তির যে আকার মনে মনে ঠিক করে সেই আকার অনুসারে মূর্তি গড়েছেন, তার নাম আকার কারণ। আর সর্বশেষে মূর্তি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত হয়েছে তার নাম উদ্দেশ্য কারণ। পরবর্তী কালে আরিস্টটল নিমিত্ত কারণকে উপাদান কারণের ও উদ্দেশ্য কারণকে আকার কারণের অন্তর্ভূক্ত করে উপাদান কারণ ও আকার কারণ—এই দুই জাতের কারণেরই মৌলিকতা স্বীকার করেছেন। একটি কার্যের কারণ কত রকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তার চরম নিদর্শন দার্শনিক আরিস্টটলের এই মতবাদ থেকে বোঝা যায়। দার্শনিক বিচারে আরিস্টটলের এই মত সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মত—কারণের নিয়ত পূর্ববর্তিতা
(The Regularity theory of cause)

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে সংবেদন ও অন্তর্দর্শন জ্ঞানলাভের দুই পথ। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনে যা না পাওয়া যায় তা আছে বলে বলা যায় না। আরিস্টটলের আকার কারণ বা উদ্দেশ্য কারণ সংবেদন বা অন্তর্দর্শনে পাওয়া যায় না। সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীদের ধারণা, আকার কারণ বা উদ্দেশ্য কারণ বলে কিছু নেই।

১। উপাদান কারণ—Material cause, নিমিত্ত কারণ—Efficient Cause, আকার কারণ—Formal Cause, উদ্দেশ্য কারণ—Teleological or Final Cause.

অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন, কোন ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ বলা যায়। কারণ সব সময়েই কার্যের আগে থাকে। নিয়ত পূর্ববর্তিতা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক কার্যকারণের মধ্যে নেই। এই মতবাদের নাম কারণের নিয়ত পূর্ববর্তিতা মত (The Regularity theory of cause)।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে, কার্য ও কারণের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক[১] আছে। কারণ কার্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে বিষয়গত কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের[২] প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক নেই। দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। দুধ খাওয়া ও স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একথা বলার অর্থ এই যে, অতীতে আমরা দুধ খাওয়ার পর স্বাস্থ্য ভাল হতে দেখেছি, ভবিষ্যতেও আশা করি দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হবে। কিন্তু দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই এমন কথা নিশ্চিত ক'রে বলার মত দুধ ও স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না।

দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের কারণতত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কার্য-কারণ সম্পর্কের স্বরূপ কি, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হিউমের কারণতত্ত্বে পাওয়া যায়। আমরা এখন হিউমের কারণতত্ত্ব আলোচনা করব এবং তাতেই অভিজ্ঞতাবাদীদের কারণের নিয়তপূর্ববর্তিতা মত আলোচনা করা হবে।

হিউমের কারণতত্ত্ব

হিউমের মতে সংবেদন ও ধারণা[৩] ছাড়া কোন কিছুই সত্য হ'তে পারে না। ধারণা সংবেদন বা মুদ্রণেরই অস্পষ্ট রূপ মাত্র। সুতরাং সংবেদন বা মুদ্রণই একমাত্র সত্য। যার সংবেদন হয় না তার সত্যতাও স্বীকার করা যায় না। অভিজ্ঞতায় সংবেদনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েই আসে। এই বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলোকে সমাবেশের নিয়মে[৪] নিয়মিত ক'রেই আমরা বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। কার্য-কারণ সম্পর্ক সমাবেশের একটি নিয়ম। আমাদের জীবনে ও সমস্ত বৈজ্ঞানিক

১। Necessary Connection

২। বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক=Objective necessary connection.

৩। Impression and Idea

৪। Laws of Association

আলোচনায় কার্য-কারণ সম্পর্কের বিশেষ ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কের কোন তাত্ত্বিক তাৎপর্য নেই।

কার্যকারণ সম্পর্কের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, দর্শনের ইতিহাসে তা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আমরা এখন হিউমের এই অভিমতই আলোচনা করব।

হিউম বলেছেন, কার্য-কারণ সম্পর্কের তিনটি বিভিন্ন দিক আছে। একদিক থেকে মনে হয়, কারণ ও কার্যের মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য[১] আছে। কার্য কারণের পরেই ঘটে। অন্যদিক থেকে কার্য ও কারণ পাশাপাশি[২] থাকে। যখনই কার্য দেখি তখনই কারণও দেখি। আবার অন্যদিকে মনে হয়, কার্য ও কারণের মধ্যে যেন একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক[৩] আছে। একই কারণ চিরকাল একই কার্য নিশ্চিতভাবেই উৎপন্ন করবে এমন ধারণা আমরা সর্বদাই পোষণ করি।

হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা সত্য নয়। কার্য ও কারণের মধ্যে যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে, কার্য ও কারণ যে পাশাপাশি থাকে—এ সব ত' আমরা প্রতিনিয়তই দেখি। সুতরাং কার্য ও কারণের পৌর্বাপর্য ও তাদের পাশাপাশি থাকা হিউম অস্বীকার করেন না। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে যে একটি নিয়ত সম্বন্ধ আছে এবং কারণ যে কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা, একথা অভিজ্ঞতায় জানা যায়। কোন অভিজ্ঞতাবাদীই সেজন্য একথা অস্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ নিয়ত পূর্ববর্তিতার সম্বন্ধ। কিন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আমরা প্রত্যক্ষ করি না। সুতরাং হিউম বা কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীই কার্য ও কারণের মধ্যে কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

হিউম বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ থাকত তবে কারণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলেই কার্যের ধারণা পাওয়া যেত। কিন্তু বস্তুতঃ তা পাওয়া যায় না। সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে একটি বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে একথা স্বীকার করা যায় না। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও পরিষ্কার করা যায়। আমরা মনে করি, পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়। কিন্তু যে লোক 'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়' একথা জানে না, সে লোক 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ধারণাটি যতই বিশ্লেষণ করুক না কেন, 'পুষ্ট

১। Contiguous
২। Succession
৩। Necessary Connection

হয়' এমন ধারণা পাবে না। সুতরাং 'পাউরুটি মাখন খাওয়া'র সঙ্গে 'পুষ্ট হওয়া'র কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক স্বীকার করা যায় না।

'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়'—এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করা যায়। 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ও 'শরীর পুষ্ট হওয়া'র মধ্যে একটি নিয়ত পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে। পাউরুটি মাখন খাওয়ার পরই শরীর পুষ্ট হয়। 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ও 'শরীর পুষ্ট হওয়া'—এই দুটি ঘটনা পাশাপাশি ঘটে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু এদের মধ্যে একটি নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে লোকে যে বলে এদের মধ্যে একটি নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে, তার অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলেন, অভিজ্ঞতায় যখন আমরা বারবার পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হতে দেখি, তখন এই ঘটনাপারম্পর্য সম্পর্কে আমাদের একটা অভ্যাসজাত জ্ঞান হয়। আমরা মনে করি, অন্য কেউ যদি পাউরুটি মাখন খায় তবে সেও পুষ্ট হবে। অভ্যাসজাত এই মানসিক আশাই[১] কার্যকারণের নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের আসল রূপ। আমরা যে বলি 'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হবে'—এটা আমাদের অভ্যাসজাত একটি মানসিক আশা মাত্র। আমাদের আশা সাধারণতঃ সফল হয়। কিন্তু এই আশা যে সর্বদাই সফল হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা[২] থাকতে পারে না। নিশ্চয়তার ধারণা আমাদের অভ্যাসজাত আশা মাত্র। সুতরাং তা বিষয়ীগত।[৩]

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হিউমের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের জ্ঞান একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করা যায়। কার্য ও কারণের মধ্যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোন বিষয়গত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক নেই। একটি বিশেষ কার্য যে একটা বিশেষ কারণ থেকে হবে—এই ধারণা আমাদের একটি আশা মাত্র। যে কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীই কার্যকারণ সম্বন্ধে হিউমের এই মত মানতে বাধ্য। অভিজ্ঞতায় কার্য ও কারণের মধ্যে এ ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না।

সমালোচনা: অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মিল কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কারণ কার্যের অন্যনিরপেক্ষ[৪] পূর্ববর্তী ঘটনা।

১। Expectation due to habit.

২। Objective necessity.

৩। Subjective.

৪। Unconditional.

কারণ যদি কার্যের অন্যনিরপেক্ষ পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তবে কারণ দেখা দিলেই কার্য নিশ্চিত ভাবেই উৎপন্ন হবে। সুতরাং কার্য ও কারণের সম্পর্ক যে নিশ্চয়াত্মক—একথা স্বীকার করতেই হবে। অভিজ্ঞতাবাদীরা সাধারণতঃ কার্য ও কারণের নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক স্বীকার করেন না, কারণ প্রত্যক্ষ করে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক জানা যায় না, আর অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হওয়ায় যা প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না তা মানাও উচিত নয়। কিন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না তা মিলের মত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকের নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যায়। কার্য ও কারণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে, অথচ যখন প্রত্যক্ষ করে তা জানা যায় না, তখন প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ একথাও স্বীকার করা যায় না।

কান্ট মনে করেন, কার্যকারণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে পাওয়া যায় না। সমস্ত রকম প্রত্যক্ষের আগেই মনে যদি কার্য-কারণের ধারণা না থাকত তবে মানুষ একটি জিনিস দেখলেই তার কারণ খুঁজত না। যেহেতু আমাদের মনে কার্য-কারণের ধারণা আছে, সেজন্যই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা দেখে আমরা তার কারণ খুঁজি। কোন এক বিশেষ কার্যের কারণ প্রত্যক্ষ করেই পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বিক কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা[১] সমস্ত প্রত্যক্ষের আগেই আমাদের মনে থাকে। সার্বিক কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা মনে না থাকলে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যের কারণ আবিষ্কারের প্রবৃত্তি আমাদের কখনই হত না। সুতরাং কান্টের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব অভিজ্ঞতার প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের আকার।[২] এই আকার মনে না থাকলে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানই হতে পারে না।

কান্ট আরও বলেন যে, পৌর্বাপর্যের প্রত্যক্ষ কখনও কখনও আমাদের নিয়ম অনুসরণ করে আবার কখনও কখনও বস্তুর নিয়ম অনুসরণ করে। কখনও কখনও আমাদের খুশিমত আমরা সংবেদনের পৌর্বাপর্য ভাবতে পারি, আবার কখনও কখনও বস্তুই অনুভব বা সংবেদনের পৌর্বাপর্য নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৌর্বাপর্যের বস্তুগত নিশ্চয়তা স্বীকার করতেই হয়। যেখানে সংবেদনের পৌর্বাপর্য এরকম নিশ্চয়াত্মক সেখানেই কার্য কারণ-সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা অস্বীকার করা যায় না।

১। Idea of the universal law of causation

২। A-priori category of Knowledge

কাণ্ট উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।[১] আমরা যখন কোন একটি বাড়ি দেখি তখন ভিৎ থেকে শুরু করে ছাতে অথবা ছাত থেকে শুরু করে ভিতে দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারি। কিন্তু চলন্ত জাহাজের গতিপথ লক্ষ্য করার সময় এরকম করা যায় না। তখন এক বিশেষ পারম্পর্যই অবলম্বন করতে হয়। জাহাজ যেদিক থেকে যেদিকে যাচ্ছে আমরা সেদিক থেকে সেদিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারি। যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকে যেখান থেকে যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে জাহাজের গতিপথের যথাযথ ধারণা হয় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যা পরপর দেখি তার পারম্পর্য আমাদের ওপর নির্ভর করে না, বস্তুর ওপরই করে। কাণ্ট এই জাতীয় পারম্পর্যের নাম দিয়েছেন—'বিষয়গত পারম্পর্য'।[২] এই ক্ষেত্রে জাহাজের পরবর্তী অবস্থান পূর্ববর্তী অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী অবস্থান না থাকলে পরবর্তী অবস্থান হতে পারে না। যেখানে এরকম পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করে সেখানেই কার্যকারণ সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের বস্তুগত নিশ্চয়তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কারণের নিয়ত পূর্ববর্তীতা স্বীকার করলে কোন একটি বিশেষ ঘটনার কারণ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে কারণ তা সমস্ত যুদ্ধের বা সমস্ত মন্বন্তরেরই কারণ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ একটি বিশেষ কারণ এবং তাকে নিয়তপূর্ববর্তী বলা অর্থহীন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধেও একই কথা সত্য।

তা ছাড়া নিয়তপূর্ববর্তী হলেই কিন্তু একটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার কারণ হয় না। তা যদি হ'ত তবে দিন রাত্রির কারণ হ'ত। কিন্তু, দিন রাত্রির কারণ নয়, দিন ও রাত্রি উভয়ই পৃথিবীর আহ্নিক গতির কার্য।

অবশ্য এই মতবাদের কিছু রদবদল করে ওপরে উল্লিখিত শেষ দু'টি সমস্যার সমাধান করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু, এই মতবাদের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি গুরুতর আপত্তিও উত্থাপন করা যায়।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রয়োগ কর যায় না বলে মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমি যখন কোন কারণে কোন কিছু বিশ্বাস করি, তখন কারণ

১। Dr. R. Das: A Handbook on Kant's critique of pure Reaso গ্রন্থের ১০০-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। Objective Succession

বিশ্বাসের শুধুই নিয়তপূর্ববর্তী নয়, কারণটি বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণও করে। আমি যখন কোন কাজের সঙ্কল্প করি তখন সঙ্কল্প কাজের শুধুই পূর্ববর্তী এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, এমন বলা যায় না। স্মৃতি প্রত্যক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রত্যক্ষ স্মৃতির শুধুই পূর্ববর্তী নয়।

কাণ্টের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, কাণ্ট কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা স্বীকার করেছেন। কাণ্টের দর্শনে বিষয় বলতে জ্ঞানের বিষয় বোঝায়। কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। সুতরাং কাণ্ট বিষয়গত নিশ্চয়তা বলতে জ্ঞানগত নিশ্চয়তা বোঝেন। কাণ্ট যখন বলেন, কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা আছে, তখন তিনি জ্ঞানগত নিশ্চয়তাই বোঝাতে চান। কার্যকারণের আকার মনে না থাকলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না। বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কার্যকারণের আকার অপরিহার্য। একমাত্র এই অর্থেই কাণ্টের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা আছে। কাণ্ট মনে করেন, কার্যকারণতত্ত্ব প্রাক্-অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ জ্ঞানের আকার। কার্যকারণ তত্ত্ব না হলে কোন অভিজ্ঞতাই হয় না। কিন্তু কার্যকারণ তত্ত্ব কোন অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভরশীল নয়। যেহেতু জ্ঞানের আকার শুধু জ্ঞানের বিষয়েই প্রযোজ্য, সুতরাং কার্যকারণ তত্ত্ব বস্তু-স্বরূপ[১] সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

হেগেলের মত

হেগেল মনে করেন, মানুষের মন ও জগৎ একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার জগতেরও আকার। তাই জ্ঞানের আকার কার্যকারণ তত্ত্ব জগতেরও আকার বলে মানতে হবে। অর্থাৎ কার্যকারণ তত্ত্বের নিশ্চয়তা জাগতিক বস্তুনিচয়ের সম্পর্কের নিশ্চয়তাও সূচনা করে। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা শুধু জ্ঞানগত নিশ্চয়তা নয়, বস্তুগত নিশ্চয়তাও বটে। এই ভাবে হেগেল কার্যকারণ সম্পর্কের কাণ্টীয় জ্ঞানগত নিশ্চয়তাকে বস্তুগত নিশ্চয়তায় পরিণত করেছেন।

কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক, এই মত (The Entailment Theory of Cause)

কারণ যে কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী ঘটনা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১। Thing-in-itself

কারণের পূর্ববর্তিতার কথা যাঁরা বলেন (অভিজ্ঞতাবাদীরা) তাঁরা যা স্বীকার করেন তাতে কোন দোষ নেই ; দোষ তাঁদের এই যে তাঁরা কারণ ও কার্যের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। অর্থাৎ তাঁদের স্বীকৃতি নির্দোষ, কিন্তু অস্বীকৃতি দোষযুক্ত।

আমাদের মনে হয়, কারণ কেবলমাত্র কার্যের পূর্ববর্তী নয়, কারণ কার্যকে নিয়ন্ত্রণও করে এবং এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে ; অর্থাৎ কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক। এই নিশ্চয়াত্মকতার প্রকৃতি আমরা একটি উপমার সাহায্যে বুঝতে পারি। শুদ্ধ অবরোহানুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত উপাত্ত থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের সম্বন্ধকে আমরা নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ বলি। এই নিশ্চয়াত্মকতা তর্কবিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মকতা (Logical necessity) নামে খ্যাত। যে মতবাদ অনুসারে কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ তর্কবিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের অনুরূপ সে মতবাদ নিশ্চয়াত্মক মত (The Entailment theory) নামে পরিচিত। বুদ্ধিবাদীরা এই মতের সমর্থক।

এই মত দীর্ঘকাল দার্শনিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতাবাদী হিউম (১৭১১-৭৬) এই মতবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন এবং কারণ কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী এই মত প্রচার করেন। হিউমের মত অনেক দার্শনিক এখনও সমর্থন করেন।

আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়াত্মক মতের পক্ষে দু'টি খুব জোর যুক্তি আছে। এই দু'টি যুক্তি পূর্বে আলোচিত কারণ নিয়তপূর্ববর্তী, এই মতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'তে পারে। প্রথমতঃ—আমরা কারণ থেকে কার্য শুদ্ধভাবেই অনুমান করতে পারি। যদি কারণ ও কার্যের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ না থাকে তবে এই অনুমান কিভাবে সম্ভব ? অবরোহানুমানে উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের মধ্যে যে নিশ্চয়াত্মকতা লক্ষ্য করা যায় এই ক্ষেত্রের নিশ্চয়াত্মকতা সর্ববিষয়ে তার সঙ্গে অভিন্ন না হলেও অনুরূপ। অনেকে বলেন, অবরোহানুমানে উপাত্ত যেমন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে, সিদ্ধান্তও তেমনি উপাত্তকে সমর্থন করে। কিন্তু, কারণ যেমন কার্যকে সমর্থন করে, কার্য তেমনিভাবে কারণকে সমর্থন করে, একথা বলা যায় না। এই অবস্থায় কারণ ও কার্যের সম্বন্ধকে অবরোহানুমানের উপাত্ত ও সিদ্ধান্তের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ বলা যাবে কি করে ? এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা কারণ ও কার্যের সম্বন্ধকে অবরোহানুমানের

নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের অনুরূপ বলেছি, সর্ববিষয়ে অভিন্ন ত বলিনি। আমরা বলবো, কারণ ও কার্যের নিশ্চয়াত্মকতা কারণ অনিবার্যভাবে কার্য উৎপন্ন করে, একথা বোঝায়। বৈজ্ঞানিক আরোহানুমানের ভিত্তি কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বলে মনে করা হয়। আরোহানুমানের উপাত্ত নিশ্চয়ই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ যদি নিশ্চয়াত্মক না হয় তবে এই সমর্থন যথার্থতঃই সম্ভব কি? এ বিষয়ে আমরা কিছু পরে আবার আলোচনা করবো।

দ্বিতীয়তঃ—কারণ যে কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী তা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় এবং ইহা একটি ঘটনা। কিন্তু, এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি? 'ক' সব সময়ই 'খ'-এর পরে হয়, একথা বললে কেন পরে হয়, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। আর এ প্রশ্নের জবাব না পেলে 'খ' 'ক'-এর কারণ একথারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 'খ' 'ক'-এর কারণ, একথার ব্যাখ্যা তখনই পাওয়া যায় যখন 'খ'-এর মধ্যে 'ক'-এর যুক্তি (reason) পাওয়া যায়। 'খ'-এর সঙ্গে 'ক'-এর নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ স্বীকার করলেই 'খ' কেন 'ক'-র কারণ তা বোঝা যায়। 'খ'-এর মধ্যে 'ক'-এর যুক্তি বলতে 'খ'-এর সঙ্গে 'ক'-র নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কি বোঝাতে পারে?

নিশ্চয়াত্মক মতের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়।

(১) হিউম বলেছেন, কারণের সঙ্গে কার্যের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না; সুতরাং কারণের সঙ্গে কার্যের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ নেই। আমরা কোন জিনিস জানি না বলেই তা নেই, একথা বলা সঙ্গত কি? জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে পূর্বে জানতাম না পরে জেনেছি, এমন জিনিসের কি অভাব আছে? তাছাড়া, যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তা ত প্রত্যক্ষ করা যাবেই না। সুতরাং প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথা প্রত্যক্ষের অযোগ্য জিনিসের নাস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের প্রকৃতিই এই যে তা বুদ্ধিগম্য, প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। সুতরাং নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে নেই, একথা বলা যায় না। আরও বলা হয়, নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ কারণ ও কার্যের মধ্যে আছে, তা প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু, নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ যে নেই, তা কি প্রত্যক্ষ করা যায়? আসলে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে তার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোনটাই প্রত্যক্ষ করা যায় না।

(২) অনেকে বলেন, তর্কবিজ্ঞানে আমরা যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ পাই তা ত

কালিক সম্বন্ধ নয়, কিন্তু, কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ ত কালিক সম্বন্ধ। তা হলে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিবাদীরা বলতে পারেন—কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ কালিক সম্বন্ধ নয়, কিন্তু কালিক সম্বন্ধ কখনই নিশ্চয়াত্মক হতে পারে না, একথার প্রমাণ কি? আমরা জ্ঞানের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেছি, নিশ্চয়াত্মকতা এবং নূতনত্ব দুইই এক সঙ্গে থাকতে পারে; বচন অভিজ্ঞতাপূর্ব অথচ সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic apriori proposition) হতে পারে। এ সব যদি সম্ভব হয় তবে নিশ্চয়াত্মকতা এবং কালিক সম্বন্ধ একসঙ্গে থাকা কি অসম্ভব? আরও কথা, কারণ ও কার্যের মধ্যে যে কালিক সম্বন্ধের কথা বলা হয় তার প্রকৃতি কি? আমরা বলি, বীজ থেকে অঙ্কুর হয়; বীজ কারণ, অঙ্কুর কার্য। কিন্তু, বীজ ঠিক কোন্ সময় অঙ্কুর উৎপন্ন করেছে, তা কি নির্দিষ্ট করে বলা যায়? আসলে বীজ ও অঙ্কুরের মধ্যে আমরা কালিক ক্রমের কথা চিন্তা করি, কিন্তু বস্তুতঃই এদের মধ্যে কোন কালিক ব্যবধান নেই (There is an order of time between the cause and the effect and no real time gap between the two)। যদি কারণ ও কার্যের মধ্যে বস্তুতঃই কালিক ব্যবধান থাকতো তবে কারণকে আর কারণই বলা যেত না, যেহেতু এই ব্যবধানে অন্য কিছু যে বস্তুতঃ কার্য উৎপন্ন করেনি, তা বলা যেতনা। বীজ ও অঙ্কুরের মধ্যে বস্তুতঃ কালিক ব্যবধান বের করা যাবে না, এদের কালিক ক্রমের কথা চিন্তা করা যায় মাত্র। বীজ আগে, অঙ্কুর পরে, একথা আমরা ভাবি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বীজ ও অঙ্কুরের মধ্যে কালিক ব্যবধান আছে। এর অর্থ এই যে, বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধ এমন যে বীজ থেকেই অঙ্কুর হয়। বীজে অঙ্কুরের সম্ভাবনা আছে। যদি না থাকতো তবে বীজ থেকে অঙ্কুর হতো না। সমস্ত কার্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গেই একথা সত্য। কান্ট বলেন—Causality does not require any lapse of time between the cause and the effect but only order of time between them. The order is such that when the cause has occurred the effect must also occur and not vice versa. (R. Das, A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason, ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কারণ ও কার্যের মধ্যে যে কালিক সম্বন্ধের কথা বলা হয় তা এভাবে বুঝলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। অনেকে অবশ্য কারণ ও কার্যের সম্বন্ধের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অযথা ঝামেলা এড়াবার জন্য এই সম্বন্ধকে কালিক সম্বন্ধ না বলে যৌক্তিক সম্বন্ধ (Logical relation) বলেন।

(৩) অনেকে বলেন, অবরোহানুমানের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত, কারণ এই অনুমানে উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু, আরোহানুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য, নিশ্চিত নয়। তাঁরা আরও বলেন, এরূপ হওয়ার কারণ আরোহানুমানের ভিত্তি যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ তা-ই নিশ্চয়াত্মক নয়।

সমস্ত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক এবং আধুনিক তর্কবিজ্ঞানীরা এই মতের সমর্থক। এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—আরোহানুমান কি অনুমান নয়? আর যদি অনুমান হয় তবে এই ক্ষেত্রে উপাত্ত কি সিদ্ধান্তের ভিত্তি না হয়ে পারে? আর যদি ভিত্তি হয় তবে উপাত্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে। উপাত্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন তখনই করতে পারবে যখন উপাত্তের সঙ্গে সিদ্ধান্তের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ থাকবে। আমাদের মনে হয়, আরোহানুমানকে যথার্থ অনুমান বলতে হলে কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিশ্চয়তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশ্য আমরা জানি, অনেকেই এবিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন না।

দর্শনের ক্ষেত্রে যদি আমরা অদ্বৈতবাদ (Monism) মানি এবং বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মধ্যে একটা বুদ্ধিগম্য সম্বন্ধের কথা কল্পনা করে বিশ্বকে একটি যুক্তিপূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমণ্ডল (A rationally Connected system) বলে স্বীকার করি তবে আমাদের কারণ ও কার্যের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ না মেনে উপায় নেই। আর যদি আমরা বহুতত্ত্ববাদী হই, বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধ একান্তই বাহ্যিক বলে মনে করি তবে কারণ নিয়তপূর্ববর্তী, এমত স্বীকার করতে পারি। আমরা কারণ নিয়তপূর্ববর্তী, এই মত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, মনোবিজ্ঞানের কতগুলি ব্যাপার এ মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, নিশ্চয়াত্মক মতের সাহায্যেই এদের ব্যাখ্যা করা হয়।

কয়েকজন আধুনিক দার্শনিকের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

কয়েকজন আধুনিক দার্শনিক কার্যকারন তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের অধিকাংশ আলোচনাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড, আলেকজেণ্ডার ও রাসেল—এই সব আধুনিক দার্শনিকদের অন্যতম। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁদের মতবাদ আলোচনা করব।

অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড্ হিউমের মতবাদ খণ্ডন ক'রেই কার্যকারণ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মনে করেন, আমরা যদি হিউমের মত পরস্পরবিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলোকেই আসল সত্য বলে মনে করি তবে কার্য-

কারণ সম্পর্কের স্বরূপ বুঝব না। জগৎ যদি পরস্পরবিচ্ছিন্ন কতগুলো সংবেদনেরই রাজত্ব হয় তবে এদের কোন সত্য সম্পর্কই স্বীকার করা যায় না। হোয়াইট্‌হেডের মতে ঘটনা-প্রবাহই[১] চরমতত্ত্ব। এই প্রবাহে প্রত্যেক জিনিসই অন্য প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যে জগৎকে কতগুলো পরস্পরবিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করি তা আমাদের ভ্রান্তিরই ফল। তাঁর মতে—দুই পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন ঘটনার সম্পর্কই কার্যকারণ সম্পর্ক। পূর্বের ঘটনার নাম কারণ, আর পরের ঘটনার নাম কার্য। এই দুই ঘটনা একান্তভাবেই অবিচ্ছিন্ন। দুই ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা বিষয়গত, আত্মগত নয়।

আলেকজেণ্ডার সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কার্যকারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কারণতা বস্তুর আকার-বিশেষ। বস্তু দেশ-কাল বা গতির এক গ্রন্থি[২]। প্রত্যেক বস্তুই দুই দিক থেকে দেখা যায়—স্থিতির দিক আর গতির দিক। যখন বস্তুকে স্থিতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম 'দ্রব্য', আর যখন গতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম 'কারণ'।

রাসেল হিউমের মতই কার্য-কারন-সম্পর্কের মধ্যে কোন নিশ্চয়তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে কার্য-কারন-সম্পর্ক একটি সাধারণ পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ[৩]। একটি বিশেষ পরিমাণের সঙ্গে একটি বিশেষ পরিমাণের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে একথাই কার্য-কারন-সম্পর্ক ঘোষণা করে। কারণ কার্যকে নিশ্চিত ভাবে উৎপন্ন করে—এমন কোন কথা কার্য-কারণ-সম্পর্কের মধ্যে নেই।

সমালোচনা ঃ অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড্ কার্য-কারণ-সম্পর্কের সত্যস্বরূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কার্য-কারন-সম্পর্ক যে নিশ্চয়াত্মক ও এই নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক যে বিষয়গত, হোয়াইট্‌হেড্ একথা স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। এই দিক থেকে হোয়াইট্‌হেডের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করতেই হবে।

আলেকজেণ্ডার কার্য-কারন-সম্পর্কের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। রাসেল কার্য-কারন সম্পর্কের মধ্যে কোন নিশ্চয়তাই স্বীকার করেন না। আমরা হিউমের মতবাদ সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, কার্য-কারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং রাসেলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১। Process
২। Complex
৩। Ordinary Correlation

কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে দু'টি আপত্তি

(১) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের দিক থেকে একটি আপত্তি তোলা হয়। বলা হয় যে, জড় বস্তুর একটি উপাদান ইলেকট্রন এবং তার গতির (motion) প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, অর্থাৎ, তা অনির্দেশ্য। আধুনিক বিজ্ঞানে এই মত অনির্দেশ্যতার মতবাদ (The theory of Indeterminacy) নামে খ্যাত। অনেক বিজ্ঞানী বলেন, যেহেতু ইলেকট্রনের গতির প্রকৃতি অনির্দেশ্য এবং যেহেতু সমস্ত জড়বস্তু ইলেকট্রনের দ্বারা গঠিত, সুতরাং জড়বস্তুর গতিও (motion) অনির্দেশ্য; আর যদি তা হয় তা হ'লে জড় জগতের ক্ষেত্রে কারণের নিয়ন্ত্রণ আর মানা যায় না।

এই ক্ষেত্রে অনেক দার্শনিক বলেন, অনির্দেশ্য (Indeterminate) এবং অনিয়ন্ত্রিত (undetermined) সমার্থক নয়। কোন জিনিস অনির্দেশ্য হলেই অনিয়ন্ত্রিত হবে এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং অনির্দেশ্যতার মতবাদ কারণের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে, এমন কথা নির্বিচারে বলার ভিত্তি নেই।

আধুনিক কালের দুজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং প্ল্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণবাদী। অবশ্য তাঁরা নিয়ন্ত্রণবাদ দার্শনিক মত রূপেই প্রচার করতে চান। এখানে নিয়ন্ত্রণবাদ বলতে কারণের নিয়ন্ত্রণ এই মত বুঝতে হবে।

তর্কের খাতিরে যদি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রণবাদ মেনেও নেওয়া যায় তবে সমস্ত জড় বস্তুর ক্ষেত্রেই অনিয়ন্ত্রণবাদ মানতে হবে, এমন কি কথা আছে? সাবয়ব দ্রব্যের নিয়ম যেমন তার অবয়বে অবশ্যই প্রযুক্ত হবে, এমন বলা যায় না, তেমনি অবয়বের নিয়ম সাবয়ব দ্রব্যে প্রযুক্ত হবে, এমনও বলা যায় না।

ইলেকট্রনের গতি যে অনির্দেশ্য তা ইলেকট্রনের বিশেষ প্রকৃতিজন্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনের গতির অনির্দেশ্যতার কারণ হবে ইলেকট্রনের বিশেষ প্রকৃতি। সুতরাং অনির্দেশ্যতার মতবাদ অনুসারে কারণের নিয়ন্ত্রণ মানা যায় না, এমন কথা নির্বিচারে বলা সঙ্গত নয়।[১]

২) ব্রেড্‌লি কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে তিনটি ধাঁধা (puzzles) উপস্থিত করেছেন।[২]

প্রথমতঃ তিনি বলেন, কারণ ও কার্য হয় হবে ব্যবধানরহিত (continuous),

১। A. C. Ewing: The Fundamental Questions of Philosophy ১৮২-১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। A. E. Taylor: Elements of Metaphysics ১৭১-১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নয় হ'বে ব্যবধান যুক্ত (discontinuous)। যদি তারা ব্যবধানরহিত হয় তবে তাদের কারণ ও কার্য বলে আলাদা করে চিহ্নিতই করা যাবে না। আর যদি তারা ব্যবধানযুক্ত হয় তবে যাকে কারণ বলা হচ্ছে তা-ই যে কারণ তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না ; যেহেতু ব্যবধানের স্থযোগে অন্য কিছুর আবির্ভাব এবং কার্য উৎপাদন অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ অনবস্থা দোষের সৃষ্টি করে। ক-এর কারণ খ, খ-এর কারণ গ, গ-এর কারণ ঘ, এমনি করে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকবে বলে এই কারন-শৃঙ্খলের শেষ পাওয়া যাবে না এবং অনবস্থা হবে।

তৃতীয়তঃ একটি কার্যের একটির বেশী কারণ থাকতে পারে না, আবার যখন বিশ্বের অসংখ্য ঘটনা থেকে কোন একটি ঘটনা বেছে নিয়ে তার কারণ খুঁজি তখন তার একাধিক কারণের সম্ভাবনা থাকে।

একটি কার্যের যে একাধিক কারণ থাকতে পারে না তা দেখাতে হলে কারণ বলতে সমস্ত কারণাংশের সমাহার (Totality of all conditions) বোঝাতে হবে এবং তাতে কারণ ও কার্যের শেষ পর্যন্ত কোন পার্থক্য থাকবে না।

আর কোন একটি কার্য যদি বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয় তবে এই কার্যের বিভিন্ন কারণের সম্ভাবনা সব সময়ই স্বীকার করতে হয়।

কারণ ও কার্যের সম্বন্ধের প্রকৃতি আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি তাতে এই ধাঁধার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কারণ ও কার্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ বর্তমান, একথা যদি মনে রাখি এবং বীজ ও অঙ্কুরের দৃষ্টান্তের সাহায্যে যদি কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ বুঝতে চেষ্টা করি তবে এই সমস্ত সমস্যা যে কুতর্কজাত তা বুঝতে পারবো।

দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব (Substantiality and Causality)

সাধারণতঃ লোকে মনে করে, কোন একটি দ্রব্য শক্তি প্রয়োগ ক'রে অন্য একটি দ্রব্যকে উৎপন্ন করে। স্থতরাং দ্রব্য ছাড়া কারণ থাকতে পারে না। কথাটা অন্য ভাবেও ভাবা যেতে পারে। দ্রব্য বলতে আমরা পরিবর্তনের মধ্যেও যা অপরিবর্তিত থাকে ও পরিবর্তনের মধ্যে যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাকেই বুঝি। স্থতরাং পরিবর্তন-নিরপেক্ষভাবে দ্রব্য বোঝা যায় না। কারণ কার্য সূচনা করে। কার্য পরিবর্তন ছাড়া কখনই সিদ্ধ হয় না। স্থতরাং পরিবর্তনের ধারণা কার্যের ধারণার মধ্যেই নিহিত। এই দিক থেকে দ্রব্যত্ব ও কারণত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট।

দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তন সূচনা করে। কারণ পরিবর্তনেরই দ্যোতক। অপরিবর্তন বা স্থায়িত্ব ব্যাখ্যার জন্য দ্রব্য স্বীকার করা হয়। পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য স্বীকার করা হয় কারণ। পরিবর্তন ও অপরিবর্তন একান্তভাবে পরস্পরসাপেক্ষ। আলো না থাকলে যেমন অন্ধকার বোঝা যায় না, আবার অন্ধকার না থাকলে যেমন আলো বোঝা যায় না, ঠিক তেমনি পরিবর্তন ছাড়া অপরিবর্তনের কোন অর্থ নেই, আবার অপরিবর্তন ছাড়া পরিবর্তনও বোধগম্য হয় না। সুতরাং কারণ ছাড়া দ্রব্য হয় না, আবার দ্রব্য ছাড়া কারণ হয় না।

দার্শনিক কান্ট দ্রব্যকেই কারণ বলেন। তাঁর মতে কারণ কার্য উৎপন্ন করে। কার্য উৎপন্ন করতে হলে সক্রিয় হতে হয়। নিষ্ক্রিয় থেকে কোন কার্যই করা যায় না। দ্রব্যই সক্রিয় হতে পারে। সুতরাং দ্রব্যই কারণ। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন কার্যই পরিবর্তন সূচনা করে। পরিবর্তনের আশ্রয় এমন জিনিসই হতে পারে যা নিজে পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তনের কথনই পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং অপরিবর্তিত দ্রব্যই কার্যের কারণ হতে পারে।

আধুনিক কালের দার্শনিক আলেকজেণ্ডারও দ্রব্য ও কারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই দেশ-কাল বা শুদ্ধ গতির গ্রন্থিমাত্র। প্রত্যেক বস্তুই দু'টি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে—একটি গতির দিক, আর একটি স্থিতির দিক। গতির দিক থেকে দেখলে বস্তুর নাম কারণ, আর স্থিতির দিক থেকে দেখলে তার নাম দ্রব্য। সুতরাং যা-ই দ্রব্য, তা-ই কারণ। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার জন্যই একই বস্তুকে দ্রব্য ও কারণ বলে মনে হয়।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। একটি ছাড়া আর একটি কথনই হয় না।

যান্ত্রিক কার্য ও উদ্দেশ্যমূলক কার্য
(Mechanical Causation and Teleological Causation)

যান্ত্রিক কার্য ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যান্ত্রিক কার্য বলতে আমরা এমন কার্য বুঝি যা নিয়তই পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রই যান্ত্রিক কার্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশের কাজ পূর্ববর্তী অন্য আর একটি অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাতল ঘোরালেই ইঞ্জিন চলতে থাকে,

কিন্তু হাতল না ঘোরালে ইঞ্জিন চলে না। শুধু তাই নয়। প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রের প্রত্যেক আবর্তন পূর্ববর্তী আর এক আবর্তনের পরই সংঘটিত হয়। যান্ত্রিক কার্যের মধ্যে একটা অন্ধ অবশ্যম্ভাবিতা আছে। যান্ত্রিক কার্যের বেলায় কারণ থাকলেই অতি অবশ্য কার্য সংঘটিত হয়। যন্ত্র একবার চালু করে দিলে বন্ধ না করা পর্যন্ত যন্ত্র চলবেই। যান্ত্রিক কার্যে কোন বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ বা উদ্দেশ্যের বালাই নেই। যান্ত্রিক কার্য যান্ত্রিক ভাবেই সংঘটিত হয়।

উদ্দেশ্যমূলক কার্য পূর্ববর্তী কোন ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই ক্ষেত্রে কার্যের উদ্দেশ্যই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ছাত্র যখন পরীক্ষা পাসের পড়া পড়ে তখন পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যই তাকে কার্যে প্রণোদিত করে। উদ্দেশ্যমূলক কার্যে যান্ত্রিক কার্যের মত কোন অন্ধতা নেই। এই জাতীয় কার্যে বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ বা আদর্শের স্থান আছে। দেশপ্রেমিক যখন দেশের উন্নতির জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয় তখন তার কাজ উদ্দেশ্যমূলক কাজই বটে। সে ভেবেচিন্তেই দেশসেবার পথ বেছে নেয়। কোন্ পথে গেলে সহজে সিদ্ধি আসবে তাও সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং এই কাজে যান্ত্রিকতা বা অন্ধতার কোন স্থান নেই।

জড়বাদীরা[১] যান্ত্রিক কার্যে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে ছুনিয়ার সব কিছুই যান্ত্রিক ভাবে ঘটে যাচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য বা আদর্শের কোন স্থান নেই। জড় থেকে যান্ত্রিক ভাবে জীবনের[২] উৎপত্তি হয়েছে; আর জীবন যান্ত্রিক ভাবেই মনের সৃষ্টি করেছে। আকাশে সূর্য ওঠে, আবার সূর্য ডোবে। ফুল ফোটে ফুল ঝরে। সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসে, আবার ভোরের আলো দেখা দিতেই পাখী ডেকে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের পর বর্ষার স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায়। শীতের রিক্ততার পর বসন্তের পূর্ণতা আসে। জগতের এই যে সব বিচিত্র ঘটনা তা যান্ত্রিক ভাবেই ঘটে যাচ্ছে। ছুনিয়া জুড়ে নির্বোধ জড়ের যান্ত্রিক খেলা চলেছে। এখানে চৈতন্যের বিশেষ কোন প্রভাব নেই।

ভাববাদীরা[৩] উদ্দেশ্যমূলক কার্যে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, জগৎ জুড়ে এক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার লীলা চলেছে। এই সুন্দরী ধরণী নির্বোধ জড়ের সৃষ্টি হ'তে পারে না। এক বিরাট শিল্পী এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে জগৎ সৃষ্টি

১। Materialists

২। Life

৩। অধ্যাত্মবাদীরা

করেছেন। তা যদি না হ'ত তবে যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা এমন ভাবে থাকত না। এ জগৎ কোন খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টি নয়। এ জগতের শিল্পী এক নির্খুত শিল্পী। এক অসীম অনন্ত চৈতন্য বিশ্বের ভাঙাগড়ার মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য সফল ক'রে চলেছেন। তিনিই এই নির্খুত শিল্পী। তিনি অসীম কিন্তু সীমার মধ্যে তিনি ধরা দেন। তিনি অরূপ; কিন্তু রূপের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি পূর্ণ, কিন্তু অপূর্ণও তাঁর প্রসাদ-বঞ্চিত নয়। এই অসীম অরূপ পূর্ণ চৈতন্যই জগতের কারণ। ভাববাদীদের মতে কারণতায় আর চরমতায় কোন তফাৎ নেই। যিনি কারণ, তিনিই চরম।[১]

যদিও যান্ত্রিক কার্য এবং উদ্দেশমূলক কার্যের মধ্যে সাধারণতঃ এইভাবে বিরোধ কল্পনা করা হয় তবু এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—উদ্দেশ্যমূলক কার্য কি কখনই অসচেতন হতে পারে না? অর্থাৎ, উদ্দেশ্য বলতেই কি সচেতন উদ্দেশ্য বোঝায়? ভারতের সাংখ্যদার্শনিকদের মত অনেকে অসচেতন উদ্দেশ্যের কথা বলেন। সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, প্রকৃতি থেকে যে সৃষ্টি হয় তার উদ্দেশ্য আছে, তবে প্রকৃতি বা সৃষ্টি কেউই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। একেই বলা যায় অসচেতন উদ্দেশ্য। এই অর্থে যান্ত্রিক কার্যও উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে তবে তা হবে অসচেতন উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, চিনি উৎপাদনের যে যন্ত্র, যাকে আমরা চিনির কল বলি, তার কার্য নিশ্চয়ই যান্ত্রিক কার্য, কিন্তু এই কার্যের উদ্দেশ্যও আছে এবং তা হচ্ছে চিনি-উৎপাদন। তবে চিনির কল এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। এই অর্থে যান্ত্রিকতার সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকতার কোন বিরোধ নেই।

১। Causality implies finality,

অষ্টম অধ্যায়

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা

(Nature of Truth and Test of Truth)

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস সাধারণতঃ বচনের মারফৎই প্রকাশিত হয়ে থাকে। সত্য ও মিথ্যা বচনেরই[১] গুণ। অর্থাৎ একটি বচনই সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। যদি এমন কোন বিশ্বাস থাকে যা বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না তবে সেই বিশ্বাস সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। শুদ্ধ সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন গুণের প্রথম পরিচিতি কোন বচন নয়। নবজাত শিশুর হয়ত এরকম ধরণের কোন শুদ্ধ সংবেদন হ'তে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা এই জাতীয় সংবেদনকে জ্ঞান বলি না। এই জাতীয় সংবেদনের সত্যতা বলে কিছু হ'তে পারে না। যদি আমরা বলি 'ফুলটি লাল' তবেই আমাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। কারণ ফুলটি লাল হ'তেও পারে, আবার নাও হ'তে পারে। কিন্তু শুধু 'লাল' বললে ও কি 'লাল' বা কোথায় 'লাল' না বললে কথার সত্যাসত্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ঠিক তেমনি, এমন যদি কোন অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস থাকে যেখানে উদ্দেশ্য বিধেয়ের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ বচন নেই সেখানেও সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। অবশ্য অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস যে তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান নয়, একথা সবাই স্বীকার করবেন। আমরা দর্শনে তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করি। স্বতরাং অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের প্রসঙ্গেই সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান কখনই বচন ছাড়া হয় না। স্বতরাং জ্ঞান প্রসঙ্গে সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা বচন প্রসঙ্গে সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা বোঝাবে।

বচনে সাধারণতঃ কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। বচন সর্বদাই সত্যতা দাবী[২] করে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে না, যা মিথ্যা হয় তা জ্ঞান

১। বচন—Proposition। ভাষায় প্রকাশিত বিচার (Judgement) অর্থে 'বচন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক তর্কবিজ্ঞানে বিচারের বিষয়কে বচন বলে।

২। Truth claim

নয়। বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। সত্য বিশ্বাসই জ্ঞান। তবে এমন হতে পারে যে, যাকে আমরা এখন সত্য মনে করে জ্ঞান বলছি তা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। বচনে হয় আমরা বলি এটা এমন, নয়ত বলি এটা এমন নয়। যখন বলি এটা এমন তখন ভাবাত্মক[১] বচন পাই। আর যখন বলি এটা এমন নয় তখন নিষেধাত্মক বচন[২] পাওয়া যায়। যিনি বচন ব্যবহার করেন, তিনি মনে করেন বচন নিশ্চয়ই সত্য। বক্তা সত্য মনে না করলে কোন বচন ব্যবহার করতে পারেন না। সুতরাং প্রত্যেক বচনই সত্যতা দাবী করে। তবে হয়ত বস্তুতঃ তা সত্য নাও হ'তে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল—বচনের সত্যতা বলতে আমরা কি বুঝি? যখন কেউ বলেন—'সব মানুষই মরণশীল', তখন আমরা বলি বচনটা সত্য; কিন্তু কেউ যদি বলে 'সব মানুষই সৎ', তবে বলি বচনটা মিথ্যা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—প্রথম বচনটা কেন সত্য হ'ল, আর দ্বিতীয়টাই বা মিথ্যা হ'ল কেন? অর্থাৎ প্রথম বচনটির সত্যতা বলতে ও দ্বিতীয়টির মিথ্যাত্ব বলতে আমরা কি বুঝি, তা-ই নির্ণয় করতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তর পেলে সত্যের প্রকৃতি জানা যাবে।

সত্যের পরীক্ষা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এখানে প্রশ্ন হ'ল: 'সব মানুষই মরণশীল'—এই বচন যে সত্য তা জানা যায় কি করে? কি করেই বা বোঝা যায় যে, 'সব মানুষই সৎ'—এই বচনটি মিথ্যা? অর্থাৎ সত্য বা মিথ্যা কি ক'রে জানা যায় তা-ই এখানে নির্ণয় করতে হবে। সত্যতা ও সত্যতার জ্ঞান এক কথা নয়। সত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করতে আমরা সত্যতার স্বরূপ আলোচনা করি। কিন্তু সত্যতার জ্ঞান লাভ করতে হলে সত্যতার পরীক্ষা জানা আবশ্যক। সুতরাং সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষা এক জিনিস হতে পারে না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষার পার্থক্য খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেছেন।[৩] তিনি বলেন, বচনের সত্যতা জানা একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব না জানা গেলেও বচন সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। অর্থাৎ বচন আপনিতেই সত্য বা মিথ্যা হবে। কেউ জানলেও হবে, না জানলেও হবে। সুতরাং সত্যের প্রকৃতি সত্যের পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে না।

১। Affirmative Proposition

২। Negative Proposition

৩। Bertrand Russell: An Inquiary into Meaning and Truth, একাদশ অধ্যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সত্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষা দুইই জানা দরকার। আমরা এই অধ্যায়ে এই দু'টি প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করব।

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষার রূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা সকলেই একই মতবাদে বিশ্বাস করেন না। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি চারটি বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। এদের নাম স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ, প্রয়োগবাদ ও অনুরূপতাবাদ।[১] আমরা এখানে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

স্বতঃপ্রতীতিবাদ (Self-evidence Theory)

স্বতঃপ্রতীতিবাদ অনুসারে বচনের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। যে বচন সন্দেহই করা যায় না তাই সত্য। "৩+৪=৭"—এই বচন কেউ কখনও সন্দেহ করতে পারে না। সুতরাং এই বচনের সত্যতা স্বতঃই জানা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—সব বচনের সত্যতাই কি এভাবে জানা যায়? এর উত্তরে স্বতঃপ্রতীতিবাদীরা বলেন, সন্দেহাতীত বচন থেকে নিশ্চয়াত্মকভাবে[২] যে সমস্ত বচন এসেছে তাদের সত্যতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত বচন সন্দেহ করা যায় ব'লে মনে হয় তাদের যদি সন্দেহাতীত বচনের সঙ্গে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ থাকে তবে এই সমস্ত বচনও সন্দেহাতীত হবে। এমনি ক'রেই যে সমস্ত বচনের সত্যতা স্বতঃই ধরা পড়ে না তাদের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত-সত্যতা-সম্পন্ন বচনের মাধ্যমে জানা যায়।

ডেকার্টের মতে যে সমস্ত বচন স্পষ্ট ও পরিস্ফুট[৩] তাই সত্য। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সত্যের লক্ষণ। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতার অভাব মিথ্যাত্ব সূচনা করে। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা দেখেই আমরা বচনের সত্যতা নির্ণয় করি। সুতরাং ডেকার্টের মতে স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সত্যের স্বরূপ, আবার তাই সত্যতা পরীক্ষার উপায়। আত্মজ্ঞানেই[৪] এই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

১। স্বতঃপ্রতীতিবাদ—Self-evidence theory; সঙ্গতিবাদ—Coherence theory; প্রয়োগবাদ—Pragmatic theory; অনুরূপতাবাদ—Correspondence theory.

২। Necessarily.

৩। Clear and distinct.

৪। Self-Knowledge or Self-Consciousness.

ডেকার্টে বলেন, সব কিছুই সংশয় করা যায়, কিন্তু সংশয়কর্তা আত্মাকে কখনই সংশয় করা যায় না। আত্মাই সংশয় করে। সুতরাং আত্মাকে সংশয় করা সম্ভবই নয়। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে সংশয়ের কর্তা রূপে আত্মাকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ডেকার্টে বলেন, আত্ম-জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। আত্মজ্ঞান থেকে নিশ্চয়াত্মকভাবে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং ঈশ্বর-জ্ঞানের সত্যতারও স্বতঃপ্রতীতি স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর-জ্ঞানের সত্যতা থেকে নিশ্চয়াত্মক ভাবে ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতের জ্ঞানের সত্যতাও প্রকাশিত হয়। সুতরাং ডেকার্টের মতে আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা থেকেই ঈশ্বর-জ্ঞানের নিশ্চয়তা আর ঈশ্বর-জ্ঞানের নিশ্চয়তা থেকেই ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ-জ্ঞানের নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

স্পিনোজাও ডেকার্টের মতো স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতাকে সত্যের লক্ষণ ব'লে স্বীকার করেন। তিনিও মনে করেন যে, বচনের স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা দেখেই তার সত্যতা নির্ণয় করা যায়। তবে স্পিনোজা ডেকার্টের মতো আত্ম-জ্ঞানের সত্যতাকেই সবচেয়ে নিশ্চয়াত্মক ব'লে মনে করেন না। তাঁর মতে ঈশ্বর-জ্ঞানই সবচেয়ে নিশ্চয়াত্মক। ঈশ্বর-জ্ঞান থেকেই আত্ম-জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। জন লক্ আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা ব্যাপারে স্বতঃপ্রতীতিবাদ স্বীকার করেন। ডেকার্টের মতই তিনি মনে করেন, আত্মজ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়।

আত্মজ্ঞানের সত্যতা যে স্বতঃই প্রতীত হয়—একথা আমরাও অস্বীকার করি না। আমাদের আত্মা যে সত্য তা আমরা স্বতঃই জানতে পারি। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে আত্মজ্ঞানের সত্যতা স্বীকার করতে হয়—এ বিষয়ে ডেকার্টের সঙ্গে আমাদের কোন মতান্তর নেই। কিন্তু আত্মজ্ঞান যেভাবে নিশ্চয়াত্মক, অন্য কোন জ্ঞানই সেভাবে নিশ্চয়াত্মক নয়। আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অন্য সমস্ত জ্ঞানের নিশ্চয়তাই সংশয় করা যায়। ডেকার্টে নিজেই ত' অন্য সমস্ত জ্ঞানের সত্যতা সংশয় ক'রে একথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ, স্মৃতি এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানকে পর্যন্ত সংশয় করেছেন। সুতরাং এই সমস্ত জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত হয়, এমন কথা বলা যায় না। যদি এদের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত হ'ত তবে এদের সম্বন্ধে কোন সংশয়ই সম্ভব হ'ত না।

কোন বচনেরই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সকলের কাছে সমান নয়। একটি বচন যা একজনের কাছে স্পষ্ট ও পরিস্ফুট অন্যের কাছে তা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট নাও হ'তে

পারে। সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তা একদিন স্পষ্ট ও পরিস্ফুট জ্ঞান ব'লেই স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকাল তা কারও কাছেই সত্য নয়। সুতরাং তা স্পষ্ট ও পরিস্ফুটও নয়। কাজেই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সর্বজনগৃহীত সত্যের লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হতে পারে না।

আধুনিক কালে লস্কি[১] বলেন, সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অপরোক্ষ জ্ঞানেই জানা যায়। বস্তুর বিষয়গত প্রকাশই জ্ঞানের সত্যতা। মিথ্যাত্ব বলতে বস্তুর জ্ঞাতা-কেন্দ্রিক প্রকাশই বোঝায়। 'শঙ্খ সাদা' এই জ্ঞানে শঙ্খের প্রকাশ বিষয় অনুযায়ীই হয়েছে। সুতরাং এই জ্ঞান সত্য। আবার যখন বলা হয় 'শঙ্খ হলদে' তখন শঙ্খের জ্ঞাতাকেন্দ্রিক প্রকাশই দেখতে পাওয়া যায়। শঙ্খ বস্তুতঃ হলদে নয়। ব্যক্তিবিশেষের কাছেই শঙ্খের এই রূপ প্রকাশ পায়। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, লস্কির মতে জ্ঞান যখন বিষয়কে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে তখনই তা সত্য হয়; আর বিশ্বাস যখন বিষয়কে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না তখন তা মিথ্যা। সুতরাং লস্কির মতে বিষয়-অনুযায়িতাই সত্যতা। তবে তাঁর মতে সত্যতা অপরোক্ষ জ্ঞানেই জানা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-অনুযায়িতা আমরা সোজাসুজিই জানতে পারি। সুতরাং জ্ঞানের পরীক্ষা হিসেবে লস্কি স্বতঃপ্রতীতিবাদ স্বীকার করেন।

লস্কি বিষয়-অনুযায়িতাকে সত্যতা বলেছেন। এবিষয়ে আমরাও লস্কির সঙ্গে একমত। আমরাও মনে করি, জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তাকে সত্য বলা যায়; বিশ্বাস যদি বিষয়ের সঙ্গে না মেলে তবে তাকে মিথ্যাই বলতে হয়। বিশ্বাস হয় বিষয়ের সঙ্গে মেলে, না হয় মেলে না। সুতরাং বিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই হয় সত্য, না হয় মিথ্যা। কিন্তু আমাদের মতে বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই প্রতীত হয় না। লস্কি বলেন, বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আমরা সোজাসুজিই জানি। এ বিষয়ে লস্কির সঙ্গে আমরা একমত নই। যদি বিশ্বাসের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব স্বতঃই জানা যেত তবে দুনিয়ায় সংশয় ব'লে কিছু থাকত না। যখন কোন বস্তু সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস করি তখন যদি সোজাসুজি সেই বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জানতাম, তবে সেই বিশেষ বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা, এরকম কোন সংশয়ই আমাদের মনে উঠত না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা, এ নিয়ে আমাদের সংশয় থাকে। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে সাপ দেখে ত' আমরা প্রায়ই পালাই। যদি রজ্জুতে সর্প দেখেই বুঝতাম যে,

১। N.o. Lossky : The Intuitive Basis of knowledge. ২২৭-২২৯ পৃষ্ঠা।

দেখাটা ভুল, তবে নিশ্চয়ই মিথ্যা সাপের ভয়ে আমরা ছুটতাম না। সুতরাং বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই প্রতীত হয়, এমন কথা বলা যায় না।

আমরা আগেও বলছি আবার এখনও বলি যে কেবল আত্মজ্ঞানের বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। আত্মজ্ঞানের সত্যতা আমাদের কাছে স্বতঃই প্রতীত হয়। আত্মজ্ঞান এমনই নিশ্চয়াত্মক যে তার সত্যতা কখনই সংশয় করা যায় না। সুতরাং স্বতঃপ্রতীতিবাদ শুধু আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বীকার করা যায়, অন্যত্র এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ
(The Coherence Theory)

হেগেল ও হেগেলপন্থী ভাববাদী দর্শনে সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। হেগেল ও হেগেলপন্থীদের মতে সঙ্গতিই[১] সত্যের প্রকৃতি আর সঙ্গতি দিয়েই সত্যের পরীক্ষা হয়। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক আলেকজেণ্ডারও সত্যের পরীক্ষার জন্য সঙ্গতিবাদেরই সমর্থন করেন। অবশ্য তাঁর মতে সত্যের প্রকৃতি সঙ্গতিবাদ নির্ণয় করতে পারে না। তিনি মনে করেন, অনুরূপতাই[২] সত্যের প্রকৃতি প্রকাশ করে। জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে বা বিষয়ের অনুরূপ হয় তখনই জ্ঞানে 'সত্যতা' গুণ থাকে। জ্ঞানের এই 'সত্যতা' গুণ জানতে গেলে সঙ্গতির আশ্রয় নিতে হয়। রাসেল জ্ঞানের প্রকৃতি-নির্ণয়ে অনুরূপতাবাদ[৩] স্বীকার করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি যে সত্যের পরীক্ষা হিসেবে গৃহীত হ'তে পারে তা তিনি অস্বীকার করেন না। আমরা প্রথমে সঙ্গতি সম্বন্ধে রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের মত আলোচনা ক'রে হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের মতবাদ আলোচনা করব।

রাসেল বলেন, অনিশ্চিত মতের ক্ষেত্রে[৪] সঙ্গতি সত্যের পরীক্ষা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কতগুলো অনিশ্চিত মত যখন পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন হয় তখন প্রত্যেকটি মত আলাদা আলাদা এমনিতে যতটা অনিশ্চিত হয় তারা একত্রে ততটা

১। Coherence

২। Correspondence

৩। Correspondence theory

৪। In the case of probable opinions. রাসেলের এই মতবাদ তাঁর 'The Problems of Philosophy' নামক গ্রন্থের ২১৭ থেকে ২১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

অনিশ্চিত আর হয় না। এই ক্ষেত্রে সঙ্গতি অনিশ্চিত মতের খানিকটা নিশ্চয়তা সূচনা করে। এমনি করেই বিজ্ঞানে অনিশ্চিত মতের সঙ্গতি থেকে কতকটা নিশ্চয়তার উৎপত্তি হয়। দর্শনেও অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত মতের সঙ্গতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কতকগুলো অনিশ্চিত মত সঙ্গতিসম্পন্ন হ'লে অতি সহজে তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাসেল বলেন, সঙ্গতি অনিশ্চয়তা হ্রাস করে বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা উৎপন্ন করতে পারে না। যে সমস্ত মতের মধ্যে সঙ্গতি হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোন একটি যদি নিশ্চিত হয় তবে সব মতই নিশ্চিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যাপক আলেকজেণ্ডার সত্যের পরীক্ষার জন্য সঙ্গতির ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, কোন একটি বচনের সত্যতা অন্য বচনের সঙ্গে তার সঙ্গতি থেকেই নির্ণয় করা যায়। অবশ্য বচনের 'সত্যতা গুণ' সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে না। বচন যদি বাস্তবের[১] সঙ্গে মেলে তবেই বচন সত্য হয়। তবে বচনের এই সত্যতা জানার জন্য সঙ্গতিরই ব্যবহার করতে হয়। আমাদের সামাজিক জীবনে যে সমস্ত বচন প্রচলিত আছে তাদের সঙ্গে যখন কোন বচন মেলে তখন আমরা সেই বচনকে সত্য ব'লে জানতে বা মানতে পারি। সবাই যদি 'আকাশ সবুজ নয়, নীল' বলে, তবেই আকাশ নীল হয় না; আকাশ বস্তুতঃ নীল ব'লেই তা নীল। কিন্তু সবাই যখন আকাশকে নীল বলবে তখনই 'আকাশ সবুজ নয়, নীল' এই বচনকে সত্য ব'লে জানা যাবে।

আমরা যখন এই অধ্যায়ের উপসংহার করব তখন দেখা যাবে যে, সত্যের পরীক্ষার জন্য অনেক উপায়ের মধ্যে সঙ্গতিকে অন্যতম বলে মানতে আমরা রাজী আছি। সুতরাং রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কোন মতানৈক্য নেই। অন্যদিকেও তাঁদের মত আমরা মনে করি যে, অনুরূপতাই সত্যের প্রকৃতি প্রকাশ করে। সুতরাং রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়েই মতৈক্য আছে। তবে আলেকজেণ্ডার মনে করেন, একমাত্র সঙ্গতি দিয়েই সত্য নির্ণয় করা যায়। আমরা মনে করি, সত্য নির্ণয়ের আরও কয়েকটি উপায় আছে। এইখানেই আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে আমাদের মতভেদ।

এখন আমরা হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ আলোচনা করব। এঁদের মতে সঙ্গতি শুধু সত্য পরীক্ষার উপায় নয়; সত্যের প্রকৃতিও সূচনা করে।

১। Reality

হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের মতে কোন বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা কিছুই হ'তে পারে না। কোন বচন যখন অন্যান্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তখনই সেই বচনে 'সত্যতা' গুণের উদ্ভব হয়। সোজা কথায় কোন বিশেষ বচন যখন অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সংবদ্ধ মণ্ডলী[১] গ'ড়ে তোলে তখনই তা সত্য হয়। সংবদ্ধ মণ্ডলী গড়তে না পারলে কোন বচনই সত্য হ'তে পারে না। সঙ্গতি, সংবদ্ধতা বা সম্বাদ আর সত্যতা একই কথা। যখন আমরা বলি 'দুধ সাদা' তখন এই বচন স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা কিছুই নয়। কিন্তু যখন এই বচন অন্যান্য বচনের সঙ্গে মিলে একটি সঙ্গতিপূর্ণ মণ্ডলী রচনা করে তখনই তা সত্য হয়।

সব বচনই একই রকম মণ্ডলী রচনা করতে পারে না। যে বচনের মণ্ডলীর পরিধি যত বেশী বিস্তৃত সে বচন তত বেশী সত্য। আর যে বচনের মণ্ডলীর পরিধি যত বেশী সঙ্কুচিত সে বচনের সত্যতা তত বেশী কম। সুতরাং সমস্ত বচনের সত্যতাই এক রকমের নয়। কোন বচনের সত্যতা বেশী, কোন বচনের কম। বচনের সঙ্গতির মণ্ডলী বিস্তৃত হ'তে হ'তে চরম বিস্তৃতি লাভ করলেই চরম সত্য পাওয়া যায়। সঙ্গতির মণ্ডলী চরম বিস্তৃতি লাভ করলে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ সুসংবদ্ধ, পরম অভিজ্ঞতা[২] লাভ করা যায়। এই পরম অভিজ্ঞতাই চরম সত্য ও পরম তত্ত্ব। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কখনই চরম সঙ্গতি পাওয়া যায় না। সুতরাং সাধারণ কোন অভিজ্ঞতাই চরম সত্য নয়। অভিজ্ঞতায় চরম অসঙ্গতিও পাওয়া যায় না। কোন বচনের চরম অসঙ্গতি না থাকলে তাকে চরম মিথ্যা বলা যায় না। সুতরাং সাধারণ অভিজ্ঞতায় কোন বচনই চরম সত্য নয়, আবার চরম মিথ্যাও নয়। চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক মিথ্যা[৩], আবার চরম মিথ্যাত্বের দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক সত্য[৪]। ব্রেড্‌লি বলেন, ভ্রমও সত্য; তবে তা আংশিক সত্য[৫]। যেহেতু আংশিক সত্য সেজন্যই লোকে তাকে

১। Coherent system

২। Absolute Experience

৩। Relatively false

৪। Relatively true

৫। সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে ব্রেড্‌লির মতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য D. M. Datta ; The chief currents of contemporary philosophy গ্রন্থের ৭৭-৮২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভ্রম বলে। আবার অন্যদিক থেকে সমস্ত সত্যই আংশিক মিথ্যা, কারণ চরম সঙ্গতি সাধারণ কোন সত্যেই নেই।

সমালোচনা ঃ হেগেল ও হেগেল-পন্থীরা বলেন, কোন বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য নয়; অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েই তা সত্য হয়। কিন্তু, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা ত' স্বতন্ত্রভাবেই প্রত্যেক বচনের সত্যতা নির্ণয় করি। প্রত্যেক বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা। যদি কোন বচন স্বতন্ত্রভাবে সত্য না হয় তবে অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই তা সত্য হতে পারে না। সত্যতা বচনের আগন্তুক গুণ হয়। যে বচন সত্য তাতে সত্যতা স্বতঃই থাকে। যদি তা না থাকত তবে কখনই কোন অবস্থাতেই বচন সত্য হতে পারত না। কারণ যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না।[১] সত্যতার মত মিথ্যাত্বও বচনে স্বতঃই থাকে। যে বচন মিথ্যা তা স্বতঃই মিথ্যা। তবে বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব স্বতঃই জানা যায় না। এই জন্যই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ, হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতে সমস্ত বচনই আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক জীবনে সত্য ও মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই জানি। যা সত্য তা কখনই মিথ্যা নয়; আবার যা মিথ্যা তা কখনই সত্য নয়। "৭+৩=১০"—এই বচনকে কেউই আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা বলবেন না। এই বচন সম্পূর্ণ সত্য।

সত্য ও মিথ্যা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত না হত তবে কোন লোকব্যবহারই সম্ভব হত না। আমরা ব্যবহারিক জীবনে মিথ্যাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই পরিহার করি; আর সত্যকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু সবই যদি আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা হয়, তবে কোন কিছুই বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতবাদ লোকব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাঁরা হয়ত বলবেন যে, সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা 'সত্যতা' পদের বিচার করেন না। কিন্তু এখানে আমরা ব্যবহারিক জীবনের 'সত্যতা' নিয়েই আলোচনা করছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোন পারমার্থিক সত্যতা-বোধে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতে সঙ্গতি সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা উভয়ই প্রকাশ করে। তাঁরা বলেন, সঙ্গতিপূর্ণ বচনই সত্য। যদি প্রশ্ন করা

১। Ex nihilo nihil fit

যায়—এ কথা জানি কি ক'রে ? উত্তরে তাঁরা বলবেন, বচনের সঙ্গতি দিয়েই। এখানে চক্রক দোষের[১] উৎপত্তি হয়েছে।

চতুর্থতঃ বচনে সব সময়েই কোন না কোন বিষয়ের প্রতি নির্দেশ থাকে। বিষয় ছাড়া বচন হয় না। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিই বচনের সত্যতা ; বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিই বচনের মিথ্যাত্ব। হেগেল-পন্থী জোয়াকিমও[২] বিষয়ের সঙ্গে বচনের সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সমস্ত চিন্তাতেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা থাকে। সুতরাং চিন্তার সত্যতা খানিকটা পরিমাণে বিষয়ের সঙ্গতির ওপর নির্ভর করবেই।

আমরা বচনের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। কোন বচন যখন অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখন তাকে সত্য বলে জানা যায়। কিন্তু সেজন্য এই জাতীয় সঙ্গতিই বচনের সত্যতা সৃষ্টি করে না। বচনের সত্যতা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতির ওপরই নির্ভর করে। বচন যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তা সত্য ; আর যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে না তখনই তা মিথ্যা।[৩]

প্রয়োগবাদ (Pragmatic Theory)

উইলিয়ম জেমস্, এফ্. সি. এস. সিলার ও জন ডিউই সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা হিসেবে প্রয়োগবাদ প্রচার করেছেন। এঁরা সকলেই সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা-ব্যাপারে জীবনে প্রয়োগ বা ব্যবহারের প্রাধান্য স্বীকার করেন। সত্য জীবনের ব্যবহারে লাগে, ব্যবহারই সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি—এসব কথা এঁরা সকলেই বলেন। কিন্তু প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যায় এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সেজন্য আমরা এই তিনজন দার্শনিকের মতবাদ পৃথক পৃথক আলোচনা করব।

১। Vicious Circle or Arguing in a circle

২। Joachim : Nature of Truth

৩। নিউরথ, কারন্যাপ এবং হেম্পেলের মত লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা উভয়ই একপ্রকার সঙ্গতিবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এই মতের আলোচনা রাসেলের An Inquiry into Meaning and Truth গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

উইলিয়ম জেম্‌সের মতে ধারণার[১] কোন স্বতঃপ্রামাণ্য[২] নেই। সত্যতা ধারণার এক আগন্তুক গুণ বিশেষ। ঘটনাচক্রে ধারণা সত্যে পরিণত হয়। ধারণার সত্যতা একটি ঘটনা বিশেষ। প্রমাণ বা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যই[৩] এই ঘটনা। কোন ধারণার প্রামাণ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে যখন আমরা দেখি যে, ধারণাটি জীবনের কাজের সহায়ক হয় তখনই ধারণাটি সত্য হয়। কোন ধারণা জীবনের কাজের সহায়ক হলেই ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করা যায়। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হতে পারে। কোন এক স্থানে জলের ধারণা তখনই সত্য হয় যখন সেখানে গিয়ে জলে হাত পা ধুয়ে ক্লান্তি দূর করা যায়। জল যখন ক্লান্তি দূর করে তখনই জলের ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা যায়। এরকম ভাবে সর্বত্রই ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই ধারণার সত্যতা নির্ভর করে। তবে সর্বত্রই যে ধারণার সত্যতা ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যের ওপরই সরাসরি নির্ভর করে—এমন নয়। কোথাও কোথাও কোন ধারণা যখন অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে মেলে তখন তাকে সত্য বলা যায়। অবশ্য এই ধারণা যে সত্য ধারণার সঙ্গে মেলে তার সত্যতা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে। সুতরাং এই বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে সত্যতা পরোক্ষভাবে সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে। আমাদের দেয়ালে যে ঘড়ি দেখি তার সত্যতা এমনিতেই ঠিক হয়। দেয়ালে ঘড়ির প্রয়োজন না বুঝেই ও তার সময়জ্ঞাপন না দেখেই আমরা তা সত্য বলে ধরে নিই। এই ক্ষেত্রে অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে ঘড়ির ধারণা মেলে বলেই এরকম করে থাকি। সুতরাং ধারণার সত্যতা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে; তবে সত্যতা-পরীক্ষা সরাসরিও হতে পারে, আবার তা পরোক্ষ-ভাবেও হতে পারে। যখন কোন ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্য পরোক্ষ ভাবে স্থির করা হয়, তখন সেই ধারণা অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে মেলে ও এই সমস্ত অন্য ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্য আমরা সরাসরিই জানি।

সিলারের মতে ধারণার সত্যতা তাদের সাফল্যের উপরই নির্ভর করে। যখন আমরা কোন ধারণা পোষণ করি তখন সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। যদি এই ভবিষ্যৎবাণী

১। Idea

২। Intrinsic Validity

৩। Verification

সফল হয় তবেই ধারণা সত্য হয়ে ওঠে। যে কোন ধারণা থেকে আমরা যে কোন ভবিষ্যৎবাণী করি না কেন তাদের সবারই সত্যতার দাবী[১] আছে। তবে এই সত্যতার দাবী পূর্ণ হয় তখনই যখন ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মনে করুন, একটা গন্ধ পাওয়া গেল। যদি বলা যায়, অদূরের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে, তবে বুঝতে হবে—এই ধারণার একটা সত্যতার দাবী আছে। কিন্তু আমরা যদি বাগানে গিয়ে দেখি, সত্যিই সেখানে সুগন্ধি ফুল ফুটে রয়েছে, তবেই আমাদের ধারণা আসলে সত্য হবে।

ডিউই জেম্‌স ও সিলারের মতই ধারণার স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, সত্যতা সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানেরই ফল[২]। অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার ফলকেই সত্যতা বলা হয়। কোন একটা সন্দেহ উপস্থিত হলেই আমরা সন্দিগ্ধ বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। যখন অনুসন্ধান শেষ হয় তখন আর সন্দেহ থাকে না। সন্দেহের নিরসন হলেই সত্যতার উৎপত্তি হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। সেই গন্ধের উদাহরণই নেওয়া যাক। মনে করুন, বেড়াতে গিয়ে পথে একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া গেল। সন্দেহ হল—পথের পাশের বাড়িটার বাগান থেকেই বোধ হয় গন্ধটা আসছে। অনুসন্ধান শুরু হ'ল। চলতে চলতে বাগানে গিয়ে অনেক ফুল দেখা গেল। অপূর্ব তাদের গন্ধ। তখন আর নিজের ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না। সন্দেহ নিরসনের ফলে ধারণার সত্যতা উৎপন্ন হ'ল।

সমালোচনা ঃ প্রয়োগবাদীরা[৩] কেউই ধারণার স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। ধারণা থেকে উপযোগী ফল বা প্রত্যাশিত ব্যবহার পেলেই সে ধারণা সত্য হয়—মোটামুটি একথা সব প্রয়োগবাদীই বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যই সত্যতা। আমাদের মনে হয়, ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্য কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সত্যতা নির্ণয় করতে

১। Truth Claim

২। Truth is the outcome of competent and controlled enquiry or investigation.

৩। প্রয়োগবাদীদের বক্তব্য নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থে পাওয়া যাবে—

(ক) James : Pragmatism

(খ) Schiller : Logic for use এবং (গ) Dewey : Logic : The Thory of Inquiry.

পারে। কিন্তু ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যই সত্যতা নয়। প্রয়োগবাদীরা ধারণার সত্যতা ও সেই সত্যতা-পরীক্ষা—একই জিনিস বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা করে দেখেছি যে, সত্যতা ও তার পরীক্ষা এক নয়। সুতরাং প্রয়োগবাদীদের সত্যতা ও সত্যতার পরীক্ষার একত্রীকরণ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

প্রয়োগবাদীদের মতে সত্যতা ধারণার আগন্তুক গুণ। কিন্তু আমরা মনে করি, ধারণার সত্যতা স্বতঃই ধারণার মধ্যে থাকে। যদি তা না থাকত তবে কোন পরিবেশেই কখনই ধারণা সত্য হতে পারত না। যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না। ধারণার সত্যতা স্বতঃই ধারণাতে থাকে। কিন্তু আমরা তা স্বতঃই জানতে পারি না। ধারণার সত্যতা জানার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সাফল্য দেখে তার সত্যতা বিচার করা যায়। কিন্তু সর্বত্রই ধারণার সত্যতা এই উপায়ে নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা স্বীকার করার ফলেও জীবনে সাফল্য আসে। সুতরাং সাফল্য-লাভই সত্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। সত্যতার অনেক পরীক্ষার মধ্যে ধারণার সাফল্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুরূপতাবাদ (The Correspondence Theory)

বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যত মতবাদ হয়েছে তাদের মধ্যে অনুরূপতা-বাদই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মতবাদ অনুসারে বচন যদি বস্তুর সঙ্গে মেলে বা বস্তুর অনুরূপ হয় তবেই বচনকে সত্য বলা যায়; আর যদি বচন বস্তুর সঙ্গে না মেলে বা বস্তুর অনুরূপ না হয়, তবে বচন হয় মিথ্যা। সাধারণ লোক এইভাবেই বিশ্বাসের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব ঠিক ক'রে থাকে। সুতরাং অনুরূপতাবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ[১]ও বলা যেতে পারে। 'অনুরূপতার' ঠিক অর্থ কি এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা এখন 'অনুরূপতা' শব্দের বিভিন্ন দার্শনিক-ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

১। Common-sense theory

(১) **সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের**[১] **মতে** বিষয় বা বস্তু সোজাসুজিই জানা যায়। জ্ঞান হওয়ার সময় জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মাঝখানে কিছুই থাকে না। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিষয় সরাসরিই জানা যায়। এই মতবাদ অনুসারে জ্ঞান বিষয়ের অনুরূপ হয়, কারণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবেই বিষয় নির্দিষ্ট হয়। বিষয় না থাকলে কোন জ্ঞানই হতে পারে না।

এই অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ ব্যবহার করলে ভ্রমের কোন স্থান থাকে না। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন, প্রত্যেক জ্ঞানই বিষয়ের অনুরূপ হয়, কারণ বিষয় না থাকলে সেই বিষয়ের কোন জ্ঞানই হতে পারে না। এই অবস্থায় সর্বত্রই জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে। সব জ্ঞানই বিষয়ের অনুরূপ। সুতরাং সব জ্ঞানই সত্য। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের জীবনে অনেক সময়ই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। এই ভ্রান্তির ব্যাখ্যা কি হবে? এই কারণেই সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দটি গ্রহণ করা যায় না।

(২) **জন লকের মতো প্রতীকবাদীদের**[২] **মতে** বিষয় বা বস্তু সরাসরি জানা যায় না। ধারণাই আমরা সরাসরি জানি। ধারণা বস্তুর প্রতীক বিশেষ। যখন ধারণার সঙ্গে বস্তু মেলে তখন ধারণা সত্য হয়, আর যখন মেলে না তখন হয় মিথ্যা। যদি ধারণা বস্তুর ঠিক ঠিক প্রতীক বা প্রতিবিম্ব হয় তবেই ধারণাকে সত্য বলা যেতে পারে। সুতরাং এই মত অনুসারে 'ধারণা বস্তুর অনুরূপ'—এই কথা 'ধারণা বস্তুর সঠিক প্রতীক বা প্রতিবিম্ব'—এই অর্থই প্রকাশ করে।

ধারণা যদি বস্তুর সঠিক প্রতীক হলেই বস্তুর অনুরূপ হয়, তবে এই অনুরূপতা কখনই জানা যাবে না। লক বলেন, আমরা সরাসরি বস্তুর প্রতীক বা ধারণাই জানি, বস্তু বা বিষয় জানি না। বস্তু বা বিষয় যদি সরাসরি না জানা যায় তবে কোন বিশেষ ধারণা বস্তুর সঠিক প্রতীক কি না তাও জানা যায় না। যে ব্যক্তিকে আমরা কখনও দেখিনি তার ছবি[৩] ঠিক তার প্রতিবিম্ব কি না, তা আমরা বলতে পারি না। সুতরাং জন লকের অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ গ্রহণ করলে তা কখনও জানা যাবে না।

১। Naive Realists

২। Representationists

৩। Photo

(৩) **নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা**[১] 'অনুরূপতা' বলতে তাদাত্ম্য বা ঐক্য সম্পর্ক[২] বোঝেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞানে কোন তফাৎ নেই। জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞান একই জিনিস।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা যদি ঠিক হয় তবে আমরা যখন 'টেবিলের ওপর কোন বই' জানি, তখন আমাদের 'বই'এর জ্ঞান 'টেবিল'এর জ্ঞানের ওপর থাকা উচিত। কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কল্পনাও কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক করতে পারে না। সুতরাং তাদাত্ম্য অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দও কখনই গ্রহণ করা যায় না।

(৪) **বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা**[৩] মনে করেন, বিষয় সোজাসুজি জানা যায় না। সরাসরি বিষয়ের কতগুলো প্রভাবই জানা যায়। এই প্রভাব-গুলোর নাম স্বভাববিমিশ্র বা আন্তর সত্তা[৪]। এই স্বভাব-বিমিশ্র বস্তুও নয়, আবার মনের ধারণাও নয়। এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ-বিশেষ।[৫] স্বভাব-বিমিশ্র দেখেই আমরা বস্তুর কল্পনা ক'রে নিই। বস্তুর সঙ্গে স্বভাববিমিশ্রের যখন মিল হয়, তখন কল্পনা হয় সত্য; আর যখন মিল হয় না, তখন কল্পনা হয় মিথ্যা।

বস্তু দেশে ও কালে থাকে। স্বভাববিমিশ্র বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ। সুতরাং তা দেশে বা কালে থাকে না। কাজেই বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বভাববিমিশ্র কি ক'রে দেশ-কালস্থিত বস্তুর অনুরূপ হতে পারে, তা বোঝা যায় না। আর এই অনুরূপতা যদি বোঝা না যায় তবে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জ্ঞানের সত্যতা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ তাঁদের মতে স্বভাববিমিশ্র বস্তুর অনুরূপ হলেই জ্ঞান সত্য হয়। সুতরাং বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের 'অনুরূপতা' জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী, প্রতীকবাদী নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ও বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রদত্ত অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ

১। Neo-Realists

২। One-one relation. আমরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য পূর্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।

৩। Critical Realists

৪। Character-Complex or Esssence

৫। Logical entities

ব্যবহার করা যায় না। নৈয়ায়িক জনসন, 'অনুরূপতা' বলতে 'অনুযায়িতা'[১] বোঝেন। আমাদের মনে হয়, এই অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।[২] জ্ঞান যদি বস্তু অনুযায়ী হয় তবে জ্ঞানকে সত্য বলা যায়। আর জ্ঞান যখন বস্তু অনুযায়ী হয় না তখনই তা মিথ্যা। বিষয়-অনুযায়িতা বা অনুরূপতাই সত্যের প্রকৃতি। তবে এই প্রকৃতি অনুরূপতা দিয়ে জানা যায় না। সত্যতা জানতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সাফল্য বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব দেখেই জানতে হয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা-নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মতবাদ গ্রহণ করেছেন, আমাদের তা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন, বচন যখন বস্তু বা ঘটনার অনুযায়ী হয় তখনই তা সত্য। যখন এই বচন অন্য বচন বা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে তখনই আমরা তাকে সত্য বলে জানি। আমরা না জানলেও বচন সত্য হতে পারে। 'বৃষ্টি হচ্ছে' এই বচন সত্যিই বৃষ্টি হতে থাকলে সত্য হবে। এমন হতে পারে যে, তখন আমি ঘুমিয়ে আছি, বৃষ্টি যে হচ্ছে, তা আমি দেখলাম না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও 'বৃষ্টি হচ্ছে' এই বচন সত্য। তবে এই বচনের সত্যতা আমি জানব তখনই যখন দেখব—মাটি ভিজে, গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে বা এমন কিছু। অর্থাৎ বচনের সত্যতা বিষয়ের অনুরূপতার ওপরই নির্ভর করে; বচনের সত্যতা জানতে গেলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সঙ্গতি দেখতে হয়। কতগুলো বচনের সত্যতা অবশ্য সরাসরিই জানা যায়। 'আমার জ্বর হয়েছে' এই বচনের সত্যতা আমি গায়ে হাত দিলেই বুঝতে পারি। তবে এই জাতীয় বচনের সংখ্যা খুবই কম।[৩]

সিদ্ধান্ত:

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আলোচনা

১। Accordance

২। অবশ্য কেউ কেউ এই অর্থ সম্বন্ধেও আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেন, 'অনুরূপতা' এমন একটি পদ যার লক্ষণ দেওয়া যায় না (Correspondence is indefinable)—Ewing: The Fundamental Questions of Philosophy গ্রন্থের ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। Bertrand Russell: An Enquiry into Meaning and Truth গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করলেই আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। আমাদের মতে জ্ঞানের সত্যতার প্রকৃতি বিষয়-অনুরূপতা বা বিষয়-অনুযায়িতা বলেই গ্রহণ করা উচিত। বিশ্বাস যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তা সত্য, আর যখন মেলে না তখন তা মিথ্যা। সমস্ত বিশ্বাসই হয় বিষয়ের সঙ্গে মিলবে, নয়ত মিলবে না। সুতরাং বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই বিশ্বাসে থাকে। সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিশ্বাসের কোন আগন্তুক গুণ নয়। তবে জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষা করতে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। আত্মজ্ঞানের বেলায় জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। স্বতঃপ্রতীতিবাদ প্রসঙ্গে আমাদের এই মতবাদ আমরা আলোচনা করেছি। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা সম্বাদ জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষার উপায় হিসেবে গৃহীত হতে পারে। যখন কোন বিশেষ জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে মেলে তখন সেই জ্ঞানের সত্যতা নির্ণীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানের শুভফল দেখেও জ্ঞানের সত্যতার বিচার হতে পারে। **সুতরাং আমাদের মতে সত্যতা আর অনুরূপতা একই কথা। সত্যতা জানতে গেলে ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুসারে স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ বা প্রয়োগবাদ ব্যবহার করা যেতে পারে।**

নবম অধ্যায়

জড় ও জড়বাদ
(Matter and Materialism)

সাধারণ লোক দেশস্থিত সমস্ত বস্তুকেই জড় উপাদানে গঠিত[১] বলে মনে করে। বস্তুর শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তার যে উপাদানের পরিবর্তন হয় না জড়[২] বলতে সাধারণ লোক তাকেই বোঝায়। এখন প্রশ্ন হল—বস্তুর উপাদান এই জড়ের স্বরূপ কি?

আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখব খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বৎসরেরও আগে গ্রীস দেশে বস্তুর আদিম উপাদানের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জড় সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ এখন নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। কিন্তু সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ জড় সম্বন্ধে কি ভাবত, এই সব মতবাদ থেকে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষের প্রথম চিন্তা হিসেবে গ্রীক দার্শনিকদের এই সব মতবাদের একটা ঐতিহাসিক মুল্য আছে। আমরা সেজন্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে বস্তুর আদিম উপাদানের প্রকৃতিই প্রথম আলোচনা করব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে জড়ের প্রকৃতি

খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বছর আগে গ্রীস দেশের আইওনিয়া নামে এক দ্বীপে থেলিস প্রচার করেন, জলই বস্তুর আদিম উপাদান। তিনি চারদিকে জলবেষ্টিত এক দ্বীপে বাস করতেন। সুতরাং স্থলের চেয়ে জলের প্রাধান্যই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে জন্যই নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই থেলিস বলেছিলেন, জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর আদিম উপাদান হবে। কিন্তু, জলকে পৃথিবীর আদিম উপাদান বললে নানারকমের অসুবিধে দেখা দেয়। জল নিজেই একটি বস্তু। সুতরাং এই জল পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বস্তুর কি করে আদিম উপাদান হবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। সেজন্যই পরবর্তী দার্শনিক য়্যানাক্সিম্যাণ্ডার আদিম উপাদানের নাম দিলেন 'অসীম'[৩]। তিনি মনে করলেন, অসীম নিরাকার উপাদান থেকেই সসীম

১। Material ২। Matter
৩। The unbounded

সাকার বস্তুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু, য়্যানাক্সিমেনেস[১] এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, যা অনির্দিষ্ট তা নানারকমের নির্দিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি করবে কি করে? অনির্দিষ্ট ত নির্দিষ্টের উপাদান হতে পারে না। সেজন্যই তিনি বললেন, বায়ুই বস্তুর আদিম উপাদান। বায়ু অনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু তা জলের মত একান্ত সীমিতও নয়। সুতরাং বায়ুকেই আদিম উপাদান বলা যেতে পারে। হিরাক্লাইটাস এই মতে তুষ্ট নন। তিনি অগ্নিকেই জগতের আদিম উপাদান বললেন।

হিরাক্লাইটাসের পর এম্পেডোক্লেস পূর্বের সমস্ত মতগুলো সমন্বিত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ—এই চতুর্ভূতই সমস্ত বস্তুর আদিম উপাদান। যে কোন বস্তুই মাটি, জল, আগুন ও বাতাসের সমন্বয়ের ফলেই গঠিত হয়েছে। তবে এই গঠন-প্রক্রিয়ার সঞ্চালক হিসেবে তিনি 'অনুরাগ'[২] ও 'বিরাগ'[৩] এই দুই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরবর্তী কালে হয়ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই 'অনুরাগ' 'আকর্ষণ' ও 'বিরাগ' 'বিকর্ষণ' হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এম্পেডোক্লেসের পর ডেমোক্রাইটাস ও লিউকিপ্পাসের মতো পরমাণুবাদীদের[৪] আবির্ভাব হয়। এঁদের মতে সমস্ত বস্তুরই আদিম উপাদান কতকগুলো পরমাণু।[৫] এই পরমাণুগুলোর মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য[৬] নেই। এদের পার্থক্য কেবল আকার[৭] ও গঠনের[৮] বিভিন্নতায়। সমস্ত পরমাণুই সমসাত্ত্বিক[৯], অদৃশ্য ও অবিভাজ্য। কোন পরমাণুকেই আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাঙ্গা যায় না। পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাণুদের মধ্যে কোন স্বতঃ গতি[১০] নেই। গতি বাইরে থেকেই পরমাণুদের ওপর কাজ করে থাকে।

এই সব দার্শনিকদের পর য়্যানাক্সাগোরাস পরমাণুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক পরমাণুর সঙ্গেই অন্য পরমাণুর গুণগত পার্থক্য আছে। জগতে কত বিচিত্র বস্তুর সমাবেশই আমরা দেখতে পাই। এই

১। গ্রীক দার্শনিকদের নামগুলো ইংরেজীতে নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায়—Thales, Anaximander, Anaximenes, Heracleitus, Empedocles, Democritus, Leucippus, Anaxagoras.

২। Love
৩। Hate
৪। Atomists
৫। Atoms
৬। Qualitative difference
৭। Size
৮। Shape
৯। Homogeneous
১০। Intrinsic Motion

সমস্ত বিচিত্র বস্তুর আদিম উপাদান পরমাণুগুলোও যদি গুণের দিক থেকে বিচিত্র না হয় তবে জাগতিক বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। সুতরাং এক পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে গুণের দিক থেকে ভিন্ন, একথা বলতেই হবে। বস্তুর প্রকৃতি তার বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান তার দ্বারাই নির্ণীত হয়ে থাকে। স্বর্ণের মধ্যে অনেক পরমাণুই থাকে, তবে অন্য পরমাণুর চেয়ে স্বর্ণের পরমাণুই এখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। দুনিয়ায় যত গুণ আছে ঠিক তত প্রকারেরই পরমাণু আছে। এই সব পরমাণুর মধ্যে কোন সঞ্চালক শক্তি নেই। অ্যানাক্সাগোরাস্ মনে করেন, চেতস[১] বলে এক পদার্থ এই সব পরমাণুর মধ্যে বাইরে থেকে গতি সঞ্চারিত করে। চেতসের পরিচালনাতেই পরমাণুগুলো একত্রিত হয়ে এই সুন্দর বিশ্বের সৃষ্টি করেছে। জগতের রচনা চেতসের পরিচালনারই ফল।

অ্যানাক্সাগোরাসের পর গ্রীক দর্শনে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল নূতন ভাবে জড়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমরা এখন তাঁদের মতবাদই আলোচনা করব।

প্লেটোর দর্শনে ধারণাকেই[২] সত্য বলা হয়েছে। এই জগতের সমস্ত বস্তুই বিভিন্ন ধারণার অনুকৃতি[৩] মাত্র। অনুকরণ করতে গেলে এমন কিছু উপাদান দরকার যাতে ধারণাগুলোর রূপ ফোটানো যেতে পারে। প্লেটো ধারণার অনুকৃতির জন্য যে উপাদান দরকার তারই নাম দিয়েছেন 'জড়'। এই উপাদান একান্ত ভাবেই রূপহীন, গুণহীন ও আকারহীন। ধারণার রূপ গুণ ও আকারের দ্বারাই এই 'জড়' রূপায়িত ও আকারিত হয়ে জগতের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি করে। 'জড়' রূপহীন, গুণহীন ও আকারহীন বলে কোন কথা দিয়েই তার পরিচয় দেওয়া যায় না। প্লেটো সেজন্য 'জড়'কে 'শূন্য'[৪] নামে অভিহিত করেছেন। 'জড়' সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না বলেই সে যেন শূন্য।

প্লেটোর পর আরিস্টটল জড়কে নূতন ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সমস্ত জগৎটাই যেন একটি প্রক্রিয়া। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটি বিশেষ অবস্থা থেকে আর একটি বিশেষ অবস্থার দিকে গতি আছে। আরিস্টটল একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ওক বীজ ওক বৃক্ষে পরিণত হয়। পরিবর্তিত হওয়াই ওক বীজের স্বভাব এবং এই পরিবর্তন ওক বৃক্ষেই পর্যবসিত হয়। ওক বীজে ওক বৃক্ষের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। ওক বীজ থেকে ওক বৃক্ষ

১। Nous
২। Idea
৩। Copy
৪। Nothing

ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষই উৎপন্ন হয় না। আরিস্টটল মনে করেন, অন্য সমস্ত বিশেষ বস্তুই ওক বীজের মত। একদিক থেকে কোন একটা কিছু পরিবর্তিত হয়, অন্য দিক থেকে এই পরিবর্তন কোন একটা নির্দিষ্ট কিছুতে পরিণতি লাভ করে। আরিস্টটলের মতে যা-ই পরিবর্তিত হয় তারই নাম জড়[১]; আর যার জন্য কোন একটা বিশেষ বস্তু অন্য নির্দিষ্ট বস্তুতে পরিণতি লাভ করে তার নাম আকার।[২] ওক বীজ জড়, কারণ ওক বীজ ওক বৃক্ষে পরিণত হয়। যে অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য ওক বীজ অন্য কোন বৃক্ষে পরিণত না হয়ে ওক বৃক্ষে পরিণত হয়, তার নাম আকার। সুতরাং আরিস্টটলের মতে পরিবর্তিত হওয়াই জড়ের লক্ষণ।

কতিপয় আধুনিক দার্শনিকদের মতে জড়ের প্রকৃতি :

আধুনিক দর্শনে ডেকার্টে জড়ের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জড় মনের ঠিক বিপরীত তত্ত্ব। জড়ের বিস্তৃতি আছে, মনের বিস্তৃতি নেই। জড়ের কোন চেতনা নেই, চৈতন্য ছাড়া মন হতেই পারে না সুতরাং জড় ও মন সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব।

ডেকার্টের দর্শনে জড় ও বিস্তৃতি সমার্থক শব্দ। তিনি জড়ের গুণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। বিস্তার জড়ের মুখ্যগুণ।[৩] কিন্তু, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জড়ের গৌণ গুণ।[৪] অবশ্য মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট আকারে লকের দর্শনেই দেখা দিয়েছে। লকের মতে অভেদ্যতা, ঘনত্ব প্রভৃতি বস্তুর মুখ্য গুণ; রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি তার গৌণ গুণগুলো যে আধারে থাকে তারই নাম জড়। জড় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণের আধার রূপে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

বার্কলি গুণের অজ্ঞাত আধার রূপে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে যখনই আমরা কোন বস্তু দেখি তখন তার কতকগুলো গুণই দেখি, গুণের আধার বলে কিছুই পাই না। যা পাই না বা যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং বার্কলি বলেন, গুণের আধার বলে কোন জড় নেই, বস্তুর কতগুলো গুণই আছে। লক্ বস্তুর গুণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে সমস্ত গুণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় না লক্ তাদের নাম দিয়েছেন 'মুখ্য গুণ'। বস্তুর অভেদ্যতা, ঘনত্ব, আকৃতি প্রভৃতি এই জাতির

১। Matter
২। Form
৩। Primary Quality
৪। Secondary Qualities

অন্তর্গত। রূপ. রস, গন্ধ প্রভৃতি গুন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকমের হয়। সেজন্য লক্ এদের 'গৌণ গুণ' বলেছেন। বার্কলি মনে করেন, গুণের এই রকম দুই ভাগ মোটেই সঙ্গত নয়। রূপ, রস প্রভৃতি যেমন ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়, তেমনি বস্তুর আকার প্রভৃতিও বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের হয়। সুতরাং সমস্ত গুণ একই জাতির অন্তর্গত। রূপ, রস প্রভৃতি যেমন বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন হওয়ায় তাদের মন-সাপেক্ষ বলা হয়, আকার প্রভৃতিও সেই কারণে মন-সাপেক্ষ হবে। সুতরাং বিশ্বে বস্তু বলে যা পাই তা মন-সাপেক্ষ কতকগুলো গুণের সমষ্টি মাত্র। মন-সাপেক্ষ গুণকে মনের ধারণাও[১] বলা যেতে পারে। সুতরাং দুনিয়ায় মন ও মনের ধারণাই আছে। দুনিয়ায় যা আমরা জড় বলে মনে করি তা সম্পূর্ণভাবে জড়তামুক্ত। জড় আসলে মনের কতকগুলো ধারণার সমষ্টিমাত্র। বার্কলির এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে 'জড়ের নির্জড়ীকরণ তত্ত্ব'[২] নামে পরিচিত। বার্কলি জড়ের জাড্য দূর করে তাকে নির্জড় মনের ধারণায় পরিণত করেছেন।

বার্কলির এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিই উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা বার্কলির বিজ্ঞানবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই সে সমস্ত যুক্তির আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য আমরা এখানে আর সেই আলোচনা করব না।

লাইব্‌নিজের মতে চিৎপরমাণুই জগতের একমাত্র দ্রব্য। এই চিৎপরমাণু চেতনধর্মী। গতিশীলতা তার স্বরূপগত। সব চিৎপরমাণুই গতিশীল হলেও গতিশীলতার মাত্রা সবার মধ্যে সমান নয়। কোন কোন চিৎপরমাণুর গতিশীলতার মাত্রা এত কম যে তাদের স্থিতিশীল বলে ভুল হয়। চিৎপরমাণুর স্থিতিশীলতার ধারণা থেকেই জড়ের ধারণা আসে। সুতরাং জড়ের ধারণা আসলে এক ভ্রান্ত ধারণা। চেতন পরমাণুর অপেক্ষাকৃত কম গতিশীলতা দেখে স্থিতিশীলতা বা জাড্যের এই ধারণার সৃষ্টি হয়।

লাইব্‌নিজের ভাববাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদের দোষত্রুটি আলোচনা করেছি। এখানে আবার তার পুনরুক্তি না করাই ভালো।

অত্যন্ত আধুনিককালে রাসেল, হোয়াইটহেড্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা আধুনিক বিজ্ঞানীদের জড়ের ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। আমরা 'দ্রব্য' আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলেছি। এখন বিজ্ঞানীরা জড়ের সম্বন্ধে যা বলেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১। Ideas ২। The theory of dematerialisation of matter.

বিজ্ঞানীদের মতে জড়ের প্রকৃতি : নিশ্চল ও সচল জড়বাদ

(Static and Dynamic Theories of Matter)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রসায়নবিদ ডাল্টন নূতনভাবে আবার পরমাণুবাদের পত্তন করেন। তাঁর মতে যে কোন জড়পদার্থ ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানে[১] পৌঁছাই যাকে আর ভাঙা যায় না। এদেরই পরমাণু[২] বলা হয়। এই সমস্ত পরমাণুর মধ্যে কোন গতি নেই। এই পরমাণুগুলো একান্তভাবেই নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়। এদের কোন কোষ[৩] নেই। সুতরাং এরা অভেদ্য ও অবিভাজ্য। অভেদ্যতাই এই সব পরমাণুর প্রধান গুণ। যদিও পরমাণুর নিজস্ব কোন গতি নেই তবু বাইরে থেকে পরমাণুর ওপর গতি প্রয়োগ করলে এরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে। এই সমস্ত পরমাণুর স্বরূপতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ গুণ নেই। পরমাণুদের অবস্থান ও পারস্পরিক সংগঠন[৪] থেকেই এই সব গৌণ গুণের উৎপত্তি হয়। দুনিয়ায় সমস্ত বস্তুই পরমাণুর সংগঠন ও সংযোজনের ফল। ডাল্টনের এই মতবাদকে নিশ্চল জড়বাদ[৫] বলা হয়। আমরা আগেই বলেছি, এই মতবাদ অনুসারে পরমাণুর নিজস্ব কোন গতি নেই ; পরমাণু স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল।

এই নিশ্চল জড়বাদ সহজে পরিবর্তন ও গতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। পরমাণুগুলো নিশ্চল হওয়ার জন্য নিশ্চল জড়বাদীদের পরমাণুর অতিরিক্ত গতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই গতির সঙ্গে পরমাণুর সম্পর্ক কি তা সহজে নির্ণয় করা যায় না। সেজন্যই পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে নিশ্চল বলেননি। তাঁদের মতে পরমাণু গতি বা শক্তির আধার। নিশ্চল জড়বাদীদের পরমাণু ও গতির দ্বৈত ভাব[৬] এমনি ক'রেই সচল জড়বাদীদের জড়ের ধারণায় পরমাণু ও গতির অদ্বৈতভাবে পরিণত হয়েছে।

১। Minute Particle
২। Atom
৩। Pore
৪। Arrangement
৫। Static theory of Matter
৬। Dualism

সচল জড়বাদের বিভিন্ন রূপ

(Different Forms of Dynamic Theory of Matter)

(১) ভাশ্চভিচ্ ও ফেরাডে মনে করেন, বস্তুর আদিম উপাদান নিষ্ক্রিয় ও অভেদ্য পরমাণু নয়। তাঁদের মতে, বস্তুর আদিম উপাদান কতকগুলো 'শক্তি-কেন্দ্র বিশেষ'[১]। এই সমস্ত শক্তি-কেন্দ্র থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি উদ্ভূত হয়ে ঈথার সমুদ্রের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে।

(২) পরবর্তী কালে লর্ড কেলভিন বলেছেন, পরমাণুগুলো ঈথার সমুদ্রের কতকগুলো আবর্তনচক্র[২] মাত্র। এই আবর্তনচক্রগুলো আবর্তনের দ্রুততার জন্য এমন ঘন আকার ধারণ করে যে, তাদের অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। হেলম্হল্চ (Helmholtz) গাণিতিক নিয়ম অনুসারে এই আবর্তনচক্রের গুণাবলী ব্যাখ্যা ক'রে লর্ড কেল্ভিনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

(৩) অস্টওয়াল্ড ও অন্যান্য অনেকের মতেই পরমাণু ফেরাডের শক্তিকেন্দ্র বা কেল্ভিনের আবর্তনচক্রের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। তাঁদের মতে প্রত্যেক পরমাণু এক একটি 'শক্তিগৃহ'[৩] বিশেষ। এই শক্তিগুলো অত্যন্ত জটিল ও সাধারণতঃ তারা সাম্যাবস্থাতেই থাকে। কিন্তু শক্তির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হ'লে তাদের প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা হয়।

(৪) রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণুর অন্য আর এক চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক পরমাণুতেই বিদ্যুৎশক্তির খেলা দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলেই ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি[৪] থাকে। এই ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিকে ঘিরে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি[৫] বা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা একটি তুলনা দিয়ে বোঝান যেতে পারে। সৌরমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে কতগুলো গ্রহ ও উপগ্রহ তার চারিদিকে ঘুরতে থাকে। পরমাণুও সৌরমণ্ডলের মতই একটি বিদ্যুৎমণ্ডল। এই মণ্ডলের কেন্দ্রে ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি ও চারিদিকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিকে সাধারণতঃ নিউক্লিয়াস বলা হয়। কখন কখনও নিউক্লিয়াসকে প্রোটন নামেও পরিচয় দেওয়া হয়।

১। Centres of Force
২। Whirlpools
৩। শক্তিগৃহ—Magazine of force
৪। Positive electric charge
৫। Negative electric charge

অধুনা দেখা গিয়েছে যে, প্রোটন ও ইলেকট্রন ছাড়াও পজিট্রন ও নিউট্রন নামে পরমাণুর আরও তুটি উপাদান আছে। পজিট্রন ও ইলেকট্রনের ভর[১] পরিমাণে সমান। কিন্তু পজিট্রন ইলেকট্রনের মত ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নয়। পজিট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি।

(৫) অত্যন্ত আধুনিক কালে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও কোয়াণ্টামবাদ জড় সম্বন্ধে প্রাচীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এতদিন পদার্থবিদ্যায় শক্তিকে[২] ভরের[৩] মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে। এখন আপেক্ষিকবাদী ও কোয়াণ্টাম-বাদীরা ভরকে শক্তির রূপান্তর বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। আপেক্ষিকবাদীরা দেখিয়েছেন যে, কোন জিনিসেরই ভর সর্বদা সমান থাকে না। দ্রুতগতির ফলে ভর খুব বৃদ্ধি পায়। আপেক্ষিকবাদীদের মতে সব গতিই আপেক্ষিক। যে কোন বস্তুর তুলনায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষকগণের বিভিন্ন আপেক্ষিক গতি। সুতরাং বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বস্তুর ভরের বিভিন্ন হিসেব দেন। আপেক্ষিকবাদীরা বলেন, এই সব হিসেবই যুক্তিযুক্ত। কোন পর্যবেক্ষক যদি কোন বস্তুর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে স্থির থাকেন তবে তিনি বস্তুর ভরের যে হিসেব দেবেন তাই ভরের মূল হিসেব বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কোয়াণ্টামবাদ শক্তি ও ভরের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও বদলে দিয়েছে। কোয়াণ্টামবাদীরা প্রমাণ করেছেন যে, বিকিরণের ফলে যতটা শক্তির ক্ষয় হয়, ঠিক ততটাই ভরেরও ক্ষয় হয়। সুতরাং শক্তির সঙ্গে ভরের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভরকে শক্তির রূপান্তর বলেই কল্পনা করা যেতে পারে।

জড় সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই সব মতবাদ থেকে বোঝা যাচ্ছে, জড় অচ্ছেদ্য, কঠিন ও নিশ্চল কোন সত্তা নয়। শক্তিই জড়ের আসল রূপ। সুতরাং জড় বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি আসলে জড় তা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড়ের নিশ্চলতা দূর ক'রে তার শক্তিরূপ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড়কে সত্যিই নির্জড়ীকৃত[৪] করে ফেলেছেন। আমরা এতদিন জড় বলতে যে নিশ্চল কঠিন পদার্থ বুঝতাম, জড় আদপেই তা নয়। সেজন্য কেউ

১। Mass
২। Energy
৩। Mass
৪। Dematerialisation of Matter

কেউ রসিকতা ক'রে বলেন, **আমরা আজকাল জড়ের এত বেশী পরিচয় পেয়েছি যে, আর আমরা জড়বাদী থাকতে পারি না।** সাধারণতঃ জড়বাদীরা জড়কে নিশ্চল ও কঠিন পদার্থ বলে মনে করেন। কিন্তু আজকাল সেই ধারণা বদলে গেছে। সুতরাং আধুনিক কালে কেউই আর সাধারণ অর্থে জড়বাদী হতে পারেন না।

জড় সম্বন্ধে নূতন ধারণার দার্শনিক তাৎপর্য

আধুনিক বিজ্ঞান জড় সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করে তাতে যে জড়বাদ নিশ্চল ও অভেদ্য জড়কে বিশ্বের চরমতত্ত্ব বলে তা আর গ্রহণ করা যায় না।

রাসেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, জড় সম্বন্ধে এই ধারণার ফলে দার্শনিকেরা এতকাল সম্পূর্ণ স্থির ও অপরিবর্তনীয় যে দ্রব্যের ধারণা পোষণ করেছেন তা বর্জন করতে হয়। আমরা 'দ্রব্য' সম্বন্ধে আলোচনার সময় একথা পুর্বেই বলেছি।

ইলেকট্রনের ব্যবহার নির্দিষ্ট করে বলা যায় না এই যুক্তিতেই অনেক দার্শনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে কারণের নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করেছেন। আমরা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আলোচনার সময় একথা বলেছি।

অনেক দার্শনিক আবার বৈজ্ঞানিকদের জড়কে শক্তিতে রূপান্তরকে অধ্যাত্ম-বাদের সমর্থক ব্যাপার বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, এই শক্তি যদি হয় চিৎশক্তি তবে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা চিৎতত্ত্বই যে বিশ্বের মুলতত্ত্ব তা মানতে হয় এবং একথাই ত অধ্যাত্মবাদ প্রচার করে। সুতরাং এঁদের মতে আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা না করে তার সহায়ক হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড় যে শক্তি তা চিৎশক্তি, এমন কথা বলেননি।

জড়বাদ (Materialism)

জড়বাদ জড়কেই বিশ্বের চরমতত্ত্ব বলে মনে করে। জড়বাদীদের মতে, প্রাণ, মন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই জড়েরই সৃষ্টি। জড় বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা—এই দুই গুণসম্পন্ন। জড়ের কার্যাবলীর জন্য গতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। জড় ও গতি—এই দুই মিলে যান্ত্রিকভাবে বিশ্বের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন করেছে। সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের স্থান নেই। যন্ত্র যেমন নির্বোধের মত অনবরত কাজ ক'রে যায়, জড় ও গতি তেমনি কাজ ক'রে চলেছে। এই

কর্মপ্রণালীর মধ্যে প্রত্যেক পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যন্ত্রের যেমন কোন স্বাধীনতা নেই, তেমনি এই বিশ্ব-ব্যাপারেও স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। সব কিছুই ছকে বাঁধা নির্দিষ্ট প্রণালীতে ঘটে যাচ্ছে।

জড়বাদের সপক্ষে প্রায়ই একাধিক যুক্তি উত্থাপন করতে দেখা যায়। প্রথমতঃ জড়বাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা মানবার কোন অধিকার আমাদের নেই। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা শুধু জড়ের অস্তিত্বই জানতে পারি। সুতরাং জড়ই একমাত্র সত্য। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সুতরাং এই সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্বীকৃতি অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জীবন-কোষ[১] যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়, তা জানা গেছে। সুতরাং জীবনকে জড়াতিরিক্ত কোন সত্তা বলে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। জীবন জড়েরই সৃষ্টি।

তৃতীয়তঃ, অভিজ্ঞতায় দৈহিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানসিক বিভিন্ন অবস্থার অত্যন্ত নিবিড় সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়। দেহ অসুস্থ হলে সকলেই মানসিক অশান্তি ভোগ করে। মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের বা মানুষের চেতনার সম্পর্ক আরও নিবিড়। মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানে আঘাত লাগলে মানুষের চৈতন্য লুপ্ত হয়। সুতরাং চৈতন্য যে মস্তিষ্কেরই কোন একটা গুণ, প্রভাব বা কার্য তা অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্থতঃ অভিব্যক্তিবাদ[২] প্রচারিত হওয়ার পর জড় থেকে কি ক'রে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব হয় তা দেখান সহজ হয়েছে। সুতরাং এখন জড়বাদ গ্রহণের পক্ষে আর কোন বাধাই নেই।

আমরা জড়বাদের এই সমস্ত যুক্তি অতি সহজেই খণ্ডন করতে পারি। জড়বাদের প্রথম যুক্তি অত্যন্ত লঘু বলে মনে হয়। প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ নয় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ তা প্রত্যক্ষ করে জানা যায় না। সুতরাং যাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলেন, তাঁরা নিজেদের মতের প্রামাণ্যই প্রত্যক্ষ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। কাজেই যাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলেন, তাঁরা স্বমত

১। Protoplasmic cell

২। The theory of Evolution

প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ মানতে বাধা। সুতরাং প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ মনে ক'রে জড়বাদীরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানীরা মৃত জীবন-কোষ বিশ্লেষণ ক'রেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস বের করেছেন। সুতরাং জীবনের আসল পরিচয় এই মৃত জীবন-কোষের বিশ্লেষণ থেকে কখনই পাওয়া যাবে না। কাজেই জীবন জড়াতিরিক্ত নয়, এমন কথা বলার কোন সঙ্গত কারণ এখনও পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়তঃ, দেহের সঙ্গে মনের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলেই মনকে দেহের এক বিশেষ গুণ বা কার্য বলা যায় না। যদি তা বলা যায়, তবে অনুরূপভাবে দেহকেও মনেরই এক বিশেষ রূপ বা কার্য বলা যেতে পারে। সুতরাং এই যুক্তি জড়বাদীদের সিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে সমর্থন করে না। মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে চৈতন্য লুপ্ত হয় বলে চৈতন্যকে মস্তিষ্কের কার্যও বলা যায় না। এমন ভাবা অসম্ভব নয় যে, চৈতন্যের প্রকাশ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়েই হয়। প্রকাশ-মাধ্যম যখন বিকল হয় তখন চৈতন্য প্রকাশিত হতে পারে না। চৈতন্যের প্রকাশ না হওয়া আর চৈতন্য না থাকা এক কথা নয়। সুতরাং প্রকাশ-মাধ্যমকে চৈতন্যের কারণ বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চতুর্থতঃ, অভিব্যক্তিবাদ কি করে জড় থেকে প্রাণ ও মন আসে তার সদ্ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয় না। প্রাণের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা জড়ের নেই। সুতরাং জড় কি ক'রে প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করবে তা আমরা বুঝি না। মন চৈতন্যযুক্ত। জড় একান্তভাবেই অচেতন। সুতরাং অচেতন জড় থেকে চেতন মনের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করা যায় না।

জড়বাদীরা জ্ঞান, প্রাণ, মন, নীতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখন তাঁদের এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

জড়বাদ ও জ্ঞান

জড়বাদীদের মতে চৈতন্য মস্তিষ্কের গুণ বা কার্য। সুতরাং অভিজ্ঞতা মস্তিষ্ক-যন্ত্রের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্ত্রী সংক্ষুব্ধ হয়। মস্তিষ্ক-যন্ত্রে এই

সংক্ষোভ প্রবেশ করলেই 'সংবেদন'[১]-এর সৃষ্টি হয়। এই সংবেদনই প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান। সুতরাং জড়বাদ জ্ঞানের ব্যাপারে 'সংবেদনবাদ'[২] গ্রহণ করেছে। জড়বাদীরা বিভিন্ন সংবেদনের কোন অন্তঃস্যূত ঐক্যে বিশ্বাস করেন না।

সংবেদনবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্নায়ুতন্ত্রীর সংক্ষোভ মস্তিষ্ক যন্ত্রে প্রবেশ করলে সংবেদন হয় বটে, কিন্তু এই সংবেদন কখনই জ্ঞান নয়। মন বা চৈতন্য যখন সক্রিয়ভাবে সংবেদনের একটা ব্যাখ্যা দেয় তখনই সত্যিকারের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। মনে করুন, বাইরে একটি আলো দেখা গেল। এই ক্ষেত্রে প্রথমে চক্ষুর সঙ্গে আলোর সংযোগ হওয়া মাত্র চক্ষুর স্নায়ুতন্ত্রীতে সংক্ষোভ উপস্থিত হবে। এই সংক্ষোভ মস্তিষ্কে গেলেই তা সংবেদন বা একটা কিছুর সংক্ষোভ বলে মনে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মন বা চৈতন্য এই সংক্ষোভের হেতুকে আলো বলে ব্যাখ্যা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর কোন জ্ঞান হবে না। সুতরাং জ্ঞান হ'তে গেলে সংবেদনের ব্যাখ্যা দরকার। এই ব্যাখ্যা মন বা চৈতন্যই দিয়ে থাকে। শুধু সংবেদন কখনও জ্ঞান হ'তে পারে না। কাজেই জড়বাদীদের জ্ঞানের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

সংবেদনবাদের আর একটা অসুবিধেও আছে। সংবেদনবাদীদের মতে সংবেদনগুলো একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন সংবেদন কখনই সম্যক জ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন সংবেদনের ঐক্য দরকার। প্রত্যেক সংবেদনে আমরা বস্তুর কোন না কোন গুণের সঙ্গে পরিচিত হই। মনে করুন—একটি কমলালেবু আমাদের চোখের সামনে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংবেদনের সাহায্যে কমলালেবুর বিভিন্ন গুন আমাদের জ্ঞান-গোচর হবে। এই গুণগুলো একত্র করলেই কমলালেবুর জ্ঞান হবে। সুতরাং বস্তুর সম্যক জ্ঞানের জন্য সংবেদনের ঐক্য দরকার। কিন্তু জড়বাদীরা এই ঐক্য স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে বস্তু-জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যাই হতে পারে না।

জড়বাদ ও প্রাণ

জড়বাদীদের মতে জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়। তাঁরা মনে করেন, প্রাণ কিছু একটা অলৌকিক তত্ত্ব নয়। প্রাণকে জড়ের চেয়ে একটু জটিল বলা যেতে পারে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে প্রাণের কোন গুণগত পার্থক্য নেই। সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি জড় থেকে যান্ত্রিকভাবে হবে—একথা মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

১। Sensation ২। Sensationism

আমাদের ধারণা, জড় থেকে কখনই প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না। গতি বা চলার ক্ষমতাই প্রাণের বিশেষ লক্ষণ। যে-কোন প্রাণীরই গতি আছে। যখন কোন প্রাণীর একেবারেই গতি থাকে না তখন তাকে মৃত বলা হয়। জড়বাদীদের মতে জড় নিশ্চল। সুতরাং এই নিশ্চল জড় থেকে কখনই চঞ্চল প্রাণের উদ্ভব হতে পারে না। প্রাণী বংশবৃদ্ধি করতে পারে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে। প্রাণীর উন্মেষ ভেতর থেকেই সম্ভব হয়। কিন্তু জড়ের এই সমস্ত ক্ষমতা একেবারেই নেই। সুতরাং জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়।

জড়বাদ ও মন

জড়বাদ মন বা চৈতন্যের কোন আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করে না। কোন কোন জড়বাদীর মতে মন বা চৈতন্য প্রাণের চেয়েও জটিল। প্রাণ আবার জড়ের চেয়ে জটিল। সুতরাং জড়ের সঙ্গে মন বা চৈতন্যের পার্থক্য শুধু মাত্রাগত, গুণগত নয়। জড় থেকে যেমন প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, জড় থেকে তেমনি মন বা চৈতন্যেরও উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য জড়বাদীরা আবার জড় ও চৈতন্যের সম্পর্ক অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

কারো কারো মতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো আসলে দৈহিক প্রক্রিয়াই বটে। মন আর দেহের মধ্যে স্বরূপতঃ তাদাত্ম্য সম্পর্কই আছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে মন আর দেহ বা জড় একই। কুল্পে এই মতবাদকে 'তাদাত্ম্যসূচক জড়বাদ'[১] নামে অভিহিত করেছেন। এই মতবাদ জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। তাদাত্ম্যসূচক জড়বাদ জড়বাদের চরমরূপ[২]।

জড়বাদীদের মধ্যে অন্য কেউ কেউ জড় ও মনকে সম্পূর্ণ এক বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে মন বা চৈতন্য মস্তিষ্ক থেকে উত্থিত একটা আলোর চক্রবিশেষ[৩]। লোহায় লোহায় ঘর্ষণে যেমন আগুনের রেখা বেরিয়ে আসে তেমনি মস্তিষ্ক থেকে আলোকরেখার উৎপত্তি হয়। এই আলোকরেখার নামই মন বা চৈতন্য। চৈতন্য জড়ের একটি কার্যবিশেষ। এই মতবাদে চৈতন্যকে উপ-বস্তু[৪] বলে অভিহিত করা হয়েছে। জড়ই আসল বস্তু। জড় থেকে সৃষ্ট চৈতন্যের জড়ের মত বস্তু-সত্তা নেই। সুতরাং চৈতন্যকে উপ-বস্তু বলাই উচিত।

১। Equative Materialism ; কুল্পের Metaphysics গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

২। Extreme form

৩। Halo round the brain

৪। Epi-Phenomenon

কুল্পে এই জাতীয় জড়বাদকে 'কারণবাচক জড়বাদ'[১] নামে পরিচয় দিয়েছেন। এই মতবাদ অনুসারে জড়ই চৈতন্যের কারণ।

কুল্পের মতে আর এক দলের জড়বাদীরও দেখা পাওয়া যায়। এই সমস্ত জড়-বাদীরা মনে করেন, জড় ও চৈতন্য এক নয়, আবার চৈতন্য জড়ের কার্যও নয়; চৈতন্য জড়ের গুণ বিশেষ। কুল্পে এই মতবাদের নাম দিয়েছেন 'গুণবাচক জড়বাদ[২]।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন জড়বাদীই জড়ের ওপর মন বা চৈতন্যের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। কারও কারও মতে চৈতন্য জটিল জড় বিশেষ। কেউ বা জড় ও চৈতন্যকে একান্ত অভিন্ন বলে মনে করেন। অন্য কেউ চৈতন্যকে জড়ের কার্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আবার কেউ চৈতন্যকে জড়ের গুণ বলে মনে করেন। এঁদের সকলের মতেই চৈতন্যের কোন স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা নেই। আমাদের মনে হয়, চৈতন্য কখনই জড়-নির্ভর হতে পারে না। জড় ও চৈতন্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জড় অচেতন। সুতরাং জড় কখনও চৈতন্যের কারণ হতে পারে না। জড়াতিরিক্ত চৈতন্য না থাকলে জড়কে জড় বলেই জানা যেত না। কারণ চৈতন্য ছাড়া কোন জ্ঞান হয় না। সুতরাং জড়বাদীদের চৈতন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।[৩]

১। Causal Materialism

২। Attributive Materialism

৩। এই প্রসঙ্গে অধ্যাত্মবাদী হেগেল ও কেয়ার্ডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। হেগেল বলেন, "all philosophy is essentially idealism.........the principles of ancient or modern philosophies, Water (Thales) or matter or atoms are thoughts or Universal.........not things." হেগেলের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ Stace লিখিত Hegel গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

কেয়ার্ড বলেছেন, "You cannot get to mind as an ultimate product of matter for in the very attempt to do so, you have already begun with mind. The earlist step of every such enquiry involves categories of thought and it is in terms of thought that the very problem you are investigating can be so much stated. You cannot start in your investigations (i.e. in the enqniry into the nature of reality) with bare, self identical objective facts stripped of every ideal element or contribution from thought. The least and lowest fact of outward observation is not an independent entity—fact minus mind, and out of which mind may, somehow or other,

জড়বাদ ও নীতি (Materialism and Morality)

ইচ্ছা বা চেষ্টায় স্বাধীনতা[১] না থাকলে কোন কাজেরই নৈতিক বিচার চলে না। রামবাবু যে কাজ নিজের ইচ্ছায় করেননি সেই কাজের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। যে কাজের জন্য রামবাবু দায়ী নন, সেই কাজ দেখে রামবাবুকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যাবে না। কোন কাজের ওপর ভালো বা মন্দ বলাই নৈতিক বিচার। সুতরাং ইচ্ছায় বা চেষ্টায় স্বাধীনতা ছাড়া নীতি সম্পূর্ণ ভাবেই অর্থহীন।

জড়বাদীদের মতে সমস্ত মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন মানসিক ক্রিয়ারই স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছা বা চেষ্টা[২] মানসিক ক্রিয়া। সুতরাং জড়বাদীদের মতে ইচ্ছা বা চেষ্টায় স্বাধীনতা নেই। আমরা আগেই দেখেছি, ইচ্ছা বা চেষ্টায় স্বাধীনতা না থাকলে নীতির[৩] কোন অর্থ হয় না। সুতরাং জড়বাদীরা নীতিকে একান্তভাবেই নিরর্থক ক'রে ফেলেছেন। জড়বাদীরা বলেন, যদি নীতির কথা বলতেই হয় তবে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগকেই একমাত্র আদর্শ বলতে হবে। এই দেহ ছাড়া আমাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং দেহের সম্ভোগই আমাদের একমাত্র কাম্য। জড়বাদীদের নৈতিক আদর্শকে ভোগবাদ বা সুখবাদ[৪] বলা যেতে পারে।

জড়াবাদীদের ভোগবাদ মনুষ্য-জীবনের কোন উচ্চ আদর্শই হতে পারে না। দেহের সম্ভোগ আর ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই যদি আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, তবে পশুর সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎই থাকে না। আমরা নিজেদের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করি। আমাদের কবি বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' সুতরাং আমাদের আদর্শ কখনই ভোগবাদের মত এত হীন হতে পারে না। জীবনের মহত্তর গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টাই

---

be seen to emerge ; but is fact or object as it appears to an observing mind, in the medium of thought as an inseparable factor of it." কেয়ার্ডের বক্তব্য তাঁর Introduction to the Philosophy of Religion গ্রন্থের Necessity of Religion অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

১। Freedom of will
২। Will
৩। Morality
৪। Hedonism

আমাদের নিত্য সাধনা হওয়া উচিত। তা ছাড়া নৈতিক আদর্শরূপে সুখবাদ বহু দোষযুক্ত।[১]

জড়বাদ ও ধর্ম[২]

ধর্ম সাধারণতঃ কোন না কোন অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাস করে। জড়বাদীদের মতে, হয় কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নেই, নয়তো তা জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং জড়বাদে ধর্মের কোন স্থান নেই।

যথার্থ ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে। মানুষের মহত্তর গুণাবলীর বিকাশের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্মের দ্বারা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তা বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি Study of History গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন। কাজেই ধর্মকে অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। সুতরাং ধর্ম-অস্বীকারবাদী জড়বাদকে কখনই শ্রদ্ধার আসনে বসান যায় না।

জড়বাদ ও সত্য

জড়বাদীরা মনে করেন, যা জীবনের প্রয়োজনে আসে তা-ই সত্য। অর্থক্রিয়াকারিত্ব দিয়েই সত্যের বিচার করতে হয়। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে সত্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখেছি যে, জীবনের প্রয়োজনে আসা আর সত্য এক কথা নয়। এমন অনেক সত্যই আছে যা জীবনের কোন প্রয়োজনেই আসে না। কিন্তু সেজন্য তারা সত্য নয়, এমন কথা বলা যায় না। কারও কারও মতে যা প্রয়োজনে আসে তা অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু মাত্র; যা মূল্যবান তা কখনই প্রয়োজনের মালিন্যে মলিন হয় না। সুতরাং জড়বাদীর সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সর্বশেষে জড়বাদের যান্ত্রিক কার্যের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করে এই আলোচনার উপসংহার করা যেতে পারে। জড়বাদীদের মতে এই দুনিয়ার সমস্ত কাজই যান্ত্রিকভাবে হয়ে যাচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য, আদর্শ বা বিচার বিবেচনার কোন স্থান নেই। যন্ত্রের মত নির্দিষ্ট গতিতে বিশ্বের কারখানায় কাজ চলেছে। এখানে কোন চিন্তা বা যুক্তির অবকাশ নেই।

আমাদের মনে হয়, দুনিয়াটা নির্বোধ জড়ের খেলা নয়। বিশ্বপ্রকৃতির

১। Mackenzie লিখিত Manual of Ethics গ্রন্থের Hedonism অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২। ধর্ম শব্দের দ্বারা Religion বুঝতে হবে।

দিকে তাকালেই এর সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গঠনসৌষ্ঠব আমাদের একান্তভাবেই অভিভূত করে। মনে হয় যেখানে যে জিনিসটি দরকার কে যেন সযত্নে সেই জিনিসটি সেখানে সাজিয়ে রেখেছে। আকাশের নীলিমা, গাছের সজীব সবুজ রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, পর্বতের আন্দোলিত গাত্রতট—সবই যেন কোন এক বিরাট শিল্পীর সৃষ্টি। জড় কখনও যান্ত্রিকভাবে এই সুন্দরী ধরণী সৃষ্টি করতে পারে না।[১]

নিসর্গবাদ বা স্বভাববাদ (Naturalism)

আধুনিক কালে জড়বাদ অনেকক্ষেত্রেই নিসর্গবাদ বা স্বভাববাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাচীন জড়বাদীদের মত নিসর্গবাদীরা দুনিয়ার সব কিছুই নিছক জড়ের রূপান্তর বলে মনে করেন না। প্রাচীন জড়বাদীরা জড়কেই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেন। নিসর্গবাদীদের মতে শক্তি[২], গতি[৩], প্রাকৃতিক নিয়ম[৪] ও কার্যকারণ সম্পর্ক জড়ের চেয়ে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। জড়বাদে জড়ের প্রাধান্য, নিসর্গবাদে নিসর্গ বা প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক নিয়মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অত্যন্ত আধুনিক কালে নিসর্গবাদীরা প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, জড় থেকে যখন প্রাণের অভিব্যক্তি হয় তখন একটা নূতন গুণের উন্মেষ হয়। আবার প্রাণ থেকে যখন মনের উদয় হয়, তখনও এক নূতন গুণের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে দিলে যে জল হয় তাতে তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতারূপ এক নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এই গুণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কারও মধ্যেই নেই। ঠিক তেমনি জড় থেকে নূতন নূতন গুণের উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রাণ ও মন উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন নূতন গুণের আবির্ভাবেই সম্ভব হয়েছে।

নিসর্গবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোরও সহজ স্বীকৃতি দিয়েছে। তার ফলে নিসর্গবাদ প্রাচীন জড়বাদের চেয়ে অনেক বেশী উদার ও মোহমুক্ত হয়ে উঠেছে। তবে প্রকৃতির মধ্যে যে একটি অন্তঃস্যূত চেতন উদ্দেশ্য বর্তমান, একথা নিসর্গবাদও স্বীকার করে না। একাদশ অধ্যায়ে আমরা এই উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি যে দার্শনিকতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য তা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করবো। তা ছাড়া জড় থেকে প্রাণ এসেছে, প্রাণ থেকে মন এসেছে,

---

১। আমরা যন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে করবো।

২। Energy ৩। Motion ৪। Natural Law

যদিও প্রাণ ও মনের স্তরে কিছু নূতনত্ব আছে, একথা বলা ত ঘটনার বিবৃতি-মাত্র। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা ঘটনার বিবৃতিতে তুষ্ট নই, ঘটনার ব্যাখ্যা চাই। আমাদের ধারণা, জড় থেকে প্রাণ এসেছে কারণ জড়ের মধ্যেই প্রাণের সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ, প্রাণ ছিল প্রচ্ছন্ন, আবার প্রাণ থেকে মন এসেছে, কারণ মনের সম্ভাবনা ছিল প্রাণে, অর্থাৎ, মন প্রাণে ছিল প্রচ্ছন্ন। তা হ'লে মানতে হয় যে, জড়ের মধ্যে প্রাণ ও মনের সম্ভাবনা ছিল বলেই জড় থেকে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। আর তা যদি মানা যায় তবে জড় প্রচ্ছন্ন মন বা চৈতন্য, একথা স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ, অধ্যাত্মবাদ-গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।[১]

১। জড়বাদ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হ'বে যে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্-এর নামের সঙ্গে যুক্ত 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' (Dialectical Materialism) নামে জড়বাদের একটি রূপ বিশেষ খ্যাত। অবশ্য দার্শনিকমহলে এ মতের প্রাধান্য স্বীকৃত নয়। এই মতবাদ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচিত কমিউনিজমের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা D. M. Dutta রচিত 'The Chief Currents of Contemporary Philosophy' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় এবং 'History of Philosophy—Eastern & Western —Vol. II তে অধ্যাপক আইয়ুব রচিত 'Marxism' প্রবন্ধটি পাঠ করতে পারেন।

দশম অধ্যায়

জীবন ও প্রাণ (Life)

দুনিয়ায় আমরা যে সমস্ত জিনিস দেখি তাদের মধ্যে কতকগুলো জীব আর কতকগুলো নিষ্প্রাণ জড়। জড়ের প্রকৃতি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আমরা জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি আলোচনা করব।

জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করলে বুঝতে সুবিধে হয়। আমরা সেজন্যই প্রথমতঃ যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করবো।

যন্ত্র ও জীবদেহ (Machine and Organism)

(ক) মিল ঃ

(১) যন্ত্রের মতই জীবদেহ কতকগুলো অংশের সমষ্টি। যন্ত্রের মধ্যে যেমন বিভিন্ন অংশ পরস্পর এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, জীবদেহও তেমনি বিভিন্ন অংশের বা অঙ্গের এক বিশেষ সমাবেশের ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। (২) জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মতই এক সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়। কোন বিশেষ যন্ত্র যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নির্মিত হয় তার সমস্ত অংশগুলোকেই সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য এক বিশেষ নিয়মে পরস্পর সম্পর্কিত হতে দেখা যায়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তেমনি এক সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে।

জীবদেহের সঙ্গে যন্ত্রের মিলগুলো আলোচনা করা হল। এবার আমরা তাদের পার্থক্যগুলো আলোচনা করব।

(খ) অমিল ঃ

(১) যন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ নিজের বুদ্ধিকৌশলে যন্ত্র তৈরী করে। কিন্তু কোন জীবদেহ তৈরী করার ক্ষমতা এখনও মানুষের হয়নি। জীবদেহ নৈসর্গিক প্রণালীতেই[১] গড়ে ওঠে। জীবদেহের বৃদ্ধিও মানুষের উপর নির্ভর করে না। জীবদেহের বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবেই নৈসর্গিক ব্যাপার। সাধারণতঃ

১। Natural Process

জীবদেহ এমনিতেই বৃদ্ধি পায়। জীবদেহের আন্তরবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু যন্ত্রের আন্তরবৃদ্ধি অসম্ভব।

(২) যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্র করলেই যন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবদেহের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ একত্র করলে জীবদেহের পূর্ণতা বা কর্মক্ষমতা কিছুই পাওয়া যায় না।

(৩) যন্ত্রী যন্ত্র পরিচালনা করেন। যন্ত্রী না হলে যন্ত্র চলে না। কিন্তু যন্ত্রী যন্ত্রের কোন অংশ বা অঙ্গ নয়। যন্ত্রের ভেতরে যন্ত্রীর কোন স্থান নেই। দেহ দেহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহী দেহের ভেতরই থাকে। সুতরাং দেহের পরিচালনার জন্য কোন বহিঃস্থিত যন্ত্রীর দরকার হয় না। যন্ত্রের ক্ষেত্রে বহির্নিয়ন্ত্রণ এবং জীবদেহের ক্ষেত্রে আন্তর নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয়।

(৪) যন্ত্রের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। মানুষের কোন না কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই যন্ত্র নির্মিত হয়ে থাকে। দেহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে সফল ক'রে তোলে। সুতরাং কোন বহিঃশক্তিকে খুশী বা তৃপ্ত করা দেহের উদ্দেশ্য নয়। দেহের উদ্দেশ্য একান্ত-ভাবেই দেহগত।[১]

(৫) যন্ত্রের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংবর্ধনের কোন ক্ষমতা নেই। যন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই যন্ত্রীর অধীন। কিন্তু জীবদেহের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংবর্ধনের ক্ষমতা আছে। জীবদেহ বাইরে থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ক'রে আপনিই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যন্ত্রের সেই ক্ষমতা আদৌ নেই।

(৬) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা যন্ত্রের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, কিন্তু, এই চেষ্টা যে কোন জীবদেহের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। সাধারণ একটি গাছকেও অন্ধকারে রাখলে তা আলোর দিকে যেতে চেষ্টা করে।

(৭) যন্ত্রের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নেই। যে-কোন জীবদেহেরই সেই ক্ষমতা আছে। যে-কোন জীবই প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যন্ত্রের বেলায় এই ক্ষমতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ওপরের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা যন্ত্রের নেই। সুতরাং জীবদেহকে কোন জটিল যন্ত্র বলা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। জীবন বা প্রাণ জীবদেহের সঞ্জীবনী শক্তি। জীবন বা প্রাণ না

১। Internal

থাকলে জীবদেহের কোন তাৎপর্যই থাকে না। যন্ত্রের কোন জীবন বা প্রাণ নেই। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে—এই জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি কি?

প্রাণের প্রকৃতি (The Nature of Life)

প্রাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। জড়বাদী ও যন্ত্রবাদী দার্শনিকদের[১] মতে, জীবদেহ এক জটিল যন্ত্র বিশেষ। বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ[২] জীবকোষ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জীবকোষ একত্র সন্নিবিষ্ট হলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র সন্নিবিষ্ট হলেই জীবদেহের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীবদেহ বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি। জীবদেহে 'প্রাণশক্তি'[৩] বলে নূতন কিছু নেই। অজৈব পদার্থ ও জীবের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। জীব সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকে জটিলতর মাত্র। জীবের গঠনভঙ্গীর জটিলতা ও সূক্ষ্মতা সাধারণতঃ কোন অজৈব পদার্থে দেখা যায় না। সুতরাং জীব ও অজৈব পদার্থের পার্থক্য মাত্রাগত পার্থক্য মাত্র[৪]। বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ থেকেই জীব-সৃষ্টি হয়। জীব সম্বন্ধে এই মতবাদ যন্ত্রবাদ[৫] নামে পরিচিত।

প্রাণবাদীদের[৬] মতে জীবদেহ জটিল যন্ত্র মাত্র নয়। জীবের জটিলতাই অজৈব পদার্থের সঙ্গে জীবের একমাত্র পার্থক্যও নয়। জীব অজৈব পদার্থ থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। জীবের মধ্যে এমন কতকগুলো বিশেষত্ব আছে, যা কোন অজৈব পদার্থেই নেই। সুতরাং কোন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ দিয়েই জীবের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। 'প্রাণশক্তি' নামে এক নূতন শক্তি দিয়েই জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই মতবাদের নাম প্রাণবাদ[৭]।

প্রাণবাদের প্রথম প্রকাশ আমরা গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের লেখার মধ্যে পাই। পরবর্তী কালে মধ্যযুগে এই মতবাদের প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। এই মতানুসারে 'প্রাণতত্ত্ব'[৮] নামে এক নূতন তত্ত্ব থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। কোন পরিক্ষণের[৯] মধ্যেই এই প্রাণতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

১। Materialists and Mechanists
২। Physical and chemimal substances
৩। Vital force
৪। Quantitative difference
৫। Mechanism
৬। Vitalists
৭। Vitalism
৮। Vital principle
৯। Experimentation

এই তত্ত্ব জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এই তত্ত্বের কোন আলোচনা হতে পারে না।

আর পরবর্তী কালে জার্মান জীববিদ্যাবিদ্[1] ড্রিস্ (Driesch) পরীক্ষণ-মূলক প্রমাণের সাহায্য নিয়ে নূতন করে প্রাণবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে জৈবিক প্রক্রিয়া আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। জৈবিক প্রক্রিয়া কোন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবের গঠনভঙ্গিমা আর যন্ত্রের গঠনভঙ্গিমার মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য[2] আছে। সুতরাং জীবকে একটি যন্ত্র বলা যায় না; জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। একমাত্র প্রাণতত্ত্ব দিয়েই জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ড্রিস্ কখনও কখনও এই প্রাণতত্ত্বকে এক মনস্তত্ত্ব[3] বলেও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই মনস্তত্ত্বই জীবদেহের বিশিষ্ট গঠনভঙ্গিমার জন্য দায়ী।

জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের এই দ্বন্দ্ব বহুকাল ধ'রে চলে এসেছে। আমরা এখন যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়, তা আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করব।

যন্ত্রবাদ বনাম প্রাণবাদ (Mechanism vs. Vitalism)

যন্ত্রবাদীরা নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। আমরা এখন তাঁদের যুক্তিগুলো আলোচনা করব।

(ক) যন্ত্রবাদীরা মনে করেন, জীবন বা প্রাণ কোন রহস্যজনক বস্তু নয়। যদি প্রাণীর জীবনধারণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায়, তবেই জীবন বা প্রাণের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। যেহেতু প্রাণ কোন রহস্যজনক বস্তু নয়, সুতরাং প্রাণের ব্যাখ্যার জন্য কোন রহস্যজনক তত্ত্বের স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

(খ) জীববিদ্যার[4] অগ্রগতির ফলে একাধিক জৈবিক প্রক্রিয়াই[5] এখন যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ইন্দ্রিয় সংক্ষোভের[6] সঙ্গে সংবেদনের[7] সম্পর্ক, বিভিন্ন মাংসপেশীর বৃদ্ধি প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপার এখন মোটামুটি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিছুদিন আগেও মানুষ এই জাতীয় ব্যাখ্যার কথা ভাবতে

১। Biologist
২। Fundamental difference
৩। Psychoid
৪। Biology
৫। Vital functions
৬। Stimulus
৭। Sensation

পারত না। সুতরাং যদিও অনেক জৈবিক প্রক্রিয়াই এখনও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি, তবু আশা করা যায় জীববিদ্যার আরও অগ্রগতির ফলে তা অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হবে।

(গ) বিজ্ঞান সাধারণতঃ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই[১] যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে। আজকের দিনে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতি যান্ত্রিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর ক'রেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায়, অন্য সার্থক বিজ্ঞানও ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করবে। জীববিদ্যা জীব নিয়ে আলোচনা করে। জীবনের গতি-প্রকৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তার অগ্রগতি সূচনা করবে। সুতরাং জীবনের ব্যাখ্যা যান্ত্রিক হওয়াই উচিত।

(ঘ) বিজ্ঞানীরা দুর্বোধ্যকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন। তাঁদের ধারণা, কোন জিনিসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেই তা সহজবোধ্য হয়। জীবের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একমাত্র যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তাদের সহজবোধ্য করতে পারে। সুতরাং জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানের আদর্শ হওয়া উচিত।

যন্ত্রবাদীদের এই সমস্ত যুক্তির বিপক্ষেই যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যন্ত্রবাদীদের প্রথম যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতাই আছে। সত্যিই জীবন কোন রহস্যজনক বস্তু নয়। কিন্তু একথা ত' একমাত্র যন্ত্রবাদীদের বক্তব্যই সমর্থন করে না। প্রাণবাদীরা কখনই জীবনকে রহস্যজনক বলে মনে করেন না। তাঁদের ধারণা, জড়ের সঙ্গে জীবনের মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা যন্ত্র ও জীবদেহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনাপ্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। জড় থেকে জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই জীবনকে রহস্যজনক বলা যায় না। একমাত্র জড়ই রহস্যজনক নয়, একথার পক্ষে কোন সুযুক্তি পাওয়া যাবে না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের প্রথম যুক্তি একমাত্র তাঁদের বক্তব্যই সমর্থন করে না।

দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রবাদীদের দ্বিতীয় যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে খুব জোরালো বলেই মনে হয়। সত্যিই যদি জীববিদ্যা বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত জৈবিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাই যান্ত্রিক হবে—এমন ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের পূর্ণ ব্যাখ্যা যান্ত্রিক ভাবে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ত' জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, এমন

১। Mechanical explanation

কথা জোর ক'রে বলা যায় না। জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব হবে—এ ত' আমাদের একটা বিশ্বাসমাত্র। বিশ্বাস ত' কোন যুক্তি নয়। সুতরাং জীবনের পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, এমন কথা বলার সময় এখনও আসে নি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারবাদী মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকাই উচিত।

তৃতীয়তঃ, যন্ত্রবাদীদের শেষ দুটি যুক্তিকে আদৌ সঙ্গত বলে মনে হয় না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোন বস্তুর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেই তা সহজ-বোধ্য হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়াকে সহজবোধ্য করবে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, বস্তুর একমাত্র যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বস্তুকে সহজবোধ্য করে, এ একটা বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যন্ত্রবাদীরা এই বিশ্বাসের পক্ষে কোন যুক্তি দেন না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সর্বশেষে বলা হয়েছে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সুতরাং জীববিদ্যাও যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এই তুলনা-ভিত্তিক অনুমান[১] মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার আলোচ্য বস্তুর সঙ্গে জীববিদ্যার আলোচ্য বস্তুর এমনই মৌলিক পার্থক্য যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার পদ্ধতি[২] কখনই জীববিদ্যার পদ্ধতি হ'তে পারে না। পদার্থবিদ্যা ও অজৈব রসায়নবিদ্যার আলোচ্য বস্তু অজীব বা জড়। জীববিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—প্রাণ বা জীবন। প্রাণের সঙ্গে জড়ের মৌলিক পার্থক্যের পরিচয় যন্ত্র ও জীবদেহের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা পেয়েছি। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের এই যুক্তি এখন আর গ্রহণ করা যায় না।

যন্ত্রবাদীদের সপক্ষের যুক্তিগুলো যে অকাট্য নয়, তার পরিচয় পাওয়া গেল। এখন আমরা প্রাণবাদীদের স্বমত-প্রতিষ্ঠার পক্ষের যুক্তিগুলো বিচার ক'রে দেখব।

(ক) প্রাণবাদীদের মতে, জীবের গঠনবৈচিত্র্য কোন যন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন যান্ত্রিক সম্পর্ক[৩] নেই। এদের সম্পর্ককে

১। Analogical reasoning
২। Method
৩। Mechanical relation

অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক[১] বলা যায়। আমরা যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং এখানে আর এই বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(খ) কোন একটি বিশেষ অবস্থায় প্রাণী কি করবে তা আগে থেকেই বলে দেওয়া যায় না। কিন্তু জড়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আগেই বলে দেওয়া যায়। প্রাণীর কর্মপ্রণালীর মধ্যে স্বাধীনতা আছে। জড়ের কোন স্বাধীনতা নেই। জড় বস্তুকে আমরা যখন যে ভাবে রাখি তখন তা সে ভাবেই থাকে। কিন্তু প্রাণী স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং প্রাণীকে কখনই একটি যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। কাজেই প্রাণের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও হতে পারে না।

(গ) আধুনিক কালে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত কতকগুলো জৈবিক প্রক্রিয়ার কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সুতরাং জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়াই যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এমন কথা এখন আর বলা যায় না।

প্রাণবাদীরা জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন, তা খণ্ডন করা যায় না। সত্যিই জীবের গঠনবৈচিত্র্য যন্ত্র থেকে এমনই পৃথক যে, জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কথা ভাবাই যায় না। জীবের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু জড়ের কোন স্বাধীনতা নেই। এই দিক থেকে জড় ও জীব সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। কাজেই জড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রাণবাদীদের তৃতীয় যুক্তি যন্ত্রবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দিয়েছে। যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের মত কতকগুলো জৈবিক প্রক্রিয়া কখনই যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না করা যায়, তবে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কোন কথাই উঠতে পারে না।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনের কোন যন্ত্রবাদ-সম্মত ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। প্রাণবাদীরা জড় থেকে জীবনের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে খুব সঙ্গত কাজই করেছেন। কিন্তু প্রাণবাদীরা এই পার্থক্যের যে রহস্যজনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। প্রাণবাদীরা বলেন, প্রাণতত্ত্বই এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। তাঁদের এই কথা সাধ্য-গ্রহণ-দোষ-দুষ্ট[২]। প্রাণবাদীরা যা প্রমাণ বা সাধন করতে চান, অর্থাৎ

১। Organic relation ২। Involves the fallacy of petitio principii.

যা তাঁদের সাধ্য, তা তাঁরা আগেই ধরে নিয়েছেন। প্রাণের স্বাতন্ত্র্য প্রাণতত্ত্বের জন্যই হয়েছে, একথায় আমাদের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর মেলে না। আমরা ত' প্রাণের স্বাতন্ত্র্যের কারণই জানতে চাই। প্রাণের জন্যই প্রাণের স্বাতন্ত্র্য হয় বললে আসলে প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। প্রাণবাদী ড্রিস্ বলেন, মনস্তত্ত্বই[১] প্রাণীর বিশেষ গঠনভঙ্গিমার জন্য দায়ী। কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই এই মনস্তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আর এই মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি কি তাও ভাল বোঝা যায় না। সুতরাং ড্রিসের ব্যাখ্যাই বা গ্রহণযোগ্য হবে কি ক'রে?

সিদ্ধান্ত ঃ প্রাণের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে—প্রাণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় কি ক'রে? এর উত্তরে হর্নলি (Hoernle)[২] যা বলেছেন, তা-ই আমাদের কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের[৩] সমন্বয়েই প্রাণের ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁর মতে যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্য-বাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। উদ্দেশ্যবাদসিদ্ধ ব্যাখ্যায় কোন রহস্যজনক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। উদ্দেশ্যবাদীরা জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হর্নলি মনে করেন, জীবের গঠনভঙ্গিমায় এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্রের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, জীববিদ্যায় সেই পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যায় না। জীববিদ্যার আলোচ্য জীবন পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের আলোচ্য জড়ের চেয়ে উচ্চস্তরের। সুতরাং জীবনের ব্যাখ্যার জন্য কোন উচ্চস্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। তাঁর মতে উদ্দেশ্যমূলক কারণের[৪] অস্তিত্বই জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য দায়ী। উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেই আমরা প্রাণের ব্যাখ্যার সার্থক পদ্ধতি লাভ করতে পারি।

জীবকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে কতগুলো ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ ই[৫] পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পদার্থগুলো যান্ত্রিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত নয়। এদের সংযোগ-প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া

১। Psychoid
২। Hoernle রচিত Matter, Life, Mind and God এবং Metaphysics গ্রন্থ দু'টি দ্রষ্টব্য।
৩। Teleology
৪। Teleological Cause
৫। Physico-chemical Substances

যায়। এই পদার্থগুলো এমনভাবে সংযুক্ত হয় যাতে এরা সমগ্র জীবদেহের পরিপুষ্টি ও সম্বর্ধনের পরিপূর্ণ সহায়ক হয়ে ওঠে। সমগ্র দেহের পরিপুষ্টি ও সম্বর্ধনই বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই জীব তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। জীবদেহে এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব আছে বলেই শ্বাসপ্রশ্বাস, আন্তর বৃদ্ধি[১], বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। কোন একটি বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারকে আমরা যান্ত্রিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু সমগ্র দেহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সমস্ত জীবই এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমানভাবে সচেতন নয়। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সমান মাত্রাতেও দেখা যায় না। মানুষ প্রভৃতি উচ্চস্তরের প্রাণীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনও বটে। উদ্ভিদের মধ্যে উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সবচেয়ে কম। উদ্ভিদ এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনও নয়। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যন্ত্রবাদীদের ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থের এক উদ্দেশ্যমূলক বিন্যাসের ফলেই প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের অতিরিক্ত আতিশয্য কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাণীতে যন্ত্রবাদীদের ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ এবং উদ্দেশ্যবাদীদের উদ্দেশ্য—উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। জড় থেকে প্রাণীর স্বাতন্ত্র্য প্রাণীর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

জীবনের উৎপত্তি (Origin of Life)

জীবনের প্রকৃতি আলোচনা করা গেল। এখন জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে। জীবনের আবির্ভাব কি করে হ'ল—এই হচ্ছে প্রশ্ন। দুই দলের দার্শনিক এই প্রশ্নের দু'রকম উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। জীবন থেকেই জীবন আসে। এই মতবাদকে জীবজনি[২] তত্ত্ব বলা হয়। আর একদল দার্শনিকের মতে অজৈব পদার্থ থেকেই অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জীব বা জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদের নাম অজীবজনি[৩] তত্ত্ব।

১। Growth from within
২। Biogenesis
৩। A-biogenesis

আমাদের মনে হয়, অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে না। অজৈব পদার্থের সঙ্গে জীবের মৌলিক পার্থক্য আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আলোচনা করেছি। সুতরাং অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তির কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টার যে পরীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টার জল সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে একটি বোতলে রেখে দিয়েছিলেন। অনেক কাল রেখে দেওয়ার পরও তাতে কোন জীবাণুর উৎপত্তি হয়নি। সুতরাং অজৈব পদার্থ থেকে জীব হয় একথা ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টারের পরীক্ষা কার্যের পর আর বিশ্বাস করা যায় না। যদি অজৈব পদার্থ থেকে জীব হ'ত, তা' হ'লে নিশ্চয়ই জীবাণুমুক্ত জলে জীবাণুর উদ্ভব হ'ত। আজ-কাল পরীক্ষাগারে অজৈব পদার্থ থেকে যান্ত্রিকভাবে জীবন-সৃষ্টির চেষ্টার কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু, এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন এমন সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি। সুতরাং জীব থেকেই জীব আসে, জীবনের উদ্ভব হয়—একথাই মানতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও ত' জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি দেখতে পাই। কাজেই জীবের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে জীবজনি তত্ত্বই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

একাদশ অধ্যায়
অভিব্যক্তিবাদ
(The Theory of Evolution)

অভিব্যক্তি বলতে যা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তার ব্যক্তি, প্রকাশ ও প্রকটতা বোঝায়। যা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তা ধীর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত, প্রকাশিত ও প্রকট হয়। অভিব্যক্তি ক্রমবিকাশ সূচনা করে। অভিব্যক্তিবাদের মতে জগতের প্রত্যেক জটিল বস্তুই সহজ ও সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে জটিল হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সরলতা থেকে বস্তুর জটিলতা ক্রমবিকাশের ফলেই লাভ করা যায়। জগতের কোন বস্তুই হঠাৎ একদিনে হয়নি। প্রত্যেক দ্রব্যের পেছনেই এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস রয়েছে। বস্তুর অভিব্যক্তির কোন শেষ নেই। যা অপ্রকাশিত তা নূতন নূতন পথে আপনার বিচিত্র প্রকাশ খুঁজে পাচ্ছে। অভিব্যক্তি পরিবর্তন বোঝায়। সরল রূপ থেকে জটিল রূপে বস্তুর পরিণতি ও পরিবর্তনের নামই অভিব্যক্তি।

বিপ্লবেও আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কিন্তু বিপ্লবের পরিবর্তন আর অভিব্যক্তির পরিবর্তন এক রকমের নয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা আছে। বিপ্লবের ফলে অস্বাভাবিক ও আকস্মিকভাবে সমাজের বা জাতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। অভিব্যক্তিতে কোন আকস্মিকতা বা অস্বাভাবিকতার স্থান নেই। ধীরে ধীরে পর পর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অভিব্যক্তির পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অভিব্যক্তিতে আকস্মিকভাবে কিছু হয় না। বিপ্লবে আকস্মিকভাবেই একটি বিরাট পরিবর্তন এসে যায়।

অভিব্যক্তির সঙ্গে বিপ্লবের আর একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করার মত। অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবেই নৈসর্গিক ব্যাপার। অভিব্যক্তিতে মানুষের কিছুই করবার নেই। মানুষ অভিব্যক্তির দ্রষ্টা বা বিষয় হতে পারে। কিন্তু মানুষ কখনই অভিব্যক্তির প্রযোজক নয়। মনুষ্যেতর বস্তুর অভিব্যক্তি মানুষ লক্ষ্য করে। এইক্ষেত্রে মানুষ অভিব্যক্তির দ্রষ্টা। আবার পরিবর্তনের মধ্যে

দিয়ে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে। দেশে দেশে, যুগে যুগে মানুষের এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মানুষ অভিব্যক্তির বিষয়ও বটে। কিন্তু অভিব্যক্তির পরিবর্তনে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। সুতরাং মানুষ অভিব্যক্তির প্রযোজক নয়। বিপ্লব কোন নৈসর্গিক ব্যাপার হতে পারে না। মানুষই বিপ্লবের সংগঠক। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব—এই দুইই মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বিপ্লব আর অভিব্যক্তির প্রকৃতি একরকম হতে পারে না।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বহু প্রাচীন কালেই অভিব্যক্তিবাদের ক্ষীণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোক্লেস, ডোমাক্রাইটাস্ ও আরিস্টটলের চিন্তাধারার মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। এম্পিডোক্লেসের লেখা পড়লে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের[১] অস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ডেমোক্রাইটাস্ পরমাণু থেকে জগৎ উৎপত্তির কথা বলেছেন। এই উৎপত্তিকে অভিব্যক্তিও বলা যেতে পারে। আরিস্টটলের দর্শনে বস্তুর অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় পরিবর্তনের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আরিস্টটল জীব নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে আধুনিক অভিব্যক্তি-বাদীদের জীবন সম্বন্ধে অনেক ধারণারই পরিচয় মেলে। অবশ্য অভিব্যক্তি-বাদের পূর্ণপ্রকাশ লেমার্ক, লেপ্‌লেস্, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীর লেখাতেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। ডারউইনের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাতির উৎপত্তি'[২] ও 'মনুষ্যের আবির্ভাব'[৩] চিন্তার জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই দুই গ্রন্থই আধুনিককালে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অভিব্যক্তিবাদ তিন পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে—(১) জড়ের অভিব্যক্তি (Evolution of Matter), (২) প্রাণের অভিব্যক্তি (Evolution of Life) ও (৩) মনের অভিব্যক্তি (Evolution of Mind)। জড়, প্রাণ ও মন কি করে ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, অভিব্যক্তিবাদ-প্রসঙ্গে এই আমাদের আলোচনার বিষয়।

অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের[৪] মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের

১। The Theory of Natural Selection
২। Origin of Species
৩। Descent of Man
৪। The Theory of Creation

মতে ঈশ্বর এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন ক্রমিক বিকাশের পথেই জগতের সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টিতত্ত্বের এ কথা যদি সত্য হয় তবে অভিব্যক্তিবাদের কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের খণ্ডনই অভিব্যক্তিবাদ আলোচনার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। আমরা প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করে পরে অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

সৃষ্টিতত্ত্ব (Theories of Creation)

সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে নিজ ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। জগতের যাবতীয় বস্তুই একটি বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েছে। আজ এই বস্তুগুলোর যে রূপ দেখছি, সৃষ্টির সময়ও তাদের সেই রূপই ছিল। সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

জগৎ-সৃষ্টি দু'রকম ভাবে ভাবা যেতে পারে। যদি মনে করা যায় অন্য কিছুর ওপর নির্ভর না করে ঈশ্বর নিজে নিজেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবে এই সৃষ্টিকে অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টি[১] বলতে হয়। আর যদি বলা যায় ঈশ্বর পূর্বস্থিত উপাদান[২] দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবে এই তত্ত্বের নাম হবে সাপেক্ষ সৃষ্টি।[৩]

অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (The theory of Absolute Creation)

এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় অসৎ[৪] থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। এমন একদিন ছিল যখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিপূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর জগতের কোন প্রয়োজনও বোধ করেন নি। কিন্তু পরে একদিন ঈশ্বর তাঁর অনন্ত করুণা বর্ষণের জন্য জীবসৃষ্টির কথা ভাবলেন। যেই ভাবা অমনি কাজ। জগতের সৃষ্টি হল।

সাপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (The theory of Conditional Creation)

এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্বস্থিত উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন। ঈশ্বর শিল্পীর মত পূর্বস্থিত উপাদান গ্রহণ করে তা বিভিন্ন আকারে আকারিত করেছেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। জগতের উপাদান-কারণ ঈশ্বর নন, ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণের সৃষ্টিও করেন নি।

১। Absolute Creation
২। Pre-existing material
৩। Conditional Creation
৪। Nothing

ঈশ্বর ও জগতের উপাদান উভয়ই নিত্য। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জগতের উপাদান অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ছিল। ঈশ্বর তাতে শৃঙ্খলা এনে এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি করেছেন।

সাধারণভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে আমরা যা বুঝি নীচে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলোর পরিচয় দেওয়া হল ঃ

(১) বহুকাল যাবৎ ঈশ্বর একাকী ছিলেন ; জগৎ বলে কিছু ছিল না। ঈশ্বর পূর্ণপুরুষ বলে জগতের কোন প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

(২) ঈশ্বর হয় অন্য কিছুর সাহায্য না নিয়েই নয়ত পূর্বস্থিত উপাদান গ্রহণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(৩) ঈশ্বর এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(৪) জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎকে নিজের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খুব প্রয়োজন দেখা দেয় একমাত্র তখনই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ঈশ্বর জগতের মধ্যে থাকেন না, তিনি জগতের বাইরে থাকেন।

সমালোচনা ঃ সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরের জগতে কোন প্রয়োজন ছিল না। এখানে প্রশ্ন ওঠে—তবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? উত্তরে বলা হয়, ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণা বর্ষণের জন্যই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আবার প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বরের অসীম করুণা বর্ষণের প্রয়োজন কি? এর কোন সদুত্তর সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দিতে পারেন না।

অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর অসৎ থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অসৎ থেকে ত' সতের সৃষ্টি হতে পারে না। যদি যুক্তির খাতিরে একথার সত্যতা স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তবু অসুবিধের শেষ হয় না। অসৎ যদি জগতের উপাদান-কারণ হয়, তবে জগৎও অসৎ হবে। কারণ, কার্যে কারণের স্বভাবই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগৎ অসৎ, এমন কথা ত' সাধারণতঃ কেউ বলেন না। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

যদি সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদীদের মত মনে করা যায় যে, ঈশ্বর পূর্বস্থিত উপাদান থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও সমস্যার সমাধান হয় না। ঈশ্বর ছাড়া কোন পূর্বস্থিত উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঈশ্বরের অসীমতা স্বীকার করা যায় না। পূর্বস্থিত উপাদান ঈশ্বরকে সীমিত করে। কিন্তু আমরা

জানি যে, ঈশ্বর অসীম। সুতরাং পূর্বস্থিত উপাদান দিয়ে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এমন কথাও বলা যায় না।

জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর যদি জগৎকে নিজের ওপর ছেড়ে দেন, তা হলেও জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত করবে। সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎকে নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, একথাও বলা যায় না।

তারপর ঈশ্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? এই বিশেষ মুহূর্তের আগে বা পরে জগৎ-সৃষ্টি হ'ল না কেন? এ সব প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি নিখুঁত শিল্পী হন তবে তাঁর সৃষ্ট জগতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে কেন? সার্থক কারিগরের সৃষ্ট যন্ত্র ত' কখনও সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না। আবার ঈশ্বর নিখুঁত শিল্পী নন, এমন কথাও ত' ভাবা যায় না। সুতরাং প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, একথাই মানা যায় না।

ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থাকেন তবে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে না। আর ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের যদি কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক না থাকে, তবে ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা যে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ভাবি তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। কতকগুলো বিশেষ বিজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন জাগতিক বস্তু ক্রমবিকাশের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারে অভিব্যক্তিবাদই গ্রহণ করতে হবে।

অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা আলোচনা করলে অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে অনেক যুক্তি পাওয়া যায়। জোতির্বিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, সৌরজগৎ একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু বৎসরের ক্রমবিকাশের ফলেই বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ আজকের রূপ পেয়েছে। একদিন গ্রহ-উপগ্রহগুলো তরল অগ্নিকুণ্ডের মত ছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদের তরলতা লুপ্ত হয়েছে। এখন এরা যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাদের এই পৃথিবী একদিন তরল অগ্নির

পিণ্ড ছিল। কালক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী কঠিন হয়েছে। পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাস অভিব্যক্তিবাদেরই সমর্থন করে।

ভূবিদ্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী একদিন তরল অবস্থায় ছিল। আজকের এই কঠিন পৃথিবী বহু যুগের পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। কখনও কখনও মাটির কোন স্তরে জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্ম দেখে মনে হয়, একদিন এই স্তরই পৃথিবীর উপরিভাগে ছিল। কালক্রমে নানা পরিবর্তনের ফলে এই স্তর নীচে নেমে গেছে। যে সমস্ত জীবের মৃতদেহ এই স্তরে দেখতে পাওয়া যায় তারা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। ভূবিদ্যার এই সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা প্রমাণ করে।

জীববিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, আজকের বিভিন্ন জাতি[১] অতীতের বিভিন্ন জাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দেহতত্ত্ব[২] আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, বানরের দেহের সঙ্গে মানুষের দেহের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য দেখে ডারউইন অনুমান করেছেন যে, বানর থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নরের উদ্ভব হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানেও মানুষের বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়। মানুষের সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আজকের মনুষ্য-সমাজের এই অবস্থা রাতারাতি হয়ে যায়নি। বহু পরিবর্তন, উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়েই এই পরিণতি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং জগতের সমস্ত ব্যাপারেই ধীর পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির কথা স্বীকার করতে হয়। কাজেই অভিব্যক্তিবাদ সত্য বলেই মানতে হবে।

অভিব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য

অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে জগতের বর্তমান অবস্থা বহু পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে—এই যে পরিবর্তন তার বৈশিষ্ট্য কি? কংগার বলেন, কালিক পরিবর্তন, পারম্পর্য-শৃঙ্খলা, অন্তর্নিহিত কারণ ও

১। Species
২। Anatomy

সৃজনমূলক সম্বাদ[১] অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। অভিব্যক্তির পরিবর্তন কালেই ঘটে। কাজেই এই পরিবর্তনকে কালিক পরিবর্তন বলতে হয়। অভিব্যক্তির প্রত্যেক স্তর পূর্বের স্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। প্রত্যেক পূর্ব স্তরের সঙ্গে উত্তর স্তরের নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তির পরিবর্তন কখনই আকস্মিকভাবে হয় না। অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরেই প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তির কারণ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে না। অভিব্যক্তির মধ্যেই অভিব্যক্তির কারণ লুকিয়ে থাকে। অভিব্যক্তিতে পুরোনো জিনিসের সমন্বয়ে নূতন জিনিসের উদ্ভব হয়। এখানে নূতন সম্পূর্ণভাবেই নূতন নয়। পুরাতনের ভিত্তিতেই নূতনের সৌধ গড়ে ওঠে।

অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন রূপ :

আমরা আগেই বলেছি, অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করতে গেলেই জড়ের অভিব্যক্তি, প্রাণের অভিব্যক্তি ও মনের অভিব্যক্তি—এই তিন পর্যায়ে আলোচনা করতে হয়। বিভিন্ন দার্শনিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে অভিব্যক্তি একটি ঘটনা। তাঁরা এই ঘটনার বিবরণ দেন। দার্শনিকেরা বিজ্ঞান-স্বীকৃত এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, অভিব্যক্তির ধারণার বিশ্লেষণ করেন এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অভিব্যক্তির প্রকৃতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। অনেক দার্শনিকের মতে অভিব্যক্তি নামক ঘটনার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া বিজ্ঞানীর কাজ; দার্শনিক এই বিষয়ে কিছু বললে তা কাল্পনিক সাহিত্য হ'তে পারে, কিন্তু দর্শন হবে না। সেজন্য তাঁরা অভিব্যক্তি-সম্পর্কিত আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীভূত করতে সম্মত ন'ন।[২] সাধারণতঃ দর্শনের গ্রন্থে অভিব্যক্তি আলোচিত হয় বলে আমরা এই মতের সত্যাসত্য নির্ণয় না করেই অভিব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে গেলে এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচনা করতে হয়। যন্ত্রবাদ (Mechanism), উদ্দেশ্যবাদ (Teleology), সৃজনবাদ (Creative

১। কালিক পরিবর্তন (Change in time), পারম্পর্য-শৃঙ্খলা (Serial order), অন্তর্নিহিত কারণ (Inherent cause) ও সৃজনমূলক সম্বাদ (Creative synthesis).

২। আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'The Concept of Philosophy' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

Evolution) ও উন্মেষবাদ (Emergent Evolution) অভিব্যক্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে। আমরা পর পর এই সমস্ত বিভিন্ন মতগুলোর আলোচনা করব।

যন্ত্রবাদ (Mechanical Theory of Evolution)

যন্ত্রবাদ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। যন্ত্রবাদ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়বাদী দার্শনিকেরা অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যন্ত্রবাদ প্রচার করেন। এঁদের মতে জড়ই দুনিয়ার চরমতত্ত্ব। জড় ও গতি জগতের সমস্ত কিছুরই উৎপত্তির জন্য দায়ী। প্রাণ ও মন জড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। প্রাণকে জড়ের জটিল প্রকাশ বলা যেতে পারে। জড়ের জটিলতম প্রকাশ পাওয়া যায় মনে। জড় থেকেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত উৎপত্তিই যান্ত্রিকভাবে হয়ে থাকে। কোন উৎপত্তিই উদ্দেশ্যমূলক নয়।

জড় থেকে কিভাবে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে, এ বিষয়ে সকলেই এক মত পোষণ করেন না। তার ফলে যন্ত্রবাদেরও বিভিন্ন রূপ দেখা দিয়েছে। হার্বার্ট স্পেন্সার জগতের উৎপত্তির এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডারউইন, ল্যামার্ক, ল্যাপলেস, ভাইসম্যান প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রাণের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। ডারউইন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রাণের অভিব্যক্তির কথাই বলেছেন। সেজন্য তাঁদের জৈবিক অভিব্যক্তি-বাদী[১] নামে অভিহিত করা হয়। ডারউইন, ল্যামার্ক, ল্যাপলেস, ভাইসম্যান প্রভৃতি মনীষীর নামের সঙ্গে যুক্ত জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলে পরিচিত। এই সমস্ত মনীষীদের বক্তব্য আলোচনা করলে যন্ত্রবাদের তাৎপর্য ভালভাবে বোঝা যাবে আশা করে আমরা এঁদের মত অত্যন্ত সংক্ষেপে এখানে সন্নিবেশিত করেছি। আমরা প্রথমে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ আলোচনা করে পরে জৈবিক অভিব্যক্তিবাদীদের কথা আলোচনা করব।

স্পেন্সারের বিশ্বাভিব্যক্তি-বিষয়ক মতবাদ

(Spencer's Theory of Cosmic Evolution)

স্পেন্সার অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে যন্ত্রবাদের সমর্থক। তাঁর মতে সমস্ত বিশ্বই এক বিরাট অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া বিশেষ। এই প্রক্রিয়া সব সময়েই

১। Biological Evolutinists.

সহজ থেকে জটিলে, অব্যাকৃত ও সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে ব্যাকৃত ও বিষম-সাত্ত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সংবদ্ধ অবস্থায় যাওয়ার প্রক্রিয়া।[১] অভিব্যক্তি ক্রমিক ও সুশৃঙ্খল পরিবর্তন বোঝায়। স্পেন্সারের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একীকরণ (Concentration or Integration), পৃথকীকরণ (Differentiation) এবং নিয়মানুগত্য (Determination)—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য।

(১) **একীকরণ** (Concentration or Integration)

এই বিশ্বের আদিম উপাদান বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় এই বিক্ষিপ্ত উপাদান একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মণ্ডল রচনা করে। সুতরাং অভিব্যক্তির পথে একীকরণই প্রথম প্রক্রিয়া।

(২) **পৃথকীকরণ** (Differentiation)

একীকরণই অভিব্যক্তির একমাত্র প্রক্রিয়া নয়। ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলের পৃথকীকরণও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবকোষ[২] আবহাওয়ায় ছড়ানো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিলনেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু জীবকোষের আরও উন্নতি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। প্রথম জীবকোষ এই প্রক্রিয়ায় নিজেকে বিভিন্ন কোষে বিভক্ত করেছে। এই কোষগুলো আবার একত্র হয়ে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে একীকরণ ও পৃথকীকরণ দুই প্রক্রিয়াই বর্তমান।

(৩) **নিয়মানুগত্য** (Determination)

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, অভিব্যক্তিতে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াও বর্তমান। কিন্তু প্রলয় বা বিলয় বলতে আমরা ঐক্যবদ্ধ বস্তুর পৃথকীকরণই বুঝি। তা'হলে প্রশ্ন ওঠে—অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রলয় বা বিলয়ের তফাৎ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অভিব্যক্তির পৃথকীকরণ একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। প্রলয় বা বিলয়ের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। সুতরাং অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রলয় বা বিলয়ের তফাৎ সুস্পষ্ট। অভিব্যক্তির বেলায় বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায়, অনির্দিষ্ট ও অনির্বাচ্য অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট

১। The process of evolution is always from a simple to a more complex form, from an undifferentiated and homogeneous to a differentiated and heterogeneous state, from an indefinite and incoherent to a definite and coherent condition.

২। Germ cell.

ও বাচ্য অবস্থায় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রলয় বা বিলয়ের বেলায় শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায়, নির্দিষ্ট ও বাচ্য অবস্থা থেকে অনির্দিষ্ট ও অনির্বাচ্য অবস্থায় অবনতিই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং অভিব্যক্তি ও প্রলয় সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া।

স্পেন্সারের মতে জড় (Matter), গতি (Motion) ও শক্তি (Force) অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান। অজ্ঞেয় তত্ত্বই (The Unknowable) চরমতত্ত্ব। জড়, গতি ও শক্তি এই অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। অজ্ঞেয় তত্ত্বের মাত্র এই তিনটি প্রকাশই জানা যায়। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় একীকরণ ও পৃথকীকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

স্পেন্সার মনে করেন, যে উপাদান সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করেছে একদিন তা গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত (Nebula or cloud of gas) ছিল। ক্রমশঃ এই উপাদান বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে সূর্যের সৃষ্টি করেছে। সূর্য-দেহের উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নিয়েছে। আমাদের পৃথিবী এইরকম একটি গ্রহ। প্রথম অবস্থায় এই পৃথিবীও গ্যাসের মেঘের মত ছিল। ক্রমে এই মেঘ জমাট বেঁধে মাটির সৃষ্টি করেছে। কিছু মেঘ ছড়িয়ে যাওয়ায় জল ও বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে। এই রকম একীকরণ ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলেই আজকের পৃথিবী এমন রূপ নিয়েছে।

জৈব অভিব্যক্তিতেও একীকরণ ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার যুগল লীলা দেখতে পাওয়া যায়। জীব-সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সমসাত্ত্বিক প্রটোপ্লাজম্পুঞ্জ ছিল। এই প্রটোপ্লাজম্পুঞ্জ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন কর্মসাধনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে। দেখবার জন্য চোখ, শোনবার জন্য কান, ধরবার জন্য হাত, চলবার জন্য পা প্রভৃতির না-কি এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে জীবদেহের সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক বিবর্তনেও একীকরণ ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পরিবার একত্রিত হয়ে সমাজ গড়ে তুলেছে। আবার গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে এই সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করেছে। এই বিভিন্ন জাতিগুলো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে ঐক্য গড়ে তুলেছে। সুতরাং সমস্ত পরিবর্তনেই একীকরণ ও পৃথকীকরণের দ্বৈতপ্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

সমালোচনা ঃ ল্যাপ্‌লেস্ স্পেন্সারের বিশ্বাভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আমরা ল্যাপ্‌লেসের অভিযোগ অনুসরণ করে স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনা করব।

স্পেন্সার মনে করেন, বিশ্বের আদিম উপাদান গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত ছিল। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে কোন সুযুক্তি পাওয়া যায় না। স্পেন্সার নিশ্চয়ই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বেঁচে ছিলেন না। সুতরাং বিশ্বের আদিম অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি হতে পারেন না। তবে তিনি জানলেন কি করে যে পৃথিবীর আদিম উপাদান গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত ছিল? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর স্পেন্সারের লেখায় পাওয়া যায় না।

স্পেন্সারের মতে বিশ্বের আদিম উপাদান সমসাত্বিক অবস্থায় ছিল। এই সমসাত্বিক উপাদান বিষমসাত্বিক হয়েই বিশ্বের অভিব্যক্তি সম্ভব করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে—সমসাত্বিক উপাদান বিষমসাত্বিক হল কি করে? স্পেন্সার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

স্পেন্সার মনে করেন, জড়, গতি ও শক্তি—এই তিন উপাদান থেকেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাণ ও মন জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা প্রাণের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে প্রাণীর গঠন-ভঙ্গিমা ও কার্যপ্রণালী জড় থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। সুতরাং জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না। চৈতন্য মনের স্বরূপ। জড় সম্পূর্ণ-রূপেই নিশ্চেতন। সুতরাং জড় থেকে মনের উদ্ভবই বা হবে কি করে?

স্পেন্সার অভিব্যক্তির যন্ত্রবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অভিব্যক্তিপ্রক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে চলে। কিন্তু এই সুন্দরী ধরণী কি করে যান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট হতে পারে—তা আমরা বুঝি না। জগতের প্রত্যেকটি জিনিস যেন নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে। কোন যন্ত্রই এই সাজানো পৃথিবীর সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং স্পেন্সারের অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যন্ত্রবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

স্পেন্সার জড়, গতি ও শক্তিকে অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভিন্ন-প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। অজ্ঞেয় তত্ত্ব যদি সত্যি সত্যিই অজ্ঞেয় হয় তবে তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যেতে পারে না। তবে অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ জানা যাবে কি করে? আর চরমতত্ত্বের কোন প্রকাশ যদি জানা যায়, তবে তা অজ্ঞেয় হতে পারে না। সুতরাং স্পেন্সারের মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

জাতির ধারণা (The Idea of Species)

একই রকম গঠন-ভঙ্গিমা-বিশিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায়ে এক জাতির সৃষ্টি হয়। জাতিগুলো সাধারণতঃ পরস্পর বিবিক্তই থাকে। জাতির প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আমরা এখন এই মতবাদ দুটি আলোচনা করব।

(ক) অপরিণামী জাতিতত্ত্ব (The theory of Immutability of Species)

এই মতবাদ অনুসারে জাতিগুলো অপরিণামী ও সম্পূর্ণ বিবিক্ত। এক জাতি থেকে কখনই অন্য জাতির সৃষ্টি হতে পারে না। এক জাতির প্রকৃতি অন্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অপরিণামী জাতি তত্ত্বের দুই রূপ :— সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্লেটোতত্ত্ব।

(১) **সৃষ্টিতত্ত্ব** :—সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর সমস্ত জাতি একসঙ্গে সৃষ্টি করেছিলেন। পরে তাদের বংশ বৃদ্ধি করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তার ফলেই আজ বিভিন্ন জাতির অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন একটি জাতি থেকে কখনই অন্য জাতির সৃষ্টি হয় না। মনুষ্য-জাতির বংশধর মনুষ্যই হতে পারে। আবার গো-জাতির বংশধর চিরকাল গো-ই হবে। সুতরাং জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী।

(২) **প্লেটোতত্ত্ব** :—প্লেটোর মতে একমাত্র জাতিই সৎ। বিভিন্ন ব্যক্তি জাতির ছায়া বা অনুকরণমাত্র। সমস্ত মানুষ মনুষ্যজাতির অনুকরণেরই ফল। মনুষ্য জাতিই সৎ ও সত্য। ব্যক্তিমানুষের কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই। জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী। কোন এক বিশেষ জাতির অনুকরণে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিদেরই পাওয়া যেতে পারে। এক জাতির অনুকরণে কখনই অন্য জাতির ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। গো-জাতির অনুকরণে গো-ই লাভ করা যায়। আবার অজ জাতির ছায়া অজ-ই হয়। সুতরাং অপরিণামী জাতিতত্ত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।

(খ) পরিণামী জাতিতত্ত্ব (Mutability of Species)

ডারউইন ও ল্যামার্কের নেতৃত্বে যে জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের পত্তন হয়েছে, সেই মতবাদ অনুসারে জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী নয়। যুগ-বিবর্তনের ফলে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়।

সুতরাং পরিণামী জাতিতত্ত্বই স্বীকার করা উচিত। ডারউইন বলেন, এক জাতি থেকে অন্য জাতির সৃষ্টি আকস্মিকভাবেই (fortuitously) হয়ে থাকে। ল্যামার্কের মতে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি পরিবেশ-পরিবর্তনের জন্যই সম্ভব হয়। এঁর মতে কোন জাতির কোন দুটি ব্যক্তিই একরকমের নয়। জাতিতে জাতিতে কোন চরম ভেদরেখা নেই। জীব-দেহের গঠন-ভঙ্গিমা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলেই এক জাতি থেকে অন্য জাতির সৃষ্টি হয়।

জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ

আমরা আগেই বলেছি যে, ডারউইন, ল্যামার্ক, ভাইসম্যান প্রভৃতি মনীষীরা অভিব্যক্তির যন্ত্রবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁরা বিশেষভাবে জীবের অভিব্যক্তি নিয়েই আলোচনা করেছেন। এঁদের মতবাদ জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। সমস্ত জৈবিক অভিব্যক্তিবাদীরাই জাতির পরিণামী তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি সম্ভব। আমরা প্রথমে ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করে পরে ল্যামার্ক ও ভাইসম্যানের মতবাদ আলোচনা করব।

১। ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ

ডারউইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার (Survival of the Fittest) এই নীতি অনুযায়ী আকস্মিক পরিবর্তনের (fortuitous variation) জন্যই নূতন জাতির উদ্ভব হয়। ডারউইনের মতে অভিব্যক্তির তিনটি নিয়ম :—

(ক) আকস্মিক পরিবর্তন :

ডারউইন মনে করেন, প্রোটোপ্লাজম্ কোষ দেখতে সরল হলেও আসলে অত্যন্ত জটিল। এই জটিল প্রোটোপ্লাজম্ কোষে আকস্মিক ভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রোটোপ্লাজম্ কোষের পরিবর্তন জীবদেহেও পরিবর্তন সূচনা করে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কতকগুলো জীবদেহের অনুকূল আর কতকগুলো প্রতিকূল ও ক্ষতিকর। অনুকূল পরিবর্তনের আধিক্য দেখা দিলে জীবনযুদ্ধে জীব জয়ী হয়। আর প্রতিকূল পরিবর্তনের আধিক্য হলে জীবের বংশ লোপ পায়।

(খ) বংশানুক্রমে জীবদেহে এই আকস্মিক পরিবর্তনের সঞ্চার ঃ

প্রোটোপ্লাজম্ কোষের আকস্মিক পরিবর্তন বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারণের ফলে জীবদেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যক্তিদেহের এই পরিবর্তন দেহের অনুকূল হলে সমস্ত জাতিই বেঁচে থাকে। যদি এই পরিবর্তন দেহের প্রতিকূল হয় তবে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিও লুপ্ত হয়।

(গ) প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার :

জগতে যত জীব আছে তাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য জগতে নেই। তার ফলে খাদ্য লাভের জন্য জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই এক দ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশ পায়। ডারউইন এই দ্বন্দ্বের নাম দিয়েছেন জীবনযুদ্ধ। যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম্ কোষের পরিবর্তন দেহের অনুকূল হয় তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। এরাই যোগ্যতম বলে বাঁচবার অধিকারী। যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম্ কোষের পরিবর্তন দেহের প্রতিকূল হয় তারা দুর্বল। এই দুর্বল জীবেরা জীবনযুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। ডারউইন মনে করেন, যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম্ কোষের পরিবর্তন দেহের অনুকূল হয় প্রকৃতিই যেন বাঁচবার জন্য তাদের নির্বাচন করে। সুতরাং যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকারকে প্রাকৃতিক নির্বাচনও বলা যেতে পারে।

ডারউইন মনে করেন, আকস্মিক ভাবেই জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরে বিভিন্ন কার্যসাধনের জন্য নিযুক্ত হয়। কোন পরিবেশ-পরিবর্তনই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তির জন্য দায়ী নয়। প্রোটোপ্লাজম্ কোষের আকস্মিক পরিবর্তনের জন্যই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। পরে আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করি। চোখের সৃষ্টির পরই তা দেখার জন্য নিযুক্ত হয়, কানের সৃষ্টির পরই তা শোনার কাজ করে। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

সমালোচনা ঃ ডারউইন অভিব্যক্তিকে এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যান্ত্রিকভাবে কি করে লাভ করা যায় তা আমরা বুঝি না। যান্ত্রিক কারণ কখনই কোন গঠন-পারিপাট্যের সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দেশ্যের স্থান না থাকলে জীবের গঠন-সৌকর্য এমন ভাবে দেখা দিত না। কোন যন্ত্রই এমন

সুকুমার জিনিস তৈরি করতে পারে না। সুতরাং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

এক জাতি থেকে আর এক জাতির উৎপত্তি ব্যাপারে ডারউইন প্রোটো-প্লাজম্ কোষের আকস্মিক পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুকে আকস্মিক বললে তার কারণের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবই স্বীকার করতে হয়। সুতরাং আকস্মিকতা নূতন জাতি-উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না। নূতন জাতি আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে হয় বললে নূতন জাতি ঠিক কি ভাবে উৎপন্ন হয় তা যে আমরা জানি না তাই প্রকাশ পায়। সুতরাং ডারউইনের নূতন জাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা কোন ব্যাখ্যাই নয়।

ডারউইন বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম্ কোষের আকস্মিক পরিবর্তন যা দৈহিক গঠনের পরিবর্তনও বটে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞানী ভাইসম্যান প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র জীব-কোষের বৈশিষ্ট্য-গুলোই (germinal variations) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। সুতরাং ডারউইনের বক্তব্য এখন আর গ্রহণ করা যায় না।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পূর্ণভাবেই কল্পনার ব্যাপার। প্রকৃতি নিশ্চেতন হওয়ায় তার কোন নির্বাচন কল্পনা করাও মুশকিল। যদি প্রকৃতিকে বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নারী হিসেবে কল্পনা করা হয় তবেই প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য-মূলক কার্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। সুতরাং প্রকৃতিকে তিনি বুদ্ধিমতী বলতে পারেন না। আর এজন্যই তাঁর অভিব্যক্তিবাদে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত উদ্দেশ্যমূলক কাজের কোন স্থান থাকতে পারে না।

ডারউইনের মতবাদের এত সব দোষ সত্ত্বেও তিনিই যে আধুনিক কালে আমাদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করেন—তা অস্বীকার করা যায় না। জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর নাম চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২। ল্যামার্কের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ

ল্যামার্কের মতে, জীব-কোষ আকস্মিক ভাবে পরিবর্তিত হলে তা কখনই কোন সুনির্দিষ্ট ফল প্রসব করতে পারে না। ল্যামার্ক মনে করেন, পরিবেশের প্রভাবেই কোষের পরিবর্তন হয়। যখন বাইরে থেকে কোন শক্তি

দেহের উপর কাজ করে তখন দেহ নিজেকে সেই শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তার ফলে দেহে পরিবর্তন দেখা দেয়। বাইরের শক্তির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্য কতকগুলো দৈহিক প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দেখার প্রয়োজনে চোখ, শোনার প্রয়োজনে কান ও অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়েছে।

ল্যামার্ক মনে করেন, পরিবেশের প্রভাবে দৈহিক গঠনের এই যে পরিবর্তন তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ল্যামার্কের মতে প্রথম অবস্থাতেই জিরাফের গলা লম্বা ছিল না। গাছের ওপরের ডালের পাতা খাওয়ার জন্য জিরাফেরা প্রায়ই গলা বাড়িয়ে দিত। বারবার গলা বাড়ানোর ফলে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে অবশ্য জিরাফের এই আগন্তুক গুণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন জিরাফ লম্বা গলা নিয়েই জন্মায়।

সমালোচনা ঃ ল্যামার্ক বলেছেন, পরিবেশের প্রভাবে দৈহিক গঠনের যে পরিবর্তন হয় তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভাইসম্যান দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র জীব-কোষের বৈশিষ্ট্যগুলোই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। সুতরাং ল্যামার্কের কথা এখন আর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ল্যামার্ক মনে করেন, প্রয়োজন থেকেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন একটা বিষয়ের প্রয়োজনই কি তাকে সৃষ্টি করতে পারে? যদি তা পারত তবে দুনিয়ায় না পাওয়ার বেদনা বলে কিছু থাকত না; মানুষের অসন্তোষও লুপ্ত হয়ে যেত। যখন যার যা প্রয়োজন তখনই যদি সেই জিনিসের সৃষ্টি হয় তবে মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, অসন্তোষ কিছুই থাকে না। কিন্তু এমন সুখ-স্বপ্ন আজ পর্যন্ত বাস্তব রূপ পায় নি। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের মতই ল্যামার্কের মতবাদও বহু দোষ-দুষ্ট। সুতরাং ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

৩। ভাইসম্যানের মতবাদ

পরিবর্তন মাত্রই যে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে না—এ কথাই ভাইসম্যানের মূল বক্তব্য। ভাইসম্যান মনে করেন, জীব-কোষের আন্তর

পরিবর্তনই (internal germinal variation) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। দেহের আকস্মিক বা পরিবেশ-প্রভাব-জাত পরিবর্তন বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে না। এখন ভাইসম্যানের এই কথার সত্যতা অনেক জীববিজ্ঞানীই স্বীকার করেন।

ভাইসম্যানের মতে, জীব-কোষ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলে তা মৃত্যুহীন। পিতার জীব-কোষ পুত্রের দেহ ও জীব-কোষ উভয়ই সৃষ্টি করে। পুত্রের জীব-কোষ আবার তার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। এমনি করে নিরবধি-কাল ধরে জীব-কোষ সঞ্চারিত হতে থাকে। সুতরাং জীব-কোষের মৃত্যু বা ধ্বংস নেই।

সমালোচনা ঃ ভাইসম্যান স্বীকার করেছেন, জীবের পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে হয় না। তিনি জীব-কোষের আন্তর পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কিন্তু, এই আন্তর পরিবর্তনের হেতু কি? যন্ত্রবাদী হিসেবে নিশ্চয়ই তিনি বলবেন—এই পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে হয়। কিন্তু, একথা পরিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা দেয় কি? এতে ঘটনার বিবরণ আছে, ব্যাখ্যা নেই। দর্শনে আমরা ব্যাখ্যা চাই।

যন্ত্রবাদের সাধারণ সমালোচনা
(General Criticism of Mechanical Theory)

যন্ত্রবাদের মূল বক্তব্য আগেই আলোচনা করেছি। যন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপের সমালোচনাও করা হয়েছে। এখন আমরা যন্ত্রবাদের সাধারণ সমালোচনা করব।

যন্ত্রবাদের মতে সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে যাচ্ছে। কোথাও কোন বুদ্ধি বা উদ্দেশ্যের স্থান নেই। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুতে পরিপাটি করে সাজানো এই বিচিত্র জগৎ কি করে যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন হতে পারে তা আমরা বুঝি না। জগতের দিকে তাকালেই মনে হয়, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যেন কার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের সাজিয়ে রেখেছে। যেখানে যে জিনিসটি দরকার সেখানে ঠিক সেই জিনিসটিই আছে। আমাদের মনে হয়, কোন এক বিরাট পরিকল্পনা যেন এই বিশ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে চলেছে। পরিকল্পনা সচেতন কর্ম। সুতরাং বিশ্বে চৈতন্যের লীলা মানতে হয়।

যন্ত্রবাদের মতে প্রাণ ও মন জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র। জড়ের সঙ্গে

প্রাণের বা জড়ের সঙ্গে মনের কোন মূলগত পার্থক্য নেই। প্রাণ জড়ের জটিলতর প্রকাশ, জড় জটিলতমরূপে প্রকাশিত হয়েছে মনের মধ্যে। সুতরাং জড় থেকেই প্রাণ ও মনের উদ্ভব হয়েছে।

প্রাণীর স্বাধীনতা, প্রজনন-শক্তি ও আন্তর বৃদ্ধির ক্ষমতা আছে। কিন্তু জড়ের এ সমস্ত কোন ক্ষমতাই নেই। প্রাণীর স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় সে অর্থে জড়ের স্বাধীনতা নেই। জড়ের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নেই। জড়ের আন্তর বৃদ্ধিও হয় না। সুতরাং জড়ের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য মৌলিক। কাজেই জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। মন চৈতন্যস্বভাব। জড় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেতন। সুতরাং নিশ্চেতন জড় থেকে চেতন মনের আবির্ভাব হতে পারে না।

যদি যন্ত্রবাদীরা বলেন, জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে মনের আবির্ভাব বাস্তব ঘটনা, এই ঘটনা ত' অস্বীকার করা যাবে না, তা হ'লে আমরা বলবো—ঘটনা আমরা অস্বীকার না করেও ঘটনা এমন ঘটলো কেন তার তা ব্যাখ্যা চাইতে পারি। দার্শনিকের কাজ ত' ব্যাখ্যা দেওয়া। এই ঘটনার কি ব্যাখ্যা হবে? আমাদের মনে হয়, এই ঘটনার ব্যাখ্যা এই যে, জড়ের মধ্যে প্রাণের সম্ভাবনা ছিল বলেই জড় থেকে প্রাণ এসেছে আবার প্রাণে মনের সম্ভাবনা ছিল বলেই প্রাণ থেকে মন এসেছে। যাতে যার সম্ভাবনা নেই তা থেকে তা হ'তে পারে না। দুধে দৈয়ের সম্ভাবনা আছে বলেই দুধ থেকে দৈ হয়, কিন্তু কাঠে দৈয়ের সম্ভাবনা নেই বলে কাঠ থেকে কখনও দৈ হয় না। একথা বললে প্রাণে মনের এবং জড়ে প্রাণের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয় এবং ফলে জড় প্রচ্ছন্ন চৈতন্য, এমন কথাও বলতে হয়। তাতে যন্ত্রবাদ ও জড়বাদ নস্যাৎ হয়ে অধ্যাত্মবাদ প্রতিপন্ন হয়।

অনেক যন্ত্রবাদী বলতে পারেন, আমরা প্রাণ ও মন যে জড় থেকে উন্নত তা স্বীকার করি তবে সব কিছুই যে জড় দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় তাও স্বীকার করি। এখানে প্রশ্ন ওঠে—কোন অনুন্নত জিনিস দিয়ে যদি উন্নত জিনিসের ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে করা হয় তবে উন্নতকে ত' অনুন্নত জিনিসে নামিয়ে আনা হয়, ফলে যার ব্যাখ্যা দিতে হবে অর্থাৎ উন্নত জিনিসের উন্নতত্বই অস্বীকার করা হয়। এটা কি ব্যাখ্যা হ'ল?

যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় পূর্ব স্তর বা ঘটনা দিয়ে উত্তর স্তর বা ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু, বিশ্বের ঘটনাগুলো এমন যে তারা আন্তর সম্বন্ধে আবদ্ধ

এবং এজন্যই ঘটনাপ্রবাহের কথা বলা হয়। প্রবাহের ক্ষেত্রে যেমন নদীকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করলে তার তাৎপর্য বোঝা যায় না, এই বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহেও বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করলে তার তাৎপর্য বোঝা যায় না। যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় আমরা পূর্ব, উত্তর প্রভৃতি ভাগ বা অংশ কল্পনা করে সমগ্রের প্রতি লক্ষ্য হারাই। একমাত্র উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যাতেই সমগ্রকে গ্রহণ করে সামগ্রিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এই দিক থেকেও বিশ্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।[১]

উদ্দেশ্যবাদ (Teleological Evolution)

উদ্দেশ্যবাদীদের মতে দুনিয়াটা নির্বোধ জড়ের যান্ত্রিক খেলা মাত্র নয়। এখানে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিচার-বিবেচনার স্থান আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—উদ্দেশ্যবাদীরা এই সিদ্ধান্ত করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমরা উদ্দেশ্যবাদের আলোচনা শুরু করব।

উদ্দেশ্যবাদের পক্ষে যুক্তি ঃ

১। মার্টিনিউ বলেন, জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক তার প্রমাণ অতি সহজেই পাওয়া যায়। নির্বাচন (Selection), গঠন (Combination) ও স্তরভেদ (Gradation) উদ্দেশ্যমূলকতার তিনটি লক্ষণ। জগতে এই তিন লক্ষণেরই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাখি জলে ভেজে, রোদে পোড়ে; তাই আত্মরক্ষার জন্য তার পালক আছে। মাছ জলে থাকে। জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য তার এক বিশেষ অঙ্গের (ফুলকা) ব্যবস্থা হয়েছে। এমনি করে এই পৃথিবীতে যার যা দরকার ঠিক তারই জন্য তা নির্বাচিত হয়েছে। জগতের এই সুনিপুণ নির্বাচন-ব্যবস্থা জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক তা-ই মনে করিয়ে দেয়। প্রাণীর গঠন-বৈচিত্র্যও আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাণী-দেহের সৌন্দর্য বিধান করে। মানুষের চোখ, মুখ, কান প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ এক বিশেষ বিন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করেই বৃদ্ধি পায়। কোন মানুষেরই

১। Pringle Pattison : Idea of God গ্রন্থটির 'Lower Naturalism and Higher Naturalism' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

হাত দুটো অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল আর পদ-যুগলের বৃদ্ধি একেবারেই হল না—এমন হয় না। এখন প্রশ্ন ওঠে—প্রাণীদেহের এমন সুন্দর গঠন হল কি করে? এই গঠন যান্ত্রিকভাবে হয়েছে—একথা মানা যায় না। সুতরাং জগতে উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

জগতে চমৎকার স্তরভেদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদের চেয়ে পশু একটু উচ্চস্তরের। উদ্ভিদ খেয়েই পশু জীবন ধারণ করে। আবার মানুষ উদ্ভিদ ও পশু সকলের চেয়েই উচ্চস্তরের। মানুষ উদ্ভিদ ও পশু দুই-ই খায়। জগতের এই স্তরভেদের কথা ভাবতে গেলেই উদ্দেশ্যকারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায়, এ জগতে এক নিয়মের রাজত্ব চলেছে। এখানে উঠতেও নিয়ম, পড়তেও নিয়ম, স্থির থাকতেও নিয়ম। এই নিয়মের কোথায়ও ব্যতিক্রম নেই। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—জগতে নিয়মের রাজত্ব চলছে কেন? উত্তরে শুধু এই বলা যায় যে জগৎ উদ্দেশ্যমূলক বলেই এখানকার সব কিছুই সেই উদ্দেশ্য বা নিয়মের অনুবর্তন করে চলেছে।

৩। অভিব্যক্তি পরিবর্তন সূচনা করে। পরিবর্তন বলতে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা-প্রাপ্তিই বোঝায়। সুতরাং এক নূতন অবস্থা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই অভিব্যক্তিকে উদ্দেশ্যমূলকই বলা উচিত।[১]

এই সমস্ত যুক্তির ওপরে নির্ভর করে উদ্দেশ্যবাদীরা বলেন, জগৎ ও তার অভিব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকই হবে। উদ্দেশ্যবাদ দু রকমের হতে পারে—বিশ্বাতীত উদ্দেশ্যবাদ (External Teleology) ও বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদ (Immanent Teleology)। আমরা এখন এই দুরকমের উদ্দেশ্যবাদের দোষগুণ আলোচনা করব।

বিশ্বাতীত উদ্দেশ্যবাদ ঃ

বিশ্বাতীত উদ্দেশ্যবাদীদের মতে জগতের উদ্দেশ্য জগতের ভেতরে নেই। এই উদ্দেশ্য জগতের বাইরে থেকে জাগতিক সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। বিশ্বাতীত অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদীরা বলেন, জগতের সমস্ত পরিবর্তন ঈশ্বরই

১। A. E. Taylor: Elements of Metaphysics গ্রন্থের Some Conditions of Evolution অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

নিয়ন্ত্রিত করেন। শিল্পী এবং কারিগর যেমন তাদের শিল্পকর্মের বাইরে থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য অনুসারে শিল্পকাজটির সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষ বিধান করেন, ঈশ্বরও তেমনই বিশ্বের বাইরে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য বিশ্বের অভিব্যক্তির মধ্যে সার্থক করে তোলেন। বিশ্বাতীত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই বিশ্বাভিব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য এবং নিয়ামক।

সমালোচনা ঃ ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থেকে জগৎ নিয়ন্ত্রিত করেন তবে জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত করবে। আমরা ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত বলেই জানি। সুতরাং তিনি জগতের বাইরে থাকতে পারেন না। ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থেকেই জগতের মধ্য দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে নেন, তবে তাঁকে স্বার্থপর বলতে হয়। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর জগতের মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন হবেন। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে পরম করুণাময় বলেই জানি। সুতরাং মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি একান্ত স্বার্থপরের মত জগতের মধ্য দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে নেবেন—তা আমরা ভাবতে পারি না।

ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থাকেন তবে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে না। এই ক্ষেত্রে জগতের উদ্দেশ্য কারণরূপে ঈশ্বরের স্বীকৃতি এক দুর্বোধ্য রহস্যের স্বীকৃতিতে পর্যবসিত হবে। এতে জগতের কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে না।

ঈশ্বর বাইরে থেকে জগৎকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করেন বললে ঈশ্বরকে সাধারণ যন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ যন্ত্রী বাইরে থেকে যন্ত্রপরিচালনা করেন আবার বিকল হলে সারাই করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে কি সাধারণ যন্ত্রীর মত ভাবা যায়?

বার্গসঁ যে উদ্দেশ্যবাদকে বিপরীত যন্ত্রবাদ (Inverted Mechanism) বলে সমালোচনা করেছেন, আমাদের বিবেচনায় সেই সমালোচনা এই প্রকার উদ্দেশ্যবাদ প্রসঙ্গেই প্রযুজ্য। আমরা একথা সৃজনবাদ প্রসঙ্গে কিছু পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো বলে এখানে এবিষয়ে আর কিছু বলছি না।

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদের এসব দোষত্রুটি আছে বলে আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করতে পারি না। এবার উদ্দেশ্যবাদের দ্বিতীয় রূপ আলোচনা করা যাক।

বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদ ঃ

হেগেল, লোটজা, পলসন, ব্রেডলি, রয়েস্ প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে এই বিশ্ব এক চৈতন্য-সত্তার প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যম। এই অসীম চৈতন্য-সত্তা সীমার খণ্ডতা ও ছিন্নতার মধ্য দিয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করে চলেছেন। এই সত্তা যেমন বিশ্বগত (inmmanent in the world), তেমনি আবার বিশ্বাতীত (transcendent of the world)। এই চৈতন্যসত্তার প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধিরূপ উদ্দেশ্যই বিশ্বের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে চলেছে।

প্রাণ যে উদ্দেশ্যমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। জীবদেহের গঠন-ভঙ্গিমা দেহগত উদ্দেশ্য সূচনা করে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত দেহের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতার জন্যই বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়। জীবদেহের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তা উদ্দেশ্যবাদ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। এই উদ্দেশ্যবাদ যন্ত্রবাদের বিপরীত মতবাদ নয়, পরিপূরক মাত্র। আমরা এসব কথা পূর্বেই দশম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জাবদেহ যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তা যেমন দেহগত উদ্দেশ্যই, তেমনি এই বিশ্ব যে উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে তাও বিশ্বগত। জড়, প্রাণ ও মন—এই তিন স্তরের মধ্য দিয়ে এক অসীম চৈতন্য সত্তা বিশ্বগত উদ্দেশ্যরূপে নিজেকে চরিতার্থ করে চলেছেন। জড়ে তার প্রকাশ অত্যন্ত স্তিমিত, প্রাণে অধিকতর উজ্জ্বল আর মনে সব চেয়ে প্রকট। সীমার মধ্যে অসীম প্রকাশিত, অসীমের দ্বারাই সীমা ব্যাখ্যাত, অসীমের মধ্যেই সীমার তাৎপর্য ও সার্থকতা। অসীম সীমাকে বাদ দিয়ে নয়, সীমাকে নিয়ে এবং সীমাকে অতিক্রম করে। এই অসীমই বিশ্বাভিব্যক্তির উদ্দেশ্যরূপে কাজ করে এবং বিশ্বাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে বিকশিত ও সার্থক হয়।

বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদে বিশ্বাতীত উদ্দেশ্যবাদের দোষত্রুটি পাওয়া যায় না। যন্ত্রবাদের যান্ত্রিকতার স্থানও এখানে নেই। বিশ্ব যে উদ্দেশ্যমূলক একথার স্বীকৃতি এই মতবাদে আছে। জীবদেহ যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে দেহগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তেমনি এই বিশ্বে এক পরম চৈতন্য আপনার পরিপূর্ণতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করে চলে। এই মতবাদ জড়, প্রাণ ও মনের ধারাবাহিকতা স্বীকার করে ও প্রাণ এবং মন যে জড় থেকে সত্যই উন্নত তা স্বীকার করে এবং উদ্দেশ্যকারণের ভিত্তিতে বিশ্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়। এই মতবাদের পেছনে যে যুক্তি আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সৃজনবাদ (Creative Evolution)

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতে যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদ উভয়ই সমানভাবে অযৌক্তিক। তিনি সৃজনবাদের সমর্থক। তাঁর মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত (undetermined), অজ্ঞাতপূর্ব (unpredictable) ও সৃজনমূলক (creative)। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া অজ্ঞাতপূর্ব নূতন নূতন পথে নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এগিয়ে যায়। পুরাতন কোন জিনিসেরই পুনরাবির্ভাব (repetition) অভিব্যক্তিতে নেই। সম্পূর্ণ নূতন জিনিস সৃষ্টিই অভিব্যক্তির কাজ। সুতরাং পুনরাবির্ভাব নয়, সৃষ্টিই অভিব্যক্তির মূল লক্ষ্য।

অভিব্যক্তির এই অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তবে যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কেউই যে অভিব্যক্তির তাৎপর্য প্রকাশ করে নি তা স্বীকার করতে হয়। বার্গসঁ প্রথমেই যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন।

যন্ত্রবাদ অনুসারে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যতিক্রম কল্পনাই করা যায় না। যন্ত্রবাদের মতে জড় প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে আর প্রাণ মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জড় থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় বা প্রাণ থেকে যখন মনের উদ্ভব হয়, তখন কোন নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয় না। প্রাণ জড়েরই জটিলতররূপে পুনরাবির্ভাব মাত্র। মন জড়ের জটিলতম রূপ। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের মতে নিয়ন্ত্রণ ও পুনরাবির্ভাব অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। বার্গসঁ মনে করেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, এখানে পুনরাবির্ভাবেরও কোন স্থান নেই। সুতরাং তিনি যন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে প্রত্যাহার করেছেন।

বার্গসঁ বলেন, উদ্দেশ্যবাদ বিপরীত যন্ত্রবাদ মাত্র (Inverted mechanism)। যন্ত্রবাদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদ অনুসারে উত্তর স্তরই পূর্ব স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উদ্দেশ্যবাদীদের মতে সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াই এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্যে এগিয়ে যায়। সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া এই উদ্দেশ্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই উদ্দেশ্য অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার সম্মুখে আদর্শরূপে উপস্থিত করা হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যবাদে সম্মুখস্থ আদর্শই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যন্ত্রবাদের মতে,

পূর্ব স্তরই উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উদ্দেশ্যবাদকে বিপরীত যন্ত্রবাদই বলা উচিত। যন্ত্রবাদ যদি নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতির জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে, তবে উদ্দেশ্যবাদও অনুরূপ দোষে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুতরাং বার্গসঁ বলেন, যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কোন বাদই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কোনটাই যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হয়, তবে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বার্গসঁ বলেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া একান্তভাবেই সৃজনমূলক। নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করাই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার একমাত্র কাজ। বার্গসঁর মতে, অনাদি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ (elan vital) বিশ্বের চরমতত্ত্ব। এই প্রাণ-প্রবাহ প্রতিনিয়ত নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি ক'রে চলেছে। প্রাণ-প্রবাহের উত্তর গতি সম্বন্ধে পূর্ব মুহূর্তে কিছুই বলা যায় না। যা আছে তার পুনরাবির্ভাব প্রাণ-প্রবাহের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নেই। যতই প্রাণ-প্রবাহ এগিয়ে চলে ততই তা নূতন নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পূর্ণ ও বেগবান হয়ে ওঠে। প্রাণ-প্রবাহ কখনও থামে না, উন্মত্ত উধাও হয়ে নিত্যই তা চলে। এই প্রাণ-প্রবাহকে কাল-প্রবাহও বলা যেতে পারে। এই কাল-প্রবাহে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাগ নেই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই প্রবাহের একান্ত অবিচ্ছিন্ন তিনটি তরঙ্গবিশেষ। অতীত তরঙ্গ বর্তমান তরঙ্গে মিশেই আছে আর বর্তমান তরঙ্গ ভবিষ্যৎ তরঙ্গের মধ্যে আপনাকে প্রথম থেকেই সমর্পণ করে রেখেছে। সুতরাং এই ত্রিতরঙ্গের মধ্যে কোন ভেদ বা বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদহীন কাল-প্রবাহ বা প্রাণ-প্রবাহ নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় অন্ধ হয়ে ছুটেছে। প্রাণ-প্রবাহের এই চলার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। সমস্ত বন্ধনমুক্ত একান্ত অন্ধ এই প্রবাহ। এই প্রবাহের অন্ধ গতিপথেই জড় ও চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে। এক হাউই বাজি থেকে যেমন বিভিন্ন আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে তেমনি এক প্রাণ-প্রবাহ থেকে নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়। একটি ধানের শীষ যেমন অসংখ্য ধান ছড়িয়ে দেয় তেমনি প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য নূতন বস্তু সম্ভব করে তোলে। প্রাণ-প্রবাহের যেমন আদি নেই তেমনি তার অন্তও নেই। সুতরাং প্রাণ-প্রবাহের সৃজনলীলারও কোন শেষ থাকতে পারে না।

সমালোচনা ঃ বার্গসঁ অভিব্যক্তির একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় যে নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি

হয় তা অস্বীকার করা যায় না। যন্ত্রবাদীদের পুনরাবির্ভাব কখনই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার আসল রূপ প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে বার্গসঁর অভিযোগ আমরা সত্য বলেই মনে করি। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যবাদকে বিপরীত যন্ত্রবাদ বলেছেন তা সর্বৈব সত্য নয়। বিশ্বাতীত উদ্দেশ্যবাদকেই বিপরীত যন্ত্রবাদ বলা যায়। বিশ্বাতীত উদ্দেশ্য-বাদেই সম্মুখস্থ উদ্দেশ্য সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদ অনুসারে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার মধ্যেই উদ্দেশ্য বর্তমান। সুতরাং এখানে অভিব্যক্তির কোন বহির্নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ওঠে না। স্বনিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতারই নামান্তর। যন্ত্রবাদে স্বনিয়ন্ত্রণ বা স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। সুতরাং বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদ কোন রকমের যন্ত্রবাদই হতে পারে না।

বার্গসঁ যে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টির কথা বলেছেন তার সত্যতাও স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখতে হবে। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় নূতন জিনিস সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু বার্গসঁ নূতনকে যে সম্পূর্ণ নূতন বলেছেন তার যৌক্তিকতা বিবেচ্য। এই বিশ্বে সম্পূর্ণ নূতন বলে কিছু আছে কি ? সবই ত পূর্বের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। যদি পূর্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ অযুক্ত কোন নূতনের কথা ভাবি তবে তা হবে এক বিরাট রহস্য এবং তা থাকবে অব্যাখ্যাত। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা রহস্য সমর্থন করি না, প্রচলিত বা সাধারণতঃ রহস্য বলে গৃহীত কোন কিছুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করি। দর্শনের ছাত্র হিসেবে আমাদের কাজ রহস্য সৃষ্টি করা নয়, রহস্যের ব্যাখ্যা করা। কিন্তু, বার্গসঁ অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরকে করে তুলেছেন এক একটি গভীর রহস্য।

বার্গসঁ প্রাণ-প্রবাহকে সমস্ত বন্ধনমুক্ত অন্ধ প্রবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এই জগতের সুসজ্জিত ও সুসমঞ্জস গঠন-বৈচিত্র্য এই অন্ধ প্রবাহ থেকে কি করে সৃষ্টি হয়, তা আমরা বুঝি না। আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন এক অন্ধ সৃষ্টি-ব্যাকুলতা কখনও কোন সুসমঞ্জস ও সুসজ্জিত বিশ্বের সৃষ্টি করতে পারে না। বিশ্বের রচনা ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। বার্গসঁ তা করেননি।

বার্গসঁ বলেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় যেহেতু একই তত্ত্ব (প্রাণ-প্রবাহ) নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করে, সুতরাং অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে

একটা ঐক্য আছে, তা মানতে হয়, আবার অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন নূতন জিনিস সৃষ্টি হয় বলে তাতে যে বৈচিত্র্য আছে তাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—বার্গসঁ যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস সৃষ্টির কথা বলেছেন তা কি সমস্ত অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা স্বীকার করলে মানা যায়? অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস সৃষ্টি হয় বললে অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঐক্য মানা যায় না, আর অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঐক্য মানলে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস সৃষ্টি হয়, একথা বলা যায় না।

বার্গসঁ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল জগতের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

সর্বশেষে বলা যায়, প্রাণ-প্রবাহের অন্ধসৃষ্টি-ব্যাকুলতা-কল্পনায় বার্গসঁ যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের চিত্ত তৃপ্ত হয়, কল্পনায় রঙ লাগে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির দরবারে বার্গসঁর আবেদন বিশেষ সাড়াই আনতে পারে না। দর্শন বুদ্ধির ব্যাপার। সুতরাং দর্শনের জগতে বার্গসঁর সৃজনবাদের মূল্য খুব বেশী নয়।[১]

উন্মেষবাদ (Emergent Evolution)

উন্মেষবাদ কিছুটা সৃজনবাদের মতই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে নূতনের আবির্ভাব স্বীকার করে। যন্ত্রবাদীদের পুনরাবির্ভাবাদ সৃজনবাদীদের মতই উন্মেষবাদীরা খণ্ডন করেছেন। উন্মেষবাদীদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরে জটিলতর রূপে আবির্ভূত হয় না। পূর্ব স্তর যখন উত্তর স্তরের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলে তখন উত্তর স্তরে এক নূতন গুণের উন্মেষ হয়ে থাকে। অবশ্য উন্মেষবাদীদের এই নূতন গুণ পূর্ব স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই গড়ে ওঠে। কিন্তু সৃজনবাদীদের উত্তর স্তরের নূতনত্ব পূর্ব স্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণ অভিনব। সুতরাং সৃজনবাদের সঙ্গে উন্মেষ-বাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

উন্মেষবাদের তাৎপর্য বুঝতে গেলে উন্মেষিত গুণের (emergent quality) তাৎপর্য বুঝতে হয়। জর্জ হেনরি লিউইস্ যোগগত গুণ (resultant quality)

১। বার্গসঁর সৃজনবাদের বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য তাঁরই লেখা 'Creative Evolution' গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত।

ও উন্মেষিত গুণের মধ্যে তফাৎ করেছেন। এই পার্থক্য বুঝলেই উন্মেষিত গুণের তাৎপর্য বোঝা যাবে। যোগগত গুণ উপাদান গুণের যান্ত্রিক যোগ থেকেই লাভ করা যায়। কিন্তু উন্মেষিত গুণ উপাদান গুণের যান্ত্রিক যোগ থেকে পাওয়া যায় না। উন্মেষিত গুণ বলতে উপাদান গুণ থেকে উন্মেষিত নূতন গুণ বোঝায়। উদাহরণ দিলে সমস্ত ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করলে জল পাওয়া যায়। জলের ওজন তার উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের সরল যোগ থেকেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যতটুকু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে জল হয় তার ওজন যতটুকু জলের ওজন ঠিক ততটুকুই হয়। সুতরাং জলের ওজনকে যোগগত গুণ বলা যেতে পারে। কিন্তু জলের তৃষ্ণা-নিবারণের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা জলের উপাদান হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারুরই নেই। সুতরাং তৃষ্ণা-নিবারণের ক্ষমতা-রূপ গুণ জলের উপাদানের কোন গুণের যান্ত্রিক যোগ-সঞ্জাত নয়। জলের এই গুণকে উন্মেষিত গুণ বলা হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করলেই এই নূতন গুণের উদ্ভব হয়।

উন্মেষবাদীদের মতে প্রাণ ও চৈতন্য এইরূপ উন্মেষিত গুণ। জড় থেকেই জীবের উদ্ভব হয়। কিন্তু জীবে প্রাণরূপ নূতন গুণ পাওয়া যায়। এই নূতন গুণ জড়ে নেই। মন প্রাণ থেকেই আসে। কিন্তু মনের স্তরে চৈতন্যরূপ এক নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এই গুণ মনের উপাদান প্রাণে থাকে না। সুতরাং উন্মেষবাদীরা প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। যন্ত্রবাদীদের মত তাঁরা প্রাণ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে জড়ে পরিণত করেন না। এই দিক থেকে উন্মেষ-বাদীরা যে সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার ও লয়েড্ মর্গান উন্মেষবাদের সমর্থক।[১] অধ্যাপক সেলার্সের 'অভিব্যক্তিধর্মী নিসর্গবাদ' (Evolutionary Naturalism) গ্রন্থে উন্মেষবাদের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। অবশ্য সেলার্সের

১। উন্মেষবাদের পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য উৎসাহী পাঠকেরা যদি Sellars-রচিত Evolutionary Naturalism, Alexander-রচিত Space, Time and Deity দুই খণ্ড এবং Lloyd Morgan-রচিত Emergent Evolution গ্রন্থগুলো পাঠ করেন তবে খুবই উপকৃত হবেন।

সময়ে উন্মেষবাদ কথাটি প্রচলিত ছিল না। যা হোক, উন্মেষবাদের বক্তব্যের সঙ্গে সেলার্সের মতবাদের কিছু কিছু মিল আছে। সেজন্য উদ্দেশ্যবাদ প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক সেলার্সের অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে চাই।

অধ্যাপক সেলার্সের মতে শৃঙ্খলাহীন জড়বস্তু থেকেই জীবের গঠন-শৃঙ্খলা উন্মেষিত হয়েছে। সেলার্স প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেননি। তিনি জড় থেকে মন বা চৈতন্যের উন্মেষ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা, বাহ্যবস্তুর সংগঠন থেকেই মানস-ব্যাপার ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে উঠেছে। বাহ্যবস্তুতে চৈতন্যরূপ ধর্মের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বস্তুর বিশেষ সংগঠনেই এই ধর্ম উন্মেষিত হয়ে ওঠে।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার 'দেশ, কাল ও দেবসত্ত্ব' (Space, Time and Deity) নামক গ্রন্থে উন্মেষবাদের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে দেশ-কাল বিশ্বের আদিম উপাদান। দেশ-কালকে শুদ্ধ গতিও (pure motion) বলা যেতে পারে। এই আদিম উপাদান থেকে প্রথমে মুখ্য গুণ-বিশিষ্ট জড় দ্রব্যের উদ্ভব হয়েছে। এর পর গৌণ গুণের আবির্ভাব হয়েছে। এই জড় থেকে জীবন ও চৈতন্যের উন্মেষ হল। প্রাণ ও চৈতন্য—জড় সত্তা থেকে উন্মেষিত গুণ বা ধর্ম। চৈতন্য গুণের উন্মেষের সঙ্গেই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। শুদ্ধ গতি নূতন নূতন গুণের উন্মেষের দিকে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে ধাবিত করে। চৈতন্যের পর যে ধর্মের উন্মেষ হবে—আলেকজেণ্ডার তার নাম দিয়েছেন 'দেবসত্ত্ব'। তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এই দেবসত্ত্বের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। একদিন না একদিন বিশ্বের এই প্রতীক্ষা সফল হবেই। আলেকজেণ্ডার ব্যাপকতর অর্থেও 'দেবসত্ত্ব' (deity) শব্দটির ব্যবহার করেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি নূতন গুণকেই তার পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় 'দেবসত্ত্ব' বলা যেতে পারে। এই অর্থে জড়ের স্তরে প্রাণই দেবসত্ত্ব। আবার প্রাণের স্তরে মনই দেবসত্ত্ব। এখন মনের স্তরে আমরা আছি বলে অনাগত গুণকে দেবসত্ত্ব নামে অভিহিত করি। যখন এই অনাগত গুণের শুভাগমন হবে তখন সেই গুণকে আর দেবসত্ত্ব বলব না। এই নবাগত গুণের পরবর্তী স্তরেরই নাম থাকবে 'দেবসত্ত্ব'।

অভিব্যক্তির জন্য আলেকজেণ্ডার 'তেজস্' (Nisus) নামে অভিব্যক্তির এক অনুকূল উত্তেজক শক্তি স্বীকার করেছেন। মন বা চৈতন্যের উন্মেষের

আগে এই 'তেজস্' অচেতনধর্মী ছিল ; মনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মানস-ধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী (teleological) হয়ে উঠেছে।

লয়েড্ মর্গান 'উন্মেষবাদ' (Emergent Evolution) নামক গ্রন্থে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে উন্মেষিত গুণ (emergent attribute) লাভ করা যায়। অভিব্যক্ত বস্তুকে যোগসঞ্জাত (resultant) না বলে উন্মেষিতই (emergent) বলা উচিত। আলেকজেণ্ডার যেমন 'তেজস্' স্বীকার করেছেন, মর্গান তেমনি 'সক্রিয়তা' (activity) নামে অভিব্যক্তির অনুকূল একটি শক্তির অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। তিনি এই সক্রিয়তাকে কখনও মন (mind), কখনও আত্মা (spirit), কখনও বা ঈশ্বর (God) নামে অভিহিত করেছেন। মর্গানের মতে ঈশ্বর জাগতিক প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে আকর্ষণী শক্তি-রূপে কাজ করেন। তাঁর আকর্ষণেই সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া চলছে। মর্গানের এই মতবাদ 'অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদীরা সমস্ত গতির নিয়ামকরূপে বিশ্বের ঊর্ধ্বে এক নিশ্চল ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন।

সমালোচনা : সেলার্স মনে করেন, শৃঙ্খলাহীন জড় বস্তু থেকেই প্রাণ ও মনের শৃঙ্খলার উন্মেষ হয়েছে। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় এই উন্মেষ সম্ভব হল—এ বিষয়ে সেলার্স কিছুই বলেননি। উন্মেষ-প্রক্রিয়ার প্রযোজক কারণ না থাকলে উন্মেষ-প্রক্রিয়া কি ভাবে কাজ করে তা বোঝা যায় না। সেলার্স অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রযোজক কারণের কথা কিছুই বলেননি। সুতরাং সেলার্সের মতবাদ আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে না।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার অভিব্যক্তির প্রযোজক কারণ হিসাবে 'তেজস্'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মন বা চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এই তেজস্ অচেতনধর্মী ছিল। কোন অচেতনধর্মী তেজস্ কি করে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া পরিচালিত করে, তা আমরা বুঝি না। পরিচালনা বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপার। বুদ্ধি না থাকলে কোন কিছুই পরিচালনা করা যায় না। সুতরাং কোন অচেতন তেজস্ই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে পারে না। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, চৈতন্যের আবির্ভাবের পর তেজস্ চৈতন্যধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, তেজস্ সব সময়েই চৈতন্যধর্মী থাকে। কোন অচেতন তেজস্ই কোন অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত

করতে পারে না। সুতরাং আলেকজেণ্ডারের বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না।

লয়েড্ মর্গান 'অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ'-এর মত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববহির্ভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই অধ্যায়েই 'অতিবর্তী-উদ্দেশ্যবাদ' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে সব অসুবিধের কথা উল্লেখ করেছি, সেই সব অসুবিধেই লয়েড্ মর্গানের অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে দেখা দেবে। সুতরাং মর্গানের মতবাদও গ্রহণ করা যায় না।

অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, একমাত্র অন্তঃস্যূত বা বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। সুতরাং যন্ত্রবাদ, উদ্দেশ্যবাদ, সৃজনবাদ ও উন্মেষবাদের মধ্যে একমাত্র অন্তঃস্যূত বা বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদের বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্তঃস্যূত বা বিশ্বগত উদ্দেশ্যবাদীরা অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা'ই আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

মন বা আত্মা (Mind)

ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ মন বলতে অন্তরিন্দ্রিয় বোঝায়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে আমরা বাইরের বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। মন দিয়ে আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের জ্ঞান পাই। সুতরাং মন আন্তর অবস্থার জ্ঞান দিয়ে থাকে। কাজেই মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলতে হয়। আত্মা বলতে সাধারণতঃ জ্ঞাতা বোঝায়। যিনি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তিনিই আত্মা। অদ্বৈত বেদান্তে শুদ্ধ জ্ঞানকেই আত্মা বলা হয়েছে। যা হোক, ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মা যে পৃথক তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমের দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্যরেখা টানা হয়নি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা মন ও আত্মা সমার্থক বলেই মনে করেন। আমরা এই অধ্যায়ে মন বা আত্মার স্বরূপ আলোচনা করব।

আত্মা কি কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য? (Is Mind any spiritual substance ?)

বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন বা আত্মাও বিভিন্ন হয় না। মন বা আত্মা অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকে বলেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের মনে থাকতে পারে। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা একমাত্র অভিন্ন ও অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং আত্মাকে এক অপরিবর্তিত ও স্থির আধ্যাত্মিক দ্রব্যই বলা উচিত। এরকম অপরিবর্তিত আত্মাকে ইংরেজীতে সোল্ (Soul) শব্দ দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। পশ্চিমের অনেক দার্শনিকই আত্মা সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেছেন। আমরা তাঁদের বক্তব্যের গুণাগুণ আলোচনা করছি।

প্রাচীন কালে লোকেরা আত্মাকে দেহের ছায়াময় প্রতিরূপ (shadowy duplicate of the body) বলে মনে করত। ঘুমের সময় এই ছায়াময় প্রতিরূপ দেহ ছেড়ে যায়। আবার ঘুম ভাঙলেই এই প্রতিরূপ দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়। মৃত্যু দেহের সঙ্গে এই প্রতিরূপের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ সূচনা করে। প্লেটোর আগে গ্রীক দর্শনে আত্মা বলতে এক জড় পদার্থই বোঝাত। কখনও

কখনও বায়ু বা বাষ্পকে আত্মা বলা হত। ডেমোক্রাইটাস্ আত্মাকে সূক্ষ্ম, মসৃণ ও গোলাকার অগ্নির পরমাণু দিয়ে সৃষ্ট বলে মনে করতেন। প্লেটোই প্রথম গ্রীক দর্শনে জড় ও আত্মার মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন। গ্রীক দর্শনে সর্বপ্রথম প্লেটোই মনের আধ্যাত্মিক রূপ প্রকাশ করেছেন।

আত্মা সম্বন্ধে প্লেটোর মত ঃ

প্লেটোর মতে মন বা আত্মার তিন ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা চিন্তা (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (will) বলে মনের যে তিন ভাগ করেছেন, প্লেটোর আত্মার তিন ক্রিয়া অনেকটা তার অনুরূপ। প্লেটো চিন্তার বদলে 'প্রজ্ঞা' (reason) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনুভূতি বলতে তিনি 'কামনা' (appetition) বোঝেন, আর ইচ্ছার বদলে 'শক্তি' (spirit) শব্দ ব্যবহার করেন। প্রজ্ঞাই আত্মার আসল রূপ। প্রজ্ঞা আত্মার দেবসত্তা। এই প্রজ্ঞারূপ আত্মা যখন দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাতে কামনা ও শক্তির উদয় হয়। কামনা ও শক্তি আত্মার নীচ প্রবৃত্তি। দেহের সঙ্গে সঙ্গে এই নীচ প্রবৃত্তির উদয়, আবার দেহের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রবৃত্তির বিলয়। জন্মের সময় আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় আর মৃত্যুর পর আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়। সুতরাং জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে আত্মা শুদ্ধরূপে বা প্রজ্ঞারূপে বিরাজ করে। প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞারূপ আত্মা থাকতে পারে। সুতরাং দেহের সঙ্গে আত্মার কোন নিবিড় সম্পর্ক নেই।

আত্মা সম্বন্ধে আরিস্টটলের মত ঃ

প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটল আত্মা সম্বন্ধে গুরুর মত অনেকাংশেই গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি আত্মা ও দেহের নিবিড় সম্পর্ক স্বীকারের পক্ষপাতী। আত্মাকে তিনি দেহের আকার (form) বা সংগঠন (organisation) বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আরিস্টটল আত্মাকে দৈহিক সংগঠন (physiological organisation) বলে মনে করেন না। তিনি আত্মার দেহাতিরিক্ত সত্তায় বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর কোন মতানৈক্য নেই। তবে তাঁর মতে আত্মার জন্যই জীবদেহের গঠনবৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্ভব হয়। আত্মা যেন দেহের চালক বা নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করে। কর্ণধার যেমন

তরণী চালনা করেন, তেমনি আত্মা দেহ পরিচালনা করেন। প্লেটোর মতই আরিস্টটল প্রজ্ঞাকেই আত্মার স্বরূপ বলে মনে করেন। সুতরাং আরিস্টটলের মতে স্বরূপতঃ আত্মা এক অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা দ্রব্যবিশেষ ; এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অজর ও অমর।

মধ্য যুগের অধিকাংশ চিন্তানায়কই প্লেটো ও আরিস্টটলের মত আত্মাকে এক অধ্যাত্মতত্ত্ব বলে মনে করতেন। আধুনিক কালে ডেকার্টে, লক ও বার্কলি প্লেটো-আরিস্টটলের চিন্তাধারার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সকলেই আত্মা বলতে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা দ্রব্য বোঝেন।

আত্মা সম্বন্ধে ডেকার্টে, লক ও বার্কলির মত :

ডেকার্টে আত্মা বলতে জড় থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝেছেন। ডেকার্টের মতে বিস্তৃতিই জড়ের স্বরূপ। আত্মার কোন বিস্তৃতি নেই। জড় নিশ্চেতন। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা এক সরল ও অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। সমস্ত কিছুই সন্দেহ করা যায়, কিন্তু আত্মাকে সন্দেহ করা যায় না। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে সংশয়-কর্তা রূপে আত্মাকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ডেকার্টের মতে, আত্মার অস্তিত্ব একান্তভাবেই সন্দেহাতীত।

লক্ আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির অজ্ঞাত আধার বলে মনে করেন। এই অজ্ঞাত আধার জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও এই আত্মা কখনও কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, তবু সুখ-দুঃখের আধার রূপে এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আত্মা না থাকলে সুখ, দুঃখ প্রভৃতির কোন অধিষ্ঠান থাকে না। সুখ-দুঃখ শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে না। সুতরাং সুখ-দুঃখের একটা আধারের কল্পনা অপরিহার্য। এই আধারই আত্মা। আত্মা অধ্যাত্মরূপ ও অবিনশ্বর। অপরোক্ষ অনুভূতিতে (intuition) আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

বার্কলি জড় বলে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জড় বলে যা আমরা জানি তা মনের ধারণা মাত্র। কিন্তু আত্মা বা মন মনের ধারণা মাত্র নয়। আত্মা ছাড়া কোন ধারণাই হয় না। এই আত্মার কোন সাধারণ[১] ধারণা হয় না। আত্মা সম্বন্ধে আমাদের বোধ (notion) হয়। আত্মা এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

১। Ordinary

সমালোচনা : হিউম ও কাণ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'আত্মা এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব' এই মতবাদ আক্রমণ করেছেন। আমরা এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে হিউম ও কাণ্টের এই আক্রমণই আলোচনা করব।

হিউম বলেন, আত্মা নামে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। সমস্ত আন্তর অবস্থারই অন্তর্দর্শন (introspection) হয়। যা অন্তর্দর্শনে পাওয়া যায় না তা অন্তরে আছে, এমন কথা বলা যায় না। কোন অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্তর্দর্শন হয় না। সুতরাং অবিনশ্বর আত্মা বলে কিছু নেই। হিউম বলেন, 'আমার দিক থেকে যখনই আমি অন্তরঙ্গভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ করি, আমি সর্বদাই কোন না কোন সংবেদন পাই ; কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা, কখনও আলো কখনও ছায়া, কখনও ভালবাসা, কখনও বিদ্বেষ, কখনও দুঃখ, কখনও বা সুখ। আমি কখনও কোন সংবেদন ছাড়া কিছুই প্রত্যক্ষ করি না।'[১] হিউমের মতে সমস্ত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ থেকে আসে। সুতরাং প্রত্যক্ষে আত্মা বলে কিছু না পাওয়ায় আত্মা নামে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল কতকগুলো আন্তর সংবেদনই পেয়ে থাকি, কোন অপরিবর্তিত আত্মা পাই না। সুতরাং আত্মা বলে কিছু নেই।

কাণ্টের মতে আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে অনুপপত্তির উৎপত্তি হয়। যখন আমরা আত্মাকে সরলতা (simplicity), অমরতা (immortality), বিবিক্ততা (separability from body) প্রভৃতি গুণযুক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে ভাবি, তখন আত্মা জ্ঞানের বিষয় হয়ে যায়। এমনি করেই প্রত্যেকেই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করে। কিন্তু আত্মা জ্ঞাতা। সুতরাং তা অন্যান্য বস্তুর মত জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কাজেই আত্মা সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব, অমরতা প্রভৃতি কোন গুণই প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং আত্মা বলে কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নেই।

আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে তা কখনও আমাদের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা-

---

১। "For my part, when I enter most intimately into what I call myself. I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I can never catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception."

গুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্রিত না করলে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না। আধ্যাত্মিক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এই আত্মা সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতাগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করতে পারে না। আত্মাকে অভিজ্ঞতার নিষ্ক্রিয় আধার বলা হয়। কিন্তু এই আধার অভিজ্ঞতাগুলোকে একসূত্রবদ্ধ করতে পারে না; কারণ, একসূত্রবদ্ধ করার জন্য যে সক্রিয়তার দরকার তা আত্মার নেই। মন বা আত্মা যদি সক্রিয়ভাবে সংবেদনগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত বা ব্যাখ্যা না করে তবে জ্ঞান হতে পারে না। মনে করুন, বাইরের আলোর সঙ্গে চোখ সন্নিকৃষ্ট হল। এই সন্নিকর্ষের ফলে চোখের স্নায়ুতে চাঞ্চল্য দেখা দেবে। মন যখন সক্রিয়ভাবে এই চাঞ্চল্য ব্যাখ্যা করে তার উৎসের নাম দেবে আলো, তখনই আলোর ধারণার সৃষ্টি হবে। এমনি ক'রে মনের অন্যরকম ব্যাখ্যা থেকে 'লাল' রঙের ধারণা পাওয়া যায়। মন যখন এই দুই ধারণা মিলিয়ে দেয় তখন 'আলো লাল'—এই পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং জ্ঞান-ব্যাপারে মন বা আত্মার সক্রিয়তা স্বীকার করতে হয়। কাজেই আত্মা কোন নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য হতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে নানা রকমের অসুবিধে দেখা দেয়। সুতরাং আত্মাকে কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা যায় না।

আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ
(The Empirical Theory of Mind)

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে, প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ। যা প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না তার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ-বাদীদের বক্তব্য হিউমের চিন্তাধারায় সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আত্মা সম্বন্ধে হিউমের মতবাদই আলোচনা করব।

হিউম বলেছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কোন অপরিবর্তিত আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানে সব সময়েই কতকগুলো পরস্পরবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল

অনুভূতি বা মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আত্মা বা মন বলতে এই বিচ্ছিন্ন অনুভূতি বা মানসিক অবস্থাগুলোর সমষ্টিকেই বোঝায়।[১] অনুভূতি বা মানসিক অবস্থার পেছনে অপরিবর্তিত আত্মা বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ, রাগ-বিরাগ, প্রীতি-দ্বেষ ও এই জাতীয় বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলো একত্র হয়েই মনের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ঐক্য অনুষঙ্গের সূত্র (Laws of Association) দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার ঐক্যের জন্য কোন পৃথক অপরিবর্তিত তত্ত্বের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—মন বা আত্মা যদি বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার সমাহার মাত্র হয় তবে ব্যক্তি-মনের ঐক্য বা তাদাত্ম্য (Personal Identity) কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এই প্রসঙ্গে হিউম বলেন, মানব-মনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত মানসিক অবস্থার পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি অতীত মানসিক অবস্থার প্রতিরূপের সাহায্যে আমাদের মানসিক অবস্থাগুলোর মধ্যে একটি সাদৃশ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে। কল্পনা এই পথে অগ্রসর হয়ে সাদৃশ্যকে স্থায়িত্ব বা তাদাত্ম্যের রূপ দেয়। অর্থাৎ, স্মৃতিতে যাকে সদৃশ বলে জানা যায়, কল্পনায় তাকে স্থায়ী বা এক বা তদাত্মক বলে মনে হয়। তদুপরি আমাদের মানসিক অবস্থাগুলো কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ। আমাদের মুদ্রণগুলো (impressinos) তদনুসারী ধারণার (ideas) সৃষ্টি করে, এই ধারণাগুলো আবার অন্য মুদ্রণের সৃষ্টি করে। একটি চিন্তা অন্য চিন্তাকে অনুসরণ করে, তা আবার অন্য চিন্তাকে অনুসরণ করে। এই ক্ষেত্রেও স্মৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্মৃতির ভিত্তিতে আমাদের মানসিক অবস্থাগুলো কল্পনায় অনুষঙ্গের নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং আমরা যেখানে বস্তুতঃ পরস্পরসম্বদ্ধ মানসিক অবস্থার পারম্পর্য বর্তমান সেখানে তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আরোপ করি। মনের তাদাত্ম্য আমাদের কল্পনা, এর কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।

১। 'The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively make their appearance ; pass, re-pass, glide away and mingle in an infinite variety of postures and situations...the comparison of the theatre must not mislead us. They are the successive perceptions only, that constitute the mind ; nor have we the most distant notion of the place. where these scenes are represented, or of the materials, of which it is composed.' Hume, Treatise, Book I, Part IV, Section VI.

সমালোচনা ঃ কান্ট হিউমের এই মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে কোন ঐক্য ছাড়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলো অনুভব থাকতে পারে না। কান্টের মতে মন বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির ঐক্য-বিধায়ক এক প্রক্রিয়া বিশেষ (unity of apperception), এই প্রক্রিয়া সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তির মূলেই থাকে। এই প্রক্রিয়া না থাকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অনুভব-গুলো ঐক্যবদ্ধ হত না, আর অনুভবগুলো ঐক্যবদ্ধ না হলে কোন জ্ঞানেরই সৃষ্টি হত না। হিউম যে মনে করেন অনুষঙ্গের নিয়ম বিচ্ছিন্ন অনুভবের ঐক্য বিধান করে, তা মানা যায় না। কারণ স্মৃতি না হলে অনুষঙ্গের নিয়ম থাকতে পারে না। হিউমের মতে পাশাপাশি থাকা অনুষঙ্গের একটি নিয়ম (Law of Contiguity)। পাশাপাশি যে সমস্ত অনুভব হয় তা সংযুক্ত হতে পারে তখনই যখন তারা বারবার দেখা দেয়। এই সংযোগের জন্য বিশেষ অনুভব যে আগে ও পাশাপাশি ছিল তার স্মৃতি থাকা দরকার। মনের স্বরূপেই যদি কোন ঐক্য না থাকে তবে এই স্মৃতি হতে পারে না। যা আগে প্রত্যক্ষ হয়েছিল তা মনে থাকলেই ত' স্মৃতি হতে পারে। সুতরাং স্মৃতির ব্যাখ্যার জন্য মনের ঐক্য স্বীকার করা দরকার। কাজেই মনের ঐক্য না থাকলে কোন অনুষঙ্গের নিয়মই কাজ করতে পারে না। মনের যদি কোন স্বরূপগত ঐক্য না থাকে তবে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)-ও হতে পারে না। পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে পূর্বজ্ঞাত বলে জানার নামই প্রত্যভিজ্ঞা। যে রামবাবুকে আমি কাল দেখেছি, তাঁর ধারণা আমার মনে অবিকৃত ভাবে না থাকলে, আজ আবার তাঁকে দেখলে কালকের রামবাবু বলে চিনতে পারি না। সুতরাং রামবাবুকে কালকের রামবাবু বলে চিনতে হলে তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্তনশীল হতে পারে না। আমার ধারণা পরিবর্তনশীল না হলে আমিও পরিবর্তনশীল হতে পারি না। অর্থাৎ আমার যে একটা ঐক্য বা অভেদ আছে, তা স্বীকার.করতে হয়। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে হলে মনের ঐক্য স্বীকার করতে হয়।

কান্ট বলেন, বিচ্ছিন্ন অনুভব আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ আমাদের বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলিকে আমরা জানতে পারি। আত্মা বা মন জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় নয়। অর্থাৎ মনই অনুভবগুলোকে জানে। সুতরাং হিউম যে বলেছেন, আত্মা বা মন বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিমাত্র—তা হতে পারে না।

আমাদের অনুভব সহস্ররূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অনুভবের শত

পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত অভেদ (Personal identity) কখনও লুপ্ত হয় না। যে আমি শিশু ছিলাম, সেই আমিই আজ যুবক হয়েছি। একদিন সেই আমিই বৃদ্ধ হব। সুতরাং আমার বহু পরিবর্তনের মধ্যেও আমি একই আছি। কাজেই আমার আত্মা বা মনের ঐক্য অস্বীকার করা যায় না। হিউম আত্মা বা মনের স্বরূপগত কোন ঐক্য স্বীকার করেন না। তিনি মনের ঐক্যকে কল্পনা বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্মৃতির সাহায্যে ব্যক্তির তাদাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু, ব্যক্তির ঐক্য না থাকলে স্মৃতি সম্ভব নয়। সুতরাং স্মৃতির সাহায্যে ব্যক্তির ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গেলে চক্রক দোষের উদ্ভব হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অনুভব বলে কিছু নেই। অনুভব 'আমার অনুভব' বা 'তোমার অনুভব' বা 'তার অনুভব' হয়েই দেখা দেয়। সুতরাং অনুভব যে কোন মন বা আত্মা লগ্ন হয়ে থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই অনুভব ও মন এক হতে পারে না।

হিউম মনের ঐক্য খুঁজতে গিয়ে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তার ফলে তিনি ধারণা করেছেন, মনের কোন স্বরূপগত ঐক্য নেই। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষেত্রে হিউমের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। কেউ যদি বনে যায় তবে ত' সে কতকগুলো গাছই দেখবে। কিন্তু তা বলে সেখানে শুধু গাছ আছে, কোন বন নেই—এমন কথা বলা যায় না। তেমনি মন খুঁজতে গিয়ে কতকগুলো মানসিক অবস্থা পাওয়া গেলেও এই অবস্থাগুলোর মধ্যে অন্তঃস্যূত হয়ে ঐক্যবিধায়ক একটা কিছু থাকে তা স্বীকার করতে হয়। সুতরাং হিউম মানসিক অবস্থাগুলোকেই মন বলে ভুল করেছেন।

আলোচনা করে বোঝা গেল যে, আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী হিউমের মতবাদ নানা দোষে দুষ্ট। আমরা আগেই বলেছি, হিউম আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ অত্যন্ত পরিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদীদের মতবাদও দোষদুষ্ট।

আত্মা সম্বন্ধে কাণ্টের মতবাদ

কাণ্ট আত্মা সম্বন্ধে 'দ্রব্য মতবাদ' ও 'প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ' উভয়ই খণ্ডন করেছেন। আমরা 'দ্রব্য মতবাদ' ও 'প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ' আলোচনা প্রসঙ্গে কাণ্টের খণ্ডন-যুক্তি আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য এখানে আর খণ্ডন-যুক্তির অবতারণা করব না।

স্বমত-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কান্ট বলেছেন, আত্মা কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, আবার তা বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিও নয়। তিনি মনে করেন, আত্মা বা মন জ্ঞানের প্রাগুপকরণ (pre-condition) বিশেষ। আত্মা বা মন না থাকলে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। এই আত্মা জানা যায় না। কিন্তু এই আত্মা না থাকলে কোন জ্ঞানই হয় না। এখানে প্রশ্ন ওঠে—এই আত্মার স্বরূপ কি ? কান্ট বলেন, আত্মা বা মন বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির (intuitions) চরম ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া বিশেষ (transcendental unity of apperception)। কথাটা ব্যাখ্যা করা দরকার। কান্ট মনে করেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অনুভব সংবেদনে (sensibility) পাওয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলো কোন জ্ঞান নয়। বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলো যখন বুদ্ধির ঐক্যবিধায়ক আকারে (categories of understanding) আকারিত হয়, তখনই জ্ঞান পাওয়া যায়। বুদ্ধির ঐক্যবিধায়ক আকারগুলো এক চরম ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই চরম ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার নাম আত্মচৈতন্য বা মন (self-consciousnesss)।

কান্টের মতে, বস্তু এমন জিনিস যার ধারণায় অনুভবরাজির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। টেবিল একটি বস্তু, কারণ টেবিলের ধারণায় রঙ, আকার প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভব একত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুভবের একত্রীকরণ আত্মা বা মনের চরম ঐক্য দ্বারাই সম্ভব। অর্থাৎ মন অনুভবগুলোর মধ্যে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করে বলেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। সুতরাং জ্ঞানের জন্য মনের ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি একান্ত আবশ্যক। এই ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার কোন আত্যন্তিক সত্তা (transcendental reality) নেই। জ্ঞানের ব্যাপারেই এই প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি দরকার। সুতরাং মনের বা আত্মার এক জ্ঞান-বিধায়ক সত্তাই আছে।

নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কান্ট অমর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আত্মাকে অমর না বললে নৈতিক নিয়মের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না। কান্টের মতে মানুষের দেব-স্বভাব (rationality) যখন পশুস্বভাবকে (sensibility) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই নৈতিক জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা যায়। মানুষের পশুস্বভাব সহজে দেবস্বভাবের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে না। এর জন্য জন্ম-জন্মের সাধনা দরকার। সুতরাং কান্ট নৈতিক আদর্শের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য

আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। এই আত্মা পারমার্থিক আত্মা। এই আত্মা শুদ্ধ প্রজ্ঞা (pure reason) দ্বারা জানা যায় না। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (practical reason) দ্বারাই এই আত্মাকে মানা যায়।

সমালোচনা ঃ কান্টের মতে জ্ঞাতা আত্মা বা মন জ্ঞানের বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। মন পরস্পর অনুভবরাজির পশ্চাৎস্থিত এক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া বিশেষ। কিন্তু অনুভবরাজির বিচ্ছিন্নতা থেকে বিযুক্ত এই ঐক্য প্রক্রিয়া একটি নৈয়ায়িক অমূর্ত ধারণা মাত্র (logical abstraction), বাস্তব ব্যাপার নয়। বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাই বাস্তব (real)। হেগেল আত্মাকে এই রকম এক ঐক্য বলেই মনে করেছেন। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে হেগেলের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য।

কান্ট অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে আত্মা বা মন জ্ঞানের প্রাগুপকরণ বিশেষ। পারমার্থিক আত্মা কখনই সাধারণ-ভাবে জানা যায় না। আমাদের মনে হয়, আত্মা বা মন তার বিভিন্ন অবভাসের মধ্যে জানা যায়। বিভিন্ন বস্তুজ্ঞানের ঐক্য আত্মৈক্যেরই প্রকাশ। সুতরাং বিভিন্ন বস্তু-জ্ঞানের মধ্যেই আত্মাকে জানা যায়।

আত্মা বা মন সম্বন্ধে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ ঃ

উইলিয়ম জেমস্ আত্মা বা মনকে চৈতন্যপ্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে মন কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিমাত্র নয়। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুভব-প্রবাহই মন। এই প্রবাহে কোন ছেদ, ভঙ্গ বা থামা নেই। নিদ্রা বা মূর্ছা চৈতন্যপ্রবাহের রুদ্ধতা সূচনা করে না। মূর্ছিত ব্যক্তি মূর্ছা থেকে উঠে সে মূর্ছিত ছিল তা মনেই করে না। তার কাছে কোন সময়ক্ষেপের ধারণাই হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে নিদ্রার পূর্বের ও পরের অবস্থা তারই বলে মনে করে। সুতরাং তার কাছে তার চৈতন্যের কোন বিচ্ছিন্নতা বা ভঙ্গই অনুভূত হয় না। এভাবে চৈতন্য-প্রবাহের অখণ্ডতা ও অবিচ্ছিন্নতাই লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের মনে হয়, মন শুধু মাত্র একটি অনুভব-প্রবাহ নয়। অনুভব-প্রবাহকে প্রবাহ বলে জানতে গেলে এক অপেক্ষাকৃত নিশ্চল মনের কল্পনা করতে হয়। সুতরাং মন বা আত্মা পরিবর্তিত অনুভবের পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যকেই বোঝায়। শুধু পরিবর্তিত অনুভবগুলোই মন হতে পারে না।

ব্যবহারবাদ (Behaviourism)

আধুনিককালে মনের জগতে পরীক্ষণ-প্রণালী (Experimentation) ব্যবহারের ভিত্তিতে ব্যবহারবাদের উদ্ভব হয়েছে। এতদিন লোকের ধারণা ছিল, মন অন্যান্য বস্তুর মত সাধারণ বিষয়াকারে জানা যায় না ; মনকে জানতে গেলে অন্তর্দর্শন (introspection) প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারবাদীরা বলেন, অন্তর্দর্শন ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্তর্দর্শনে বিশেষ ব্যক্তি-মনেরই জ্ঞান পাওয়া যায়, সকলের মনের কোন জ্ঞানই পাওয়া যায় না। অন্তর্দর্শনে সকলের মনের যদি কোন জ্ঞান না পাওয়া যায়, তবে মন নিয়ে কোন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং সকলের মনের জ্ঞান লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ-প্রণালী বা বিষয়গত পদ্ধতি (objective method) ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু, সাধারণ লোকে মন বলতে যা বোঝে তা কখনও জ্ঞানের বিষয় রূপে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই মনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গত পদ্ধতি বা পরীক্ষণ-প্রণালীই ব্যবহার করা যায় না। মনের ক্ষেত্রে বিষয়গত পদ্ধতি বা পরীক্ষণ-প্রণালীর ব্যবহারের জন্য ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনের ধারণাই বদলে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, আমাদের প্রত্যক্ষ উত্তেজনার (stimulus) ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া মাত্র। বাইরের কোন বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তখন স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যবহারবাদীদের মতে এই প্রতিক্রিয়াই প্রত্যক্ষ। এই প্রক্রিয়াকে দেহের ব্যবহারও বলা যেতে পারে। সুতরাং ব্যবহারবাদীদের মতে প্রত্যক্ষ দেহেরই একপ্রকার ব্যবহার। অনেক দার্শনিকই অনুভবের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন বা আত্মা বলে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ব্যবহারবাদীদের মতে, জীবদেহই (Bodily Organism) ব্যবহার বা তথাকথিত অনুভবের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং জীবদেহ ও তার ব্যবহার ছাড়া মন বা আত্মা বলে কিছু নেই।

ব্যবহারবাদী দার্শনিক গোষ্ঠীর নেতা ওয়াট্‌সন মনে করেন, মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় দেহের প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহার মাত্র ; বহির্বিশ্বের বিভিন্ন উত্তেজনার বিভিন্ন দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টির নামই মন। চৈতন্য বলে কিছু নেই। চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রক্রিয়া বলে যা পরিচিত, আসলে তা দেহেরই বিভিন্ন ব্যবহার মাত্র। পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) বিভিন্ন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যবহারবাদীদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা

করেছেন। ব্যবহারবাদীদের মতে মানসিক ক্রিয়াগুলো দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ামাত্র।[১]

সমালোচনা ঃ ব্যবহারবাদীরা মন বলতে দেহের ব্যবহারই বোঝেন। তাঁদের মতে দেহের ব্যবহার ছাড়া চৈতন্য বলে কিছু নেই। আমাদের মনে হয়, দেহের ব্যবহারকে ব্যবহার বলে জানতে গেলে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং চৈতন্যের অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

মন বা আত্মা জ্ঞাতা, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় নয়। যে জানে তাকেই বলে মন। ব্যবহারবাদীরা বলেন, দেহের ব্যবহারই মন। দেহের ব্যবহার জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় দেহের ব্যবহার কি করে জ্ঞাতা মন বা আত্মা হতে পারে, তা আমরা বুঝি না।

অন্তর্দর্শনেই আত্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মন আমি অন্তর্দর্শনেই জানি। আমার মানসিক কি কি অবস্থার সঙ্গে আমার কোন্ কোন্ ব্যবহার সংযুক্ত, তা আমি দেখি। তারপর যখন অন্যের ব্যবহার দেখি, তখন সে ব্যবহার থেকে তাদের মনের অবস্থা কল্পনা করে নিই। এমনি করেই সকল মনের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। পরের ব্যবহার দেখে তাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করে নিই বলে তাদের ব্যবহারই তাদের মন নয়। ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করি মাত্র।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে আত্মা ঃ

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মন বা আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে বিষয়গত বলে মনে করেন। সাধারণতঃ আমরা মন বলতে বিষয়ী বুঝি। কিন্তু নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে জ্ঞানের বিষয়ের এক বিশেষ গ্রন্থনই মন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অন্যতম হোল্ট বলেন, মন বা চৈতন্য স্নায়বিক চক্রের সংক্ষোভ-নির্দিষ্ট বিশ্বের একটি অংশ বিশেষ (Cross-section of the Universe selected by the specific response of the nervous system)। বস্তুর সঙ্গে স্নায়বিক চক্রের সন্নিকর্ষ হলেই সেই বস্তু অন্য সব বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই বস্তুই জ্ঞানের বিষয়, আর এই বস্তুই মন বা চৈতন্য। সুতরাং

১। অত্যন্ত আধুনিককালে অধ্যাপক রাইল 'The concept of Mind' নামক গ্রন্থে ভাষা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে মন বা আত্মা সম্বন্ধে বস্তুতঃ ব্যবহারবাদী সিদ্ধান্তই স্থাপন করেছেন। তাঁর মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা D. M. Dutta বিরচিত 'The chief currents of contemporary philosophy' পুস্তকের ৪৮৫—৪৯০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বিষয়ী মন বা আত্মা বলে কিছু নেই ; জ্ঞানের বিষয়ই মন বা চৈতন্য।

আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ী—এই দুই ভাগ স্বীকার করি। যখন বলি 'আমি আগুন জানি', তখন 'আমি' বিষয়ী আর 'আগুন' বিষয়। আমি আর আগুন যে এক নই, একথা সাধারণতঃ সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিষয় ও বিষয়ীর তফাৎ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'আমি' ও 'আগুন' একই বস্তু। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। মন বা আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, আত্মা জ্ঞানের বিষয়ী বা জ্ঞাতা—একথা স্বীকার করতেই হবে।

আমরা আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিকেরই মতবাদ আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন মতবাদই আমাদের যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকল না। এখন প্রশ্ন ওঠে—তবে আত্মার স্বরূপ কি হবে ? আমাদের মনে হয়, মনের স্বরূপ সম্বন্ধে হেগেল যা বলেছেন, তাই যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়। আত্মা সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদ পুরুষবাদ (The Personalistic Theory) নামে পরিচিত। আমরা এখন পুরুষবাদের তাৎপর্য আলোচনা করব।

পুরুষবাদ (Personalistic Theory) ঃ

জার্মান দার্শনিক হেগেল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পুরুষবাদের সমর্থক। পুরুষবাদের মতে, আত্মা বা মন কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, আবার বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির সমষ্টিমাত্রও নয়। মনকে বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির ঐক্যবিধায়ক শুদ্ধ প্রক্রিয়াও বলা যায় না। এক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া-সম্বদ্ধ অনুভবের নামই মন বা আত্মা। এই ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন অনুভব-গুলোকে একত্র করে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত পুরুষ বা আত্মা গড়ে তোলে। আত্মা বা পুরুষের ঐক্য বিভিন্ন অনুভবের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই লাভ করা যায়। অনুভবের বৈচিত্র্য-বিযুক্ত ঐক্য কোন বস্তুর তত্ত্ব নয়, এটা মনের ধারণামাত্র। অনুভবের বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে ঐক্য পাওয়া যায়, তাই জীবন্ত ঐক্য। বিভিন্ন অনুভবের মধ্য দিয়েই পুরুষ তার এই জীবন্ত ঐক্য খুঁজে পায়। আত্মার ঐক্য বিচ্ছিন্ন অনুভবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-সঞ্জাত ঐক্য।

সুতরাং পুরুষবাদের মতে, আত্মা এক সক্রিয় গতিশীল ভেদ-পুষ্ট ঐক্য তত্ত্ব বিশেষ। অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পায়, এই ঐক্য ততই সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ণ পুরুষ সমস্ত বর্তমান ও সম্ভাব্য অনুভবের ঐক্য সূচনা করে। এই ঐক্যের স্পর্শ থেকে কোন অনুভবই বঞ্চিত হয় না। আমরা সাধারণ সসীম মানুষ এই ঐক্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। নিজেদের জীবনে এই আদর্শ ঐক্যকে ধীরে ধীরে লাভ করার চেষ্টাই আমাদের সাধনা। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই পরমপুরুষ। কারণ, বাস্তব ও সম্ভাব্য সমস্ত রকমের অনুভবের ঐক্য একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলো অনুভবের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিমানুষের এই ঐক্য পরমপুরুষের চরম ঐক্যের প্রকাশ মাত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেহ ও মনের সম্পর্ক

(Relation between Body and Mind)

দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি। দেহ যদি সুস্থ হয় তবে মনও প্রফুল্ল থাকে ; আর মন যদি বিষণ্ণ থাকে তবে দেহেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্পর্ক ত্রিবিধ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ : আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক আমরা প্রতিনিয়ত বুঝতে পারি। শরীর যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়, তখন কোন মানসিক কাজই করতে ইচ্ছা হয় না। মাথায় আঘাত লাগলে অনেক সময় চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে কতকগুলো মানসিক অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাই। মনে খুব আনন্দ হলে মুখভঙ্গিমায় নিশ্চয়ই তা প্রকাশিত হবে। মানুষ ক্রুদ্ধ হলেও তার কতকগুলো দৈহিক পরিবর্তনে ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ পর্যবেক্ষণেই দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

পরীক্ষামূলক প্রমাণ (Experimental Evidences) : পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানুষ যদি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে তবে তার মাথায় স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক বেশী রক্তের সঞ্চার হয়। কখনও কখনও বেশী চিন্তা করায় মাথা ধরে। আবার কোন কোন ওষুধ খেলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ফলে কখনও কখনও চৈতন্য পর্যন্ত লুপ্ত হয়। সুতরাং দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক স্বীকার না করে উপায় নেই।

দেহতত্ত্বের প্রমাণ : দেহতত্ত্ব (Anatomy) আলোচনা করলে বোঝা যায়, মস্তিষ্কের জটিলতার সঙ্গে চিন্তার জটিলতার সম্পর্ক আছে। যে-সমস্ত প্রাণীর চিন্তা করার ক্ষমতা বেশী তাদের মস্তিষ্কের জটিলতা, যে-সমস্ত প্রাণীর চিন্তা করার ক্ষমতা কম, তাদের চেয়ে অনেক বেশী। প্রতিভাবান লোকের মাথার ওজন নাকি সাধারণ মানুষের মাথার ওজনের চেয়ে বেশী হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই নিবিড় সম্পর্কের আসল রূপ কি তা বোঝা

মুশকিল। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এই সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্তে পেঁছিতে চেষ্টা করব।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (The Interaction Theory or Interactionism) ঃ

ডেকার্টে দেহ ও মনের সম্পর্ক-প্রসঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের সমর্থক। তিনি মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দ্রব্য। দেহ বিস্তৃতিসম্পন্ন, কিন্তু মনের কোন বিস্তৃতি নেই। দেহ নিশ্চেতন, কিন্তু মন চৈতন্যস্বরূপ। দেহ যান্ত্রিক নিয়মের অধীন, মন উদ্দেশ্য বা আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং দেহ ও মনের মধ্যে দ্বৈত ভাবই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ডেকার্টে মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। জ্ঞানের বেলায় দেহ ও মনের ওপর কাজ করে, আর কাজ করার সময় মন দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কোন কিছু জানতে গেলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মন যখন এই উত্তেজনার কারণ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা দেয়, তখনই জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভের সময় দেহ মনের ওপর কোন একটা উত্তেজনা চাপিয়ে দেয়, তার ফলেই জ্ঞান হয়। মনে যদি কাজ করার ইচ্ছা না থাকে তবে কাজ করা যায় না। কাজ করতে গেলে দেহ-সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মনের ইচ্ছা দেহ-সঞ্চালন সম্ভব করে তোলে। কাজেই কাজ করতে গেলে মন দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ডেকার্টের মতে দেহ ও মনের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পিনিয়েল গ্রন্থির (Pineal gland) মাধ্যমে ঘটে থাকে।

সমালোচনা ঃ ডেকার্টে দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেহ ও মনের মধ্যে কি করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা আমরা বুঝি না। যদি দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকার করতে হয়, তবে তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বলা যায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন দুই বস্তুর মধ্যেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

ডেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ স্বীকার করলে 'শক্তি-নিত্যতা-নীতি' (Law of Conservation of Energy) ভঙ্গ করতে হয়। মস্তিষ্ক যদি চিন্তা বা অনুভূতি সৃষ্টির জন্য খানিকটা শক্তি ব্যয় করে, তবে এই দৈহিক শক্তি সম্পূর্ণ

নষ্ট হয়ে যাবে। আবার মন যদি দেহ-সঞ্চালনের বাসনা ক'রে খানিকটা মানসিক শক্তি অপচয় করে, তবে এই শক্তির উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে খানিকটা মানসিক শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু 'শক্তি-নিত্যতা-নীতি' অনুসারে কোন শক্তিই নষ্ট হতে পারে না। সুতরাং ডেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ গ্রহণ করা যায় না।

প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদ (Occasionalism)

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের দোষ ত্রুটি দূর করার জন্য ডেকার্টের অনুবর্তী গয়লিন্‌কস্ (Geulinex) ও ম্যালব্রেঙ্কি (Malebranche) প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদের পত্তন করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় তাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। তা হলে প্রশ্ন ওঠে—দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন আর মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হয় কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদীরা বলেন, যখনই দেহ বা মনে পরিবর্তন দেখা দেয়, তখনই মন বা দেহে অনুরূপ পরিবর্তন-সাধনের জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর মানসিক পরিবর্তনের অনুরূপ দৈহিক পরিবর্তন বা দৈহিক পরিবর্তনের অনুরূপ মানসিক পরিবর্তন সাধন করেন। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই মতবাদের নাম প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদ।

সমালোচনা ঃ প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদ দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। প্রতিপদে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলে দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—একথা কোন যুক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদ মানতে হলে যুক্তি বিসর্জন দিয়ে ভক্তিমূলক বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতে হয়। দর্শনে ভক্তি-মূলক বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। সুতরাং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদের বিশেষ কোন দার্শনিক মূল্যই থাকতে পারে না।

প্রতিপদে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলে দেহ ও মনের সম্পর্ক স্থাপিত হলে ঈশ্বরের নির্বোধ যান্ত্রিক ব্যবহার স্বীকার করতে হয়। প্রয়োজন দেখা দিলেই

ঈশ্বর হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন—একথা বিশ্বাস করা যায় না; এরকম কাজ নির্বোধ যন্ত্রের কাছেই আশা করা যেতে পারে। সুতরাং এই দিক থেকেও প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সমান্তরালবাদ (Parallelism)

স্পিনোজা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সমান্তরালবাদ প্রবর্তন করেছেন। সমান্তরালবাদ অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। যেমন কোন দুই সমান্তরাল সরলরেখা পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কখনও পরস্পর মেশে না, তেমনি দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া পাশাপাশি থাকলেও কোন একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করে না। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। এই ঈশ্বরের অসংখ্য গুণ আছে। এই অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা মাত্র দুটো গুণই জানি। দেহ বা বিস্তৃতি ও মন বা চৈতন্য এই দুই গুণ। দেহ ও মন ঈশ্বরস্থিত দুই সমান্তরাল গুণ। দেহে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন মনেও সেই পরিবর্তন দেখা যায়। আবার মনে যখন কোন পরিবর্তন হয়, তখন দেহেও তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। ঈশ্বরের মধ্যে চিরকাল দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। ঈশ্বরই প্রকৃতি বা জগৎ। সেজন্যই জগতে দেহ ও মন পাশাপাশি দেখা যায়। সমান্তরালবাদ অনুসারে দেহ ও মন একই ঈশ্বরের দু'টি দিক। সেজন্য সমান্তরালবাদকে কেউ কেউ দ্বিভঙ্গীবাদও (double-aspect theory) বলেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারও সমান্তরালবাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে একই অজ্ঞেয় তত্ত্ব (The Unknownable) দেহ ও মনের আকারে প্রকাশিত হয়। এই অজ্ঞেয় তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। চরম তত্ত্ব কোন দৈহিক বা মানসিক তত্ত্ব নয়। চরম তত্ত্ব একান্তভাবেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। দেহ ও মন এই অজ্ঞেয় তত্ত্বেরই দুই প্রকাশ। মস্তিষ্ক ও মন এক নয়। মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে, আর মন চলে তার নিজের নিয়ম মেনে।

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানে স্টাউট্ একরকমের সমান্তরালবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি আছে মাত্র (mere concomitance)। অর্থাৎ কোন দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া মানসিক

প্রক্রিয়া থাকতে পারে না, আবার কোন মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়াও দৈহিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে না। স্টাউটের মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়ই সমানভাবে সত্য। মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব সময়েই কতকগুলো মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া থাকে, আবার মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেও সব সময়েই কতকগুলো মানসিক প্রক্রিয়া থাকে।

সমালোচনা ঃ সমান্তরালবাদে যেখানে যেখানে দৈহিক প্রক্রিয়া আছে, সেখানে সেখানেই মানসিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। স্পিনোজা যেখানে যেখানে বিস্তৃতি আছে, সেখানে সেখানেই চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় একথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। পাথরে বিস্তৃতি আছে, কিন্তু চৈতন্য নেই। চৈতন্যের উপস্থিতি সাধারণতঃ জীবের মধ্যেই অনুভব করা যায়। সমান্তরালবাদের সর্বমানসবাদে বা সর্বত্রই চৈতন্য আছে—এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না।

সমান্তরালবাদ দেহ থেকে মনের উৎকর্ষ বা প্রাধান্য স্বীকার করে না। সমান্তরালবাদ অনুসারে দেহ ও মন একই স্তরের অন্তর্গত, এরা পরস্পর সমান্তরাল। কিন্তু আসলে দেহ থেকে মন সব দিক থেকেই উচ্চস্তরের। মন দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। মনের স্বাধীনতা আছে। কার্যের বাসনা মনেই জাগে। দেহের কোন স্বাধীনতা নেই। মনের বাসনাই দেহের মাধ্যমে সফল হয়। সুতরাং দেহ ও মন একই স্তরের হতে পারে না।

হার্বার্ট স্পেন্সার দেহ ও মনকে একই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দুই প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। যা অজ্ঞেয় তার কোন প্রকাশই জানা যায় না, আর যার কোন প্রকাশ জানা যায় তা অজ্ঞেয় হতে পারে না। কারণ যার কোন না কোন প্রকাশ জানি, তার খানিকটা পরিচয় ত' জানাই হয়ে যায়। সুতরাং স্পেন্সারের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ মানসিক প্রক্রিয়া অনুভব করি না। ভারতবর্ষের অনেক সন্ন্যাসীই নানা রকমের দৈহিক পীড়ন স্বেচ্ছায় সহ্য করেন। তাঁরা অতি সহজেই ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের দৈহিক শীর্ণতা মানসিক ক্ষীণতা সূচনা করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসীরা প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হন। আমরা ভারতবর্ষে দৈহিক রিক্ততা মানসিক রিক্ততার সূচক বলে মনে করি না। বরং এখানে দৈহিক শীর্ণতা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক পূর্ণতাই সূচনা করে। সমান্তরালবাদ

আমাদের এই অভিজ্ঞতার কোন সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং সমান্তরালবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ (The Theory of Pre-established Harmony) ঃ

লাইব্‌নিজ দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির সময়েই ঈশ্বর দেহ ও মনের মধ্যে এক শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এই শৃঙ্খলার জন্যই দেহ ও মনের মধ্যে নিত্য সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদীদের মত লাইব্‌নিজ প্রতি মুহূর্তে দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন না। লাইব্‌নিজের মতে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় একবার হস্তক্ষেপ করেই দেহ ও মনের নিত্য সঙ্গতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লাইব্‌নিজ দেহ ও মনকে দুটি ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ঘড়ি দুটি এমনভাবেই তৈরী করা হয়েছে যে, এরা সব সময়েই এক রকম সময়ই দিয়ে থাকে।

লাইব্‌নিজের মতে দেহ ও মন উভয়ই চিৎপরমাণুর (monads) সৃষ্টি। চিৎপরমাণুদের মধ্যে কতকগুলো অচেতন (Unconscious), কতকগুলো চেতন (Conscious) আর কতকগুলো আত্মসচেতন (Self-conscious)। চৈতন্যের মাত্রাভেদ অনুসারে চিৎপরমাণুবাদের এরকম ভাগ করা হয়। যে সব চিৎপরমাণুতে চৈতন্য এমন অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত যে তাতে চৈতন্য আছে কি-না বোঝা যায় না, তাদের নাম অচেতন চিৎপরমাণু। যে সব চিৎপরমাণুতে চৈতন্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, তাদের নাম চেতন চিৎপরমাণু; আর যাদের মধ্যে চৈতন্য সব চেয়ে বেশী প্রকট, তাদের নাম আত্মসচেতন চিৎপরমাণু। লাইব্‌নিজের ভাষায় এই চিৎপরমাণুগুলো গবাক্ষহীন (Windowless), সুতরাং এরা পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত। এদের প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। দেহ কতকগুলো অচেতন চিৎপরমাণুর সৃষ্টি। মন আত্মসচেতন চিৎপরমাণু। দেহ ও মন নিজেরাই পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বর সৃষ্টির সময়েই এদের প্রক্রিয়ার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে দিয়েছেন। এই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার জন্যই দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচনা ঃ পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদের মতই দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করে। তবে পূর্বস্থাপিত

শৃঙ্খলাবাদ প্রয়োজনে হস্তক্ষেপবাদের মত প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করে না। পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ অনুসারে ঈশ্বর দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য একবার মাত্রই হস্তক্ষেপ করেছেন। যাহোক, দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আমাদের যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। কেন ঈশ্বর আদৌ হস্তক্ষেপ করবেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ হবে একটি অবোধ্য রহস্য। দর্শনের ক্ষেত্রে রহস্য স্বীকার না করাই ভাল।

লাইব্‌নিজ ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু (monad of monads) বলে অভিহিত করেছেন। লাইব্‌নিজের মতে, কোন চিৎপরমাণুই অন্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে ঈশ্বর দেহ ও মনের চিৎপরমাণুগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন কি করে? দেহ ও মনের চিৎপরমাণুগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হলে ঈশ্বরকে এই চিৎপরমাণুগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়। কিন্তু চিৎপরমাণু হিসেবে ঈশ্বর তা পারেন না। সুতরাং পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা কি করে স্থাপিত হল তার কোন সদ্ব্যাখ্যা লাইব্‌নিজ দিতে পারেননি।

লাইব্‌নিজ চিৎপরমাণুদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। তিনি আবার এও বলেন যে, প্রত্যেক চিৎপরমাণুই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে চলে। কিন্তু যে চিৎপরমাণু পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে চলে, তার কি করে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে, তা আমরা বুঝি না। যার স্বাতন্ত্র্য আছে, সে কোন বাইরের নিয়মই মেনে চলতে বাধ্য নয়, আর যে কোন বাইরের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য তার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না।

উপবস্তুবাদ (Epiphenomenalism)

জড়বাদীরা জড়কেই চরমতত্ত্ব বলে মনে করেন। তাঁদের মতে জড়ের মত মনের কোন বস্তুসত্তা নেই। মন উপবস্তু (Epiphenomenon) বিশেষ। মন বা চৈতন্যকে মস্তিষ্কজাত এক জ্যোতিঃ বলে মনে করা যেতে পারে। দৈহিক ক্রিয়ার ফলে মানসিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার ফলে দেহের কোন পরিবর্তনই হতে পারে না। সুতরাং দেহ মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু মন কখনই দেহের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

সমালোচনা ঃ উপবস্তুবাদ অনুসারে মন বা চৈতন্য উপবস্তু মাত্র। জড়ই চরমতত্ত্ব। আমাদের মনে হয়, জড় থেকে মন উচ্চস্তরের। মন বা চৈতন্য না থাকলে জড়কে জড় বলেই জানা যায় না। সুতরাং জড়ের প্রকাশ চৈতন্যের ওপর নির্ভর করে। কাজেই মন বা চৈতন্যকে জড় থেকে উচ্চস্তরের বলতে হয়। মন বা চৈতন্য যদি জড় থেকে উচ্চস্তরের হয়, তবে জড়কে চরমতত্ত্ব আর মনকে উপবস্তু বলা যায় না।

উপবস্তুবাদ মনের ওপর দেহের প্রভাব স্বীকার করে, কিন্তু দেহের ওপর মনের কোন প্রভাব স্বীকার করে না। আমাদের মনে হয়, দেহের ওপর মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে এমন অনেক মহাত্মাই আছেন যাঁরা মনের জোরে দেহেও জোর পান। তাঁদের দেহ উপবাসক্লিষ্ট ও শীর্ণ। কিন্তু দেহের শীর্ণতা তাঁদের কোন অসুবিধেই সৃষ্টি করে না। সাধারণ গৃহীর চেয়ে তাঁদের কর্মক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং দেহের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

উন্মেষবাদ (The Theory of Emergence)

আমরা অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে উন্মেষবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা উন্মেষবাদীদের মতে দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। উন্মেষবাদীরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদীদের মত দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করেন না। সমান্তরালবাদীদের মত উন্মেষবাদীরা দেহ ও মনকে একই স্তরের বলেও মনে করেন না। জড়বাদীদের মত উন্মেষবাদীরা মনকে উপবস্তুও বলেন না। উন্মেষবাদীদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে প্রাণ আর প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলিয়ে দিলে যে জল হয় তার তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারুরই নেই। তেমনি দেহ থেকেই প্রাণ আর প্রাণ থেকেই মন হয়। কিন্তু প্রাণের স্তরে 'জীবন' আর মনের স্তরে 'চৈতন্য' বলে এমন দুটি গুণ উন্মেষিত হয় যা যথাক্রমে দেহ ও প্রাণে থাকে না। সুতরাং উন্মেষবাদীদের মতে মন বা চৈতন্য দেহ থেকে উচ্চস্তরের। চৈতন্য একটি উন্মেষিত গুণ। দেহ থেকেই প্রাণ আর প্রাণ থেকেই চৈতন্যের উন্মেষ হয়েছে বলে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

সমালোচনা ঃ উন্মেষবাদীরা দেহ থেকে মন যে উচ্চস্তরের এই সত্য কথাটি স্বীকার করেছেন। এই দিক থেকে সমান্তরালবাদ ও উপবস্তুবাদের তুলনায় উন্মেষবাদ যে অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু দেহ থেকে অভিব্যক্তির ধারায় মন বা চৈতন্যের উন্মেষ হল কেন এর কোন সদুত্তর উন্মেষবাদীরা দিতে পারেননি। এই 'কেন'র ঠিক ঠিক জবাব না পেলে আমাদের যুক্তিবাদী মন তৃপ্ত হয় না। সুতরাং উন্মেষবাদ অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

বিজ্ঞানবাদ (Subjective Idealism)

বার্কলি বিজ্ঞানবাদের সমর্থক। তাঁর মতে মন ও তার ধারণাগুলোই একমাত্র সত্য। বাইরের বস্তু বলে যা পরিচিত আসলে তা মনের ধারণামাত্র। দেহ বলে যাকে জানি তাও মনের ধারণা। সুতরাং দেহ সম্পূর্ণভাবেই মনের ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদের নামই বিজ্ঞানবাদ।

সমালোচনা ঃ বিজ্ঞানবাদীরা দেহ ও মনের সম্পর্ক-সমস্যার জটিলতা এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা দেহকে মনের ধারণায় পরিণত করে ফেলেছেন। দেহ যদি মনের ধারণামাত্র হয় তবে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কোন জটিলতাই থাকে না। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। দেহ ও মন, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই সমান সত্য। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি সমান সত্য না হয়, তবে কোন জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান হতে গেলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় থাকা দরকার। সুতরাং দেহ বা জ্ঞেয়কে জ্ঞাতার ধারণামাত্র বললে চলে না। দেহ বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা-অতিরিক্ত সত্তা আছে। সুতরাং বিজ্ঞানবাদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

পরব্রহ্মবাদ (Absolute Idealism)

দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা গেল। কিন্তু এদের একটিও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। আমরা এখন দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরব্রহ্মবাদ আলোচনা করব।

হেগেল পরব্রহ্মবাদের প্রধান পুরোহিত। তাঁর মতে পরব্রহ্মই চরমতত্ত্ব। জড় ও চৈতন্য এই তত্ত্বেরই দুই প্রকাশ। পরব্রহ্ম জড় ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি করেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। জড় বা

দেহ জ্ঞানের বিষয় আর চৈতন্য বা মন বিষয়ী বা জ্ঞাতা। কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়েছে। যেহেতু জড় ও চৈতন্য একই তত্ত্বের প্রকাশ, সেজন্য জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব।

আমাদের মতে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরব্রহ্মবাদই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। যেহেতু দেহ ও মন উভয়ই একই পরব্রহ্মের প্রকাশ, সুতরাং তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। পরব্রহ্মের দিক থেকে দেহ ও মন সমান্তরাল হলেও সসীম জীবের দিক থেকে এরা একই তত্ত্বের দুই দিক। এদিক থেকে তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতে কোন বাধা নেই। এই অধ্যায়ের প্রথমেই দেহ ও মনের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, তা আমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু পরব্রহ্মবাদ এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অত্যন্ত সুযুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে, সুতরাং দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরব্রহ্মবাদই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করতে হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

অমরতা (Immortality)

আত্মা কি অমর ? না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিনষ্টি আত্মারও বিনষ্টি সূচনা করে ? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দিক থেকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জড়বাদীরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে মৃত্যুতে যেমন দেহ ধ্বংস হয়, তেমনি আত্মাও ধ্বংস হয়। আবার অন্য কোন কোন দার্শনিক দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে আত্মা অজর ও অমর ; দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মার কোন ধ্বংস নেই। তৃতীয় আর একদল দার্শনিক অজ্ঞেয়তাবাদ (agnosticism) সমর্থন করেন। তাঁদের মতে আত্মা ধ্বংসশীল কি অমর তা জানা যায় না।

আমরা জড়বাদীদের দেহাত্মৈক্যবাদে বিশ্বাস করি না। জড়বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদ আলোচনা করেছি। আমাদের মতে আত্মার দেহাতিরিক্ত সত্তা আছে। অর্থাৎ আত্মা ও দেহ এক নয়। সুতরাং দেহের বিনষ্টি আত্মার বিনষ্টি সূচনা করতে পারে না। আমরা এই অধ্যায়ে যাঁরা আত্মাকে অমর বলেন, তাঁদের মতবাদই আলোচনা করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই অজ্ঞেয়তাবাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি মিলবে। কোন কোন বিশেষ প্রণালীতে আত্মার অমরতা অনুমান করা যায় তা আমরা আলোচনা করবো এবং সর্বশেষে আত্মার অমরতা স্বীকারের কোন সুযুক্তি আছে কিনা তা বিচার করে দেখবো।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রমাণ

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রমাণ উত্থাপন করা যেতে পারে। আমরা এখন এই সব প্রমাণগুলোর সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

(১) শক্তির নিত্যতার উপমায় আত্মার নিত্যতায় বিশ্বাস

পদার্থবিদ্যায় 'শক্তি-নিত্যতা-নীতি' (The Law of Conservation of Energy) নামে একটি নিয়ম আছে। এই নীতি অনুসারে শক্তি কখনও ধ্বংস হয় না, শক্তির একমাত্র রূপান্তরই সম্ভব। যান্ত্রিক শক্তি রাসায়নিক

শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরে শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। দুনিয়ায় কোন শক্তিই সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, শক্তি যদি নিত্য হয় তবে তার সঙ্গে তুলনা করে আত্মাকেও নিত্য বলা যেতে পারে। শক্তি যেমন কখনও লুপ্ত হয় না, আত্মাও তেমনি কখনও লুপ্ত হতে পারে না। সুতরাং আত্মাকে অমরই বলতে হয়।

সমালোচনা ঃ উপমা কখনও কোন জিনিস নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং তর্কের খাতিরে শক্তির নিত্যতা স্বীকার করে নিলেও তার সঙ্গে উপমায় কখনই আত্মার নিত্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

(২) ধী-শক্তির বৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত প্রমাণ

মানুষের ধী-শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। স্মৃতিতে বস্তুর অনুপস্থিতিতেই তার জ্ঞান হয়। কল্পনায় মানুষের ধী-শক্তি দেশকালের সীমা অতিক্রম করতে পারে। মানুষের ধী-শক্তির এ ক্ষমতা আছে বলেই কোন কোন কবির কল্পনা সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষকে তৃপ্ত করে। কোন বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালেই তাঁদের কল্পনার আবেদন সীমাবদ্ধ থাকে না। ধী-শক্তি আত্মারই শক্তি। ধী-শক্তি যদি দেশ-কালের বন্ধন মুক্ত হতে পারে, তবে আত্মার পক্ষেও দেশ-কাল-বন্ধন-মুক্ত হওয়া সম্ভব। যা দেশ-কাল-বন্ধন-মুক্ত আমরা তাকে নিত্য বলি। সুতরাং এই দিক থেকে আত্মাকে নিত্য বলা যায়। যা নিত্য তা জন্ম-মরণহীন। কাজেই আত্মাকে অমর বলা যায়।

সমালোচনা ঃ ধী-শক্তি মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সাধারণতঃ আমরা ধী-শক্তি মস্তিষ্কের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক কাজ না করলে 'সোনার তরী'তে যে ধী-শক্তির প্রকাশ আছে, তা সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে যখন তার মস্তিষ্ক ধ্বংস হয়, তখন তার ধী-শক্তি থাকে এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। যা ধ্বংস হয় না তা ধী-শক্তি নয়, ধী-শক্তির কার্য বা ফল। অর্থাৎ, ব্যক্তি মরণশীল, কিন্তু তার কীর্তি অমর হতে পারে।

(৩) অমরতা সম্বন্ধে তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণ (Metaphysical Arguments for Immortality)

তত্ত্ব-বিজ্ঞান আলোচনা করলে আত্মার অমরতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণই পাওয়া যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের মতবাদই আলোচনা করব।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্লেটো আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বিশেষ। কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্যই যৌগিক (Complex) হতে পারে না। সুতরাং আত্মা এক অযৌগিক (Simple) দ্রব্য। যা যৌগিক তাই বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। কিন্তু যা যৌগিক নয়, তার পক্ষে বিশ্লিষ্ট হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং অযৌগিক আত্মা কখনই বিশ্লিষ্ট হতে পারে না। যা বিশ্লিষ্ট হতে পারে না, তার কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং আত্মা অমর।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে প্লেটোর প্রমাণ তাঁর আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশেষ ধারণা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁর প্রমাণেরও কোন মূল্য থাকে না। আমরা আত্মার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা যায় না। সুতরাং আত্মার অমরতা সম্বন্ধেও প্লেটোর যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আধুনিক দর্শনে ডেকার্টেও আত্মাকে এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। এই চৈতন্য অযৌগিক। সুতরাং তার কখনও ধ্বংস হতে পারে না। প্লেটোর মতবাদ যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, এই মতবাদও সেই কারণে পরিত্যাজ্য।

কান্ট নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। অমরতা সম্বন্ধে কান্টের প্রমাণ দর্শনের ইতিহাসে নৈতিক প্রমাণ নামে পরিচিত। এই নৈতিক প্রমাণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা একটু বিশদ-ভাবেই এই প্রমাণ আলোচনা করব।

(৪) অমরতা সম্বন্ধে নৈতিক প্রমাণ

কান্ট বলেন, আত্মার অমরতা সাধারণভাবে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু নৈতিক জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করে নিতে হয়। কান্টের মতে মানুষের পশুসত্তা (Sensibility) যখন

সম্পূর্ণরূপে দেবসত্তার (Rationality) নিয়ম মেনে চলে, তখনই নৈতিক জীবনের আদর্শ পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। দেবসত্তার সঙ্গে মানুষের পশুসত্তার এই সঙ্গতি লাভ মানুষের নৈতিক জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ এক জীবনে বাস্তবে পরিণত করা যায় না। এই আদর্শের রূপায়ণের জন্য জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা দরকার। সুতরাং নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা প্রতিপাদনের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। আত্মা যদি অমর না হত তবে নৈতিক জীবন নিরর্থক হয়ে পড়ত। কারণ আত্মার অমরতা স্বীকার করলেই নৈতিক আদর্শ যে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব তা মানা যায়, আর তা না মানলে নৈতিক আদর্শের কোন অর্থ থাকে না। যে নৈতিক আদর্শ কখনই বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না তার মূল্য কি? সুতরাং নৈতিক আদর্শের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। নীতির দিক থেকে অন্যভাবেও আত্মার অমরতা স্বীকার করা যায়। ন্যায় বিচার (Justice) আত্মার অমরতা সূচনা করে। আমরা আশা করি, যাঁরা সৎ তাঁরা সততার জন্য পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু এই জগতে প্রায়ই সততার পুরস্কার পাওয়া যায় না। সততা পুরস্কৃত হবে—এ ত ন্যায় বিচারের দাবী। যদি এই জীবনে সৎব্যক্তি পুরস্কার না পান, তবে পরের জীবনে তিনি পুরস্কৃত হবেন এরকম আশা করাই স্বাভাবিক। সুতরাং ন্যায় বিচারের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। পুণ্যবান যদি পুরস্কার না পান আর পাপী যদি শাস্তি না পায়, তবে নীতির (Morality) কোন তাৎপর্যই থাকে না। নীতির তাৎপর্য রক্ষার জন্যই আত্মার অমরতা মানতে হয়। যে সৎব্যক্তি এজন্মে দুঃখ পেলেন, তিনি পরজন্মে সুখ পাবেন এরকম বলতে পারলেই নীতির তাৎপর্য রক্ষা পায়। আর এরকম বলতে হলে আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়।

আমাদের মনে হয়, অমরতা সম্বন্ধে এ সমস্ত নৈতিক বিবেচনা সহজে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এই সমস্ত বিবেচনা প্রত্যাখ্যান করতে গেলে নীতি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। নীতি মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব সূচনা করে। মানুষের নীতির যদি কোন তাৎপর্য না থাকে, তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব লুপ্ত হয়। নীতিবোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মানুষের মহত্ত্ব স্বীকার করতে গেলে আত্মার অমরতা না মেনে উপায় নেই। অনেকে অবশ্য নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কান্ট যা বলেছেন তা না মানতে পারেন,

তাঁরা অন্যভাবে নৈতিক আদর্শের প্রকৃতি বুঝতে পারেন। তখন কাণ্ট নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে অমরতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা তাঁদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য হবে না। কিন্তু, ন্যায় বিচারের প্রসঙ্গ বিবেচনা করে কাণ্ট আত্মার অমরতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

(৫) আত্মার অমরতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলো প্রমাণ ঃ

(ক) আধুনিক কালে আধ্যাত্মিক গবেষণার (Psychical research) ফলে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা আত্মার অমরতা সূচনা করে। অধ্যাপক উইলিয়ম ক্রুকস্-এর মত বিখ্যাত রসায়নাচার্যও স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে মাধ্যম (medium) রূপে ব্যবহার করলে পরলোকগত আত্মা এই জগতের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বিভিন্ন দেশে আজ আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান সমিতি (Psychical Research Society) গড়ে উঠেছে। এদের গবেষণা আত্মার অমরতা সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ করবে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

(খ) জাতিস্মর সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায় তাদের সবগুলোই যে মিথ্যা এমন কথা সহজে বলা যায় না। যে সব লোক, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে বলে দাবী করে, তাদের মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দরকার। আশা করা যায় এ সমস্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ জাতিস্মর সম্বন্ধে কাহিনীর সত্যতাই প্রতিপন্ন করবে। জাতিস্মর সম্বন্ধে কাহিনীগুলো সত্য হলে আত্মার অমরতা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমানে 'প্যারাসাইকোলোজি' নামে একটি শাস্ত্রে এই বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

(গ) কোন কোন লোক খুব ছেলেবেলায়ই কোন কোন বিষয়ে অলৌকিক প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কোন কোন ছেলে বা মেয়ে তেমন শিক্ষা না পেয়েই সঙ্গীতে বা গণিতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম অনেক কাহিনী বেরোয়। পূর্বজন্মের শিক্ষা স্বীকার না করলে এসমস্ত ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের বিশেষ নৈপুণ্যের কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। আর পূর্বজন্ম স্বীকার করলে আত্মার অমরতাই মানতে হয়।

(ঘ) মানুষ ও জীব মাত্রেরই কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। সদ্যোজাত গণ্ডারশিশু

মার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। গণ্ডারীর জিহ্বা এত কঠিন যে, সে তার শিশুর গাত্র লেহন করলে শাবক তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানবশিশু ও গণ্ডারশিশু এরকম কাজ করতে শেখে কি করে? এজন্মে ত তাদের কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা স্বীকার না করলে শিশুদের এরকম ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভারতীয় দর্শনে মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও জীবের সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থেকে আত্মার নিত্যত্ব প্রদর্শন করেছেন। জীবমাত্রই ক্ষুধা লাগলে খাবার খোঁজে। এর কারণ বের করতে গিয়ে বলা হয়েছে—পূর্বজন্মে খাবার খেয়ে ক্ষুধা মিটেছে বলেই এজন্মে ক্ষুধা লাগলে খাবারের খোঁজ করা হয়। পূর্বজন্মের জ্ঞানের সংস্কার আত্মায় থেকে যায়। এই সংস্কারের জন্যই এজন্মে এমন ব্যবহার সম্ভব।

নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাবও আত্মার নিত্যত্ব সূচনা করে। নবজাত শিশু দুঃখের কারণ ঘটলে কাঁদে, মায়ের কোল থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ভয় পায়, আনন্দের কারণ থাকলে খিল্ খিল্ করে হেসে হর্ষ প্রকাশ করে। এরকম শোক, ভয় ও হর্ষ পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ ছাড়া সম্ভব নয়। মায়ের কোল থেকে পড়লে যে ব্যথা পাওয়া যাবে, তা পূর্বানুভব ছাড়া জানা যায় না। সেই পূর্বানুভবের সংস্কার আছে বলেই শিশু ভয় পায়। এই পূর্বানুভব নবজাত শিশুর বেলায় এজন্মে হ'তে পারে না, কারণ এজন্মে শিশুর কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। সুতরাং এই অনুভব পূর্বের কোন জন্মেই হয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে এসব প্রমাণ সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং আত্মার অমরতা স্বীকার না করে উপায় নেই। একথা বলতেই হবে যে আত্মা দেহের মত নশ্বর নয়, আত্মা অজর ও অমর। মৃত্যুতে দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না। অনেকে প্রশ্ন করেন, আত্মার অমরতা বলতে কি ব্যক্তি-আত্মার অমরতা বোঝায়, না সর্বগত আত্মার অমরতা বোঝায়? যদি সর্বগত আত্মার অমরতা বোঝায় তবে সে-ই অমরতায় ব্যক্তির লাভ কি? আমরা নৈতিক প্রমাণ, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য, জাতিস্মরের কাহিনী প্রভৃতি যে সমস্ত বিবেচনার ভিত্তিতে আত্মার অমরতার কথা বলেছি তাতে ব্যক্তি-আত্মার অমরতার কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এই প্রশ্ন অবান্তর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃতি বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা

(Freedom of Will)

জীবনের পথে চলতে গিয়ে আমরা কত কাজই ত করি। কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করি, না বাধ্য হয়ে করি—তা এক জটিল প্রশ্ন। খুব সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে মানুষের কাজে বা ইচ্ছায় কোন স্বাধীনতাই নেই, নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের অধীনে মানুষকে সব সময় কাজ করতে হয়। এই মতবাদের নাম নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism of Necessarianism)। অন্য কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, আমাদের ইচ্ছা অপর কোন বস্তুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, আমাদের কাজে আমাদের স্বাধীনতা আছে। এই মতবাদের নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (The Doctrine of Free Will)। দর্শনের ইতিহাসে নিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বন্দ্ব[1] বহুকাল ধরে চলে এসেছে। আমরা এই অধ্যায়ে এই দুই মতবাদের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে চেষ্টা করব।

নিয়ন্ত্রণবাদ

নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে আমাদের ইচ্ছায় কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। নিয়ন্ত্রণ-বাদীরা এই মতবাদ নানা দিক থেকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে আমাদের ইচ্ছা যে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত তা মনোবিজ্ঞান (Psychology), তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics) ও ধর্মবিজ্ঞানের (Theology) দিক থেকে দেখানো যেতে পারে। আমরা এখন তাঁদের যুক্তিগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

(১) মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ

(ক) **স্বেচ্ছাকৃত কার্যের মনস্তত্ত্ব** (Psychology of voluntary action):

১। উৎসাহী পাঠক এই বিষয়ে একটি চমৎকার আলোচনা A. C. Ewing রচিত The Fundamental Questions of Philosophy গ্রন্থের Freedom অধ্যায়ে পাবেন।

আমরা স্বেচ্ছায় যে সমস্ত কাজ করি, তা আমাদের উদ্দেশ্য (motive) ও বাসনার (desire) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে আমাদের কাছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বাসনার উদ্ভব হয়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য ও বাসনা একই সঙ্গে আমাদের পক্ষে সার্থক করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাসনার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় (conflict of desires)। যে বাসনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আমরা তাই সফল করতে চেষ্টা করি। কোন একটি বাসনার গুরুত্ব বিভিন্ন সর্তের ওপর নির্ভর করে। (১) ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা (২) ব্যক্তির চরিত্র (৩) বংশপরম্পরাগত বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও (৪) ব্যক্তির দৈহিক গঠন। বাসনার এসব সর্ত যদি পরিষ্কারভাবে জানা যায়, তবে সহজেই মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। আমাদের সমস্ত কাজই এসব সর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মানুষের কাজের কোন স্বাধীনতা নেই।

(খ) মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ঃ

মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তা কেউ কেউ আগে থেকেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। মানুষের কার্যক্রমের ভবিষ্যৎবাণী সম্ভব বলেই কর-কোষ্ঠী বিচারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যদি আগে থেকেই মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়, তবে কাজে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। মানুষের যদি ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য থাকত তবে সে ভবিষ্যতে কি করবে তা আগেই বলা যেত না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যহীনতাই স্বীকার করতে হয়।

(২) তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ ঃ

তত্ত্ববিজ্ঞানে কার্যকারণ সম্পর্ককে একটি সার্বিক সম্পর্ক[১] বলা হয়। কার্য-কারণ তত্ত্বানুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে, কারণ ছাড়া কোন কার্যই হয় না। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে ইচ্ছারূপ কার্য কোন কারণ ছাড়াই হয়—এমন কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্ব সত্য বলে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। সুতরাং ইচ্ছার পরতন্ত্রতাই স্বীকার করতে হয়।

১। সার্বিক সম্পর্ক—Universal relation.

জড়বাদ জড়কেই চরমতত্ত্ব বলে মনে করে। জড়বাদীদের মতে দুনিয়ার সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে। প্রত্যেক পরিবর্তনেই পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যতিক্রমই হতে পারে না। সুতরাং জড়বাদীদের মতে ইচ্ছার কোন স্বাধীনতার কথা ভাবা যায় না।

(৩) ধর্মবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ

ধর্মবিজ্ঞানে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলা হয়। ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ হন, তবে তিনি মানুষের সব কাজই আগে জানতে পারেন। তিনি যদি মানুষের সব কাজই আগেই জানেন, তবে মানুষের কাজে কোন স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। যদি মানুষের কাজে স্বাধীনতা থাকত, তবে ঈশ্বর আগেই তা জানতে পারতেন না। আবার যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুতরাং তিনিই মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করেন। যদি তিনি মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত না করতে পারেন, তবে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বললে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকারই করতে হয়।

স্বাতন্ত্র্যবাদ

স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপক্ষীয়দের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেই তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণবাদ-খণ্ডনই প্রথম আলোচনা করব।

নিয়ন্ত্রণবাদ খণ্ডন ঃ

প্রথমতঃ, স্বেচ্ছাকৃত কার্যের যে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর নিয়ন্ত্রণ-বাদ প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণ করে না। স্বেচ্ছাকৃত কার্য বাসনার গুরুত্ব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাসনার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরের কোন বস্তু কোন ব্যক্তির বাসনার গুরুত্ব নিয়ন্ত্রিত করে না। আমি যে বাসনাকে আমার দিক থেকে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তাই আমি কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করি। আমার কাজ আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ বাসনা তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমার কাজে আমার নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা গেলেও নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক মানুষেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক কাজেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেউ যদি কোন মানুষের চরিত্র জানে, তবে সে তার কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী নির্দিষ্ট ব্যক্তির কার্যের পরতন্ত্রতা সূচনা করে না। প্রত্যেক মানুষের কাজই তার চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বাইরের বস্তুই মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করতে হয়।

তৃতীয়তঃ, জড়বাদ যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ নয়। আমরা জড়বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। জড়বাদীরা যে ইচ্ছার পরতন্ত্রতা প্রমাণ করেছেন, তাও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রত্যেক পূর্বাবস্থাই উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে একথা সত্য নয়। আমরা একাদশ অধ্যায়ে যন্ত্রবাদ-সমালোচনা প্রসঙ্গে যন্ত্রবাদীদের একথা খণ্ডন করেছি। সুতরাং জড়বাদ স্বাতন্ত্র্যবাদ খণ্ডন করতে পারে না।

চতুর্থতঃ, কার্যকারণ তত্ত্বের সঙ্গে সার্থক স্বাতন্ত্র্যবাদের কোন বিরোধ নেই। সার্থক স্বাতন্ত্র্যবাদ—মানুষের ইচ্ছা অকারণে উদ্ভূত হয়—এমন কথা বলে না। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ব্যক্তি-চরিত্রই ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ব্যক্তি-চরিত্র ব্যক্তির ইচ্ছার কারণ। কাজেই স্বাতন্ত্র্যবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী নয়।

পঞ্চমতঃ, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণ করে, এমন কথাও বলা যায় না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। মানুষের সব ইচ্ছাই তিনি জানেন। কিন্তু তিনি জানেন বলেই মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করেন না। সেণ্ট টমাস বলেছেন, স্মৃতিতে আমরা যেমন অতীতকে জানি, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত করি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের সব কাজই জানেন, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত করেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তা করেন না। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার ব্যবহার না করা ক্ষমতাবানের মহত্ত্ব সূচনা করে। ঈশ্বরের পক্ষে সেজন্যই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ না করাই স্বাভাবিক। সুতরাং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলে নিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এরকমভাবে নিয়ন্ত্রণবাদ খণ্ডন করে স্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিজেদের পক্ষেও কতকগুলো যুক্তি দিয়েছেন। আমরা এখন স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করব।

স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি

(১) আত্মসচেতনতার সাক্ষ্য (The Evidence of Self-Consciousness) :

কাজ করার সময় আত্মসচেতন হলে, আমরা যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তা বেশ বুঝতে পারি। যখন কোন কাজ করি, তখন কি করব তা ত' আমরা স্বাধীনভাবেই ঠিক করি। সুতরাং আমাদের আত্মসচেতনতা স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সাক্ষ্য বহন করে।

(২) নৈতিক চেতনার সাক্ষ্য (The Evidence of Moral Consciousness) :

স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করলে নৈতিক জীবনের কোন অর্থই থাকে না। নৈতিক চেতনায় আমরা নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হই। যদি প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত কর্মপ্রণালীর মধ্যে স্বেচ্ছায় এই নৈতিক আদর্শ রূপায়িত করার ক্ষমতা আমাদের না থাকে, তবে নৈতিক জীবন তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে নীতির দিক থেকে তার কোন ভাল-মন্দ বিচার চলে না, সুতরাং নৈতিক চেতনা ও নৈতিক জীবনের তাৎপর্য রক্ষার জন্য ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হয়।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বাতন্ত্র্যবাদই যুক্তিযুক্ত ; নিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্বাতন্ত্র্যবাদ আবার দু'রকম হতে পারে, অনিয়ন্ত্রণবাদ (Indeterminism) ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Self-determinism)। অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার চরম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। স্বনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বলতে চরম স্বাতন্ত্র্য বোঝেন না। তাঁদের মতে ব্যক্তি-চরিত্র ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্য বলতে তাঁরা পরনির্দেশরাহিত্য বোঝেন। স্বাতন্ত্র্যের রূপ নিয়ে অনিয়ন্ত্রণবাদী ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদীদের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ আলোচনা করে নিজেদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করব।

অনিয়ন্ত্রণবাদ বনাম স্বনিয়ন্ত্রণবাদ

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা নিয়ে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা স্বাতন্ত্র্য বলতে চরম স্বাতন্ত্র্য বোঝেন। স্বনিয়ন্ত্রণ-বাদীদের মতে পরনির্দেশরাহিত্যই স্বাতন্ত্র্য, স্বনির্দেশে পরিচালিত হওয়ার নামই স্বাধীনতা।

আমাদের মনে হয়, অনিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। চরম স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছা-চারিতার নামান্তর মাত্র। স্বেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খলতা সূচনা করে। উচ্ছৃঙ্খলতা কেউই সমর্থন করতে পারেন না। অনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছারূপ কার্যের কোন কারণই স্বীকার করেন না। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্ব সার্বিক বলেই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সুতরাং এই দিক থেকেও অনিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিযুক্ত নয়।

অনিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে কোন নৈতিক বিচারই সম্ভব হয় না। কোন মানুষের কাজ যদি সেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে সেই কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। যে কাজের জন্য যে মানুষ দায়ী নয়, সেই কাজের ভাল-মন্দ দিয়ে সেই মানুষের ভাল-মন্দের বিচার চলে না। সুতরাং অনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করলে নৈতিক বিচার অসম্ভব হয়ে ওঠে।

স্বনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করলে কোন অসুবিধেই দেখা দেয় না। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী নয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ব্যক্তি-চরিত্রই ব্যক্তি-কার্যের কারণ। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে নৈতিক বিচারের সম্ভাবনাও ব্যাখ্যা করা যায়। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কর্মই সেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী। কাজেই এই ক্ষেত্রে কোন মানুষের কাজের ভাল-মন্দ দিয়ে সেই মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করা যায়। এসব কারণে অনিয়ন্ত্রণবাদের তুলনায় স্বনিয়ন্ত্রণবাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, **স্বনিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণ-বাদের দ্বন্দ্ব সমন্বিত করেছে।** নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ন্ত্রণবাদ মানুষের ইচ্ছার কোন নিয়ন্ত্রণই স্বীকার করে না। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলে, মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়, আবার সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতও নয় ; মানুষের ইচ্ছা স্বনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ব্যক্তিই ব্যক্তির ইচ্ছা

নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তি-ভিন্ন বাইরের অন্য কোন বস্তুর ব্যক্তি-ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা নেই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। আমরা যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলি তাও কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝায় না। যখন কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপরই নির্ভর করে, রাষ্ট্র কোন বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তখন আমরা সেই রাষ্ট্রকে স্বাধীন বলি। এই রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিশ্চয়ই আইন করে। নাগরিকেরা এই আইন মানতে বাধ্য। যদি তারা আইন না মানে তবে রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দেয়। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও নাগরিকেরা স্বাধীন নয়, এ কথা আমরা বলি না। এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বলতে অনিয়ন্ত্রণ বোঝায় না, বহির্নিয়ন্ত্রণ ত বোঝায়ই না, স্বনিয়ন্ত্রণ বোঝায়। আমরা এই অধ্যায়ে স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি।

ষোড়শ অধ্যায়

ঈশ্বর (God)

সাধারণ মানুষ সর্বজ্ঞান ও সর্বশক্তির আধার রূপে ঈশ্বরের কল্পনা করে। তারা তাঁকে অসীম, বিভু, সর্বজ্ঞ ও করুণাময় প্রভৃতি বলে ও মনে করে। দার্শনিক ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন তোলেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি কি? তিনি এক না বহু? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে সসীম জীব ও এই জগতের সম্পর্ক কি? এরকম কত প্রশ্নই দার্শনিকদের মনে আসে। আমরা এই অধ্যায়ে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। কিন্তু এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের নাস্তিক (Atheist) বলা হয়। নাস্তিকদের মতবাদ খণ্ডন করতে না পারলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই আলোচনা করা যায় না। সুতরাং আমরা সর্বাগ্রে নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করব।

নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন (Refutation of Atheism)

নাস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না; সুতরাং ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় সত্তা বলা হয়। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে জানা যায় না। আমরা যা জানি না তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর নেই। জড়বাদী দার্শনিকেরাই সাধারণতঃ নাস্তিক হন। তাঁরা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে বিশ্ব-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক-ভাবেই চলে; এখানে কোন উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব নেই।

সমালোচনা ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি বলেই ঈশ্বর নেই, এমন কথা বলা যায় না। ঈশ্বর নেই—একথা বলতে হলে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু নাস্তিকেরা আজ পর্যন্ত তা পারেননি। তারপর সব বিষয়ই যে প্রমাণ করা যায়, একথারও প্রমাণ দরকার। এমন ত' হতে পারে যে, ঈশ্বর প্রমাণের বিষয়ই নন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলে তিনি নেই, একথা বলা যায় না।

নাস্তিকেরা বলেন, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া কোন জ্ঞান হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নেই। আমরা বলি, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া যে জ্ঞান হতে পারে না—একথা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যদি যুক্তির খাতিরে একথার সত্যতা ধরেও নিই তবুও নাস্তিকদের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া যদি কোন জ্ঞান না হয়, তবে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবে না। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে জানি না বলে তিনি নেই, এমন কথা ত' বলা যায় না। যে ঈশ্বরকে জানি না তিনি আছেন বা নেই তাও জানি না। সুতরাং নাস্তিকেরা যে বলেন ঈশ্বর নেই—তা বলা যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, জড়বাদী দার্শনিকেরাই সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা যন্ত্রবাদ দিয়ে বিশ্বপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা যন্ত্রবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, যন্ত্রবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়; বিশ্বপ্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। উদ্দেশ্যমূলক এই জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং নাস্তিকতা প্রামাণ্য নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মত অনেক ধর্মপ্রচারক ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেছেন বলে দাবী করেন। তাঁদের দাবী নস্যাৎ করার পূর্বে তাঁদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক মনীষী[১] তাঁদের সমর্থনে বলেন, কোন বৈজ্ঞানিক সত্য (যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিশেষ অনুপাতের মিশ্রণের ফলে জল হয়) প্রমাণ করতে হলে যেমন বৈজ্ঞানিককে পরীক্ষণাগারে যেতে হয় এবং পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া এই পরীক্ষা বোঝা যায় না, তেমনি ধর্মপ্রচারকদের দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে ধর্মপ্রচারকের কাছে যেতে হবে, তাঁর কথা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং এই চেষ্টার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি দরকার।

নাস্তিকতা অপ্রমাণিত হওয়ায় এখন আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

ঈশ্বরের প্রকৃতি ঃ

ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে তা হচ্ছে—ঈশ্বর কি ও কে? আমরা এখন এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

১। Aldous Huxly : Perennial Philosophy দ্রষ্টব্য।

শান্ত ও অপূর্ণ মানুষ সমস্ত পূর্ণতা ও কল্যাণ গুণের আধার রূপে ঈশ্বরের কল্পনা করেছে। ঈশ্বর সান্ত নন, অনন্ত। তিনি অপূর্ণ নন, পূর্ণ। তিনি পরিণামী নন, অপরিণামী। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু। তত্ত্বের দিক থেকে (from the standpoint of Metaphysics) ঈশ্বর বলতে আমরা ত' এই বুঝি। কিন্তু, ভক্ত ঈশ্বরকে অনন্ত, পূর্ণ, অপরিণামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু বলেই খুশী হন না। তিনি ঈশ্বরকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে পেতে চান। তাঁর মতে ঈশ্বর কল্যাণময়, প্রেমময়। তিনি প্রেমের ঠাকুর। শুধু তাই নয়। তিনি দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি-সমন্বিত এক পুরুষ। তবে তিনি সাধারণ পুরুষ নন, তিনি পুরুষোত্তম। তিনি কখনও অবিচার করেন না। অশরণের তিনি শরণ, অগতির তিনি গতি।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাত্ত্বিকেরা ঈশ্বরকে অনন্ত, পূর্ণ অপরিণামী, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও বিভু বলেছেন। তাঁরা ঈশ্বরকে এসব গুণে বিভূষিত করে কি বোঝাতে চান, তা জানা দরকার। অনন্ত সান্তের অভাব সূচনা করে না। অনন্ত যদি সান্তের অভাব হত, তবে হয় সান্ত মিথ্যা হত, নয়ত, অনন্তকে সীমিত করত। সান্তকে অস্বীকার করলে অনন্তের কোন তাৎপর্য থাকে না। অনন্ত সান্তকে গ্রহণ করে আবার সান্তকে অতিক্রমও করে। সান্ত জগৎ ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঈশ্বর কারুর ওপর নির্ভরশীল ন'ন। তিনি স্বনির্ভর। এজন্যই ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়।

ঈশ্বর পূর্ণ। কিন্তু সেজন্য তিনি অপূর্ণকে পরিত্যাগ করেন না। অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর অপরিণামী, কারণ তাঁর কোন পরিণাম নেই। তিনি অজর ও অমর। তিনি নিত্য, কারণ তিনি কালোত্তীর্ণ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। কিন্তু তিনি সব জানেন বলেই মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন না। আমরা যেমন স্মৃতিতে অতীতকে জানি, কিন্তু অতীতকে নিয়ন্ত্রিত করি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের ভবিষ্যৎ সব কিছুই জানেন, কিন্তু তা তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন না। সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি তা বলে অসম্ভবকে সম্ভব করেন না। ঈশ্বর কখনও সোনার পাথরবাটি সৃষ্টি করবেন না। কারণ সোনার পাথরবাটির মধ্যে স্ব-বিরোধ (Self-contradiction) এবং অযৌক্তিকতা (irrationality) আছে। যা সোনার বাটি, তা পাথরের হতে পারে না ; আর যা পাথরের বাটি তা সোনার হতে পারে না। সুতরাং যখন ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলি

তখন তিনি স্ব-বিরোধমুক্ত সব কিছুই করতে পারেন, তাই বোঝাতে চাই। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অক্ষমতা স্বীকার করি না। ঈশ্বর অযৌক্তিক হতে পারেন না। স্ব-বিরোধ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এজন্যই ঈশ্বর স্ব-বিরোধযুক্ত কিছু করেন না।[১]

ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চান। তাই তিনি ভগবানের ওপর মানবিক গুণ আরোপ করেন। ভক্ত ভাবেন, ঈশ্বর কখনও কারও অকল্যাণ করতে পারেন না; সুতরাং তিনি কল্যাণময়। সমস্ত পাপীতাপী ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করে। তিনি কাউকেই বঞ্চিত করেন না। সুতরাং তিনি করুণাময়। ঈশ্বর ধনী-দরিদ্র, পাংক্তেয়-অপাংক্তেয় সবাইকেই সমানভাবে ভালবাসেন। সুতরাং তিনি প্রেমময়। অন্তরের আকুতিতে, প্রেমের গভীরতায় এই প্রেমের ঠাকুর ধরা দেন। ঈশ্বর মানুষের সুখ-দুঃখে ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নির্বিকার থাকতে পারেন না। তিনি সবসময়েই বঞ্চিতকে করুণা-কণা দান করেন। মানুষ মানুষের প্রতি প্রায়ই অবিচার করে। কিন্তু ঈশ্বর কখনও অবিচার করতে পারেন না। যাকে কেউ আশ্রয় দেয় না, তাকে তিনি আশ্রয় দেন। যাকে সবাই বর্জন করে তাকে তিনি গ্রহণ করেন। ঈশ্বর পুরুষোত্তম। সাধারণ পুরুষের অপূর্ণতা তাঁর নেই, কিন্তু পুরুষের প্রতি পুরুষের করুণাঘন কৃপা ও সহৃদয় সহানুভূতি সব সময়েই তাঁর আছে।

ঈশ্বর কি ও কে—তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বর এক, না দুই, না বহু?

অনেকেশ্বরবাদ (Polytheism) :—ধর্মের ইতিহাস[২] আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় মানুষ বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করত। প্রাচীন গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে একথার প্রমাণ মিলবে। প্রথম মানুষ প্রকৃতিতে যা গভীর, গহন, গম্ভীর ও বিপুল দেখেছে তাকেই ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করেছে। এমনি করেই ত' প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু ও শক্তির আরাধনা শুরু হয়েছিল। যারা বহু ঈশ্বরের পূজা করে তাদের অনেকেশ্বরবাদী বলা হয়; আর তাদের মতবাদের নাম **অনেকেশ্বরবাদ** (Polytheism)।

১। G. Galloway: The Philosophy of Religion গ্রন্থের Attributes of God অধ্যায়টি প্রাসঙ্গিক।

২। ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন জানার জন্য D. Miall Edwards বিরচিত 'The Philosophy of Religion' গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত।

সমালোচনা ঃ অনেকেশ্বরবাদ মানুষের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমরা 'ঈশ্বর কি ও কে'—এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ। একাধিক অনন্ত ও পূর্ণ পুরুষ কখনই হতে পারে না। অনন্ত ও পূর্ণ একই হতে পারে।

ঈশ্বর যদি একাধিক হন তবে তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্ন ওঠে এবং এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। জগতের ঐক্য, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করতে হলে এক ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়। বহু ঈশ্বর কখনও জগতের সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস বস্তু-বিন্যাস সম্ভব করতে পারেন না। কারণ, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, সফল হয় না।

দ্বীশ্বরবাদ (Ditheism) ঃ—যদিও একেশ্বরে বিশ্বাসই সব চেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য, তবু মানুষ অতি সহজে এই বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথমে যে তারা অনেকেশ্বরবাদে বিশ্বাস করেছে তা আমরা এই মাত্র বললাম। অনেকেশ্বর-বাদের পর দ্বীশ্বরবাদে (Ditheism) বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। দ্বীশ্বরবাদ অনুসারে একই ঈশ্বর শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল একই সঙ্গে সৃষ্টি করতে পারেন না। শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সৃষ্টির জন্য একজন ঈশ্বর ; আর অশুভ, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের সৃষ্টির জন্য আর একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং দ্বীশ্বরবাদে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন শিব, আর একজন অশিব। এঁদের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

প্রাচীন পার্শীরা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। তারা কল্যাণের নিদান ঈশ্বরকে বলত আহুর মজ্‌ডা (Ahura Mazda), আর অকল্যাণের নিয়ামক ঈশ্বরকে বলত আহ্রিমণ (Ahriman)। আহুর মজ্‌ডা কল্যাণাকীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আহ্রিমণ প্রতিনিয়ত আহুর মজ্‌ডার সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আহুর মজ্‌ডা ও আহ্রিমণের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলছে।

সমালোচনা ঃ জগতে শুভ ও অশুভ সৃষ্টির জন্য দুজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয় না। যিনি শুভ সৃষ্টি করেন, তিনি অশুভও সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর অশুভ সৃষ্টি করেন বলে তিনি নির্দয় নন। সসীম জীব যাতে শুভের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্যই তিনি অশুভের সৃষ্টি করেন। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর তাৎপর্য বোঝা যায় না, তেমনি অশুভ না থাকলে

শুভের তাৎপর্যও বোঝা যায় না। অন্ধকারের পাশে আলোর মহিমা যেমন সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনি অশুভের পাশেই শুভের মহিমা সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। তাই যে ঈশ্বর শুভের স্রষ্টা তাঁর অশুভের স্রষ্টা হতে কোন বাধা নেই। তা ছাড়া যাকে অশুভ বলছি তা সত্যিই অশুভ কি-না, না, তা আমাদের খণ্ড দৃষ্টির ফল, এ প্রশ্ন উঠতে পারে।[১]

দ্বীশ্বরবাদে বিশ্বাস করলে জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দ্বীশ্বরবাদীদের মতে শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁদের পক্ষে একত্রিত হয়ে এই সুন্দরী ধরণী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শুধু দ্বন্দ্ব থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং দ্বীশ্বরবাদ কোন কিছুরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

শুভ ও অশুভ এই দুই ঈশ্বর স্বীকার করলে তাঁদের অসীম বা পূর্ণ কোন কিছুই বলা যাবে না। এই দুই ঈশ্বর সাধারণ মানুষের মত নিত্য দ্বন্দ্বে রত, এইরূপ ভাবলে ঈশ্বরের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়।

একেশ্বরবাদ ঃ অনেকেশ্বরবাদ ও দ্বীশ্বরবাদ উভয়ই দোষ-দুষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের দ্বিত্ব বা বহুত্ব কিছুই স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—একথাই বলতে হয়। ঈশ্বরকে এক বা অদ্বিতীয় বললেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণের কল্পনা করি তা সার্থক হয়। একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরই অনন্ত, পূর্ণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু হতে পারেন। ধার্মিক-মনের আকূতি ও আকাঙ্ক্ষাও একেশ্বরে বিশ্বাস করলেই পূর্ণ হয়। যাঁকে আমরা সমস্ত হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে অভিষিক্ত করি তিনি বহু দেবতার মধ্যে একজন হলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমাদের প্রেমের ঠাকুর এক ও অদ্বিতীয় হলেই আমরা খুশী হই। সুতরাং নানা দিক থেকে বিচারেই ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয়ই বলতে হয়। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, সমস্ত উন্নত ধর্মই একেশ্বরবাদী।

এখন প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বর যদি এক ও অদ্বিতীয় হন, তবে তাঁর সঙ্গে সসীম জীব আর সান্ত জগতের কি সম্পর্ক হবে? বিভিন্ন দার্শনিক এ

১। 'অশুভ' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য G. Galloway রচিত The Philosophy of Religion গ্রন্থের The Problem of Evil অধ্যায়টি পাঠ করা উচিত। এই প্রসঙ্গ A. C. Ewing রচিত The Fundamental Questions of Philosophy গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়েও প্রণিধানযোগ্যরূপে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে ঈশ্বর জীব ও জগতের স্রষ্টা হলেও তিনি জীব ও জগতের মধ্যে থাকেন না ; জীব-জগতের বাইরে এ মতবাদের নাম বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ (Deism)। অন্য কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর জীব ও জগতে পরিব্যাপ্ত এবং সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। তিনি নিজেকে জীব ও জগতের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন। এ মতবাদের নাম সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি জীব ও জগতে মূর্তও বটেন, আবার জীবজগৎ উত্তীর্ণও বটেন। তিনি বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত। এ মতবাদের নাম ঈশ্বরবাদ (Theism) বা সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism)। কেউ কেউ আবার ঈশ্বরবাদ বলতে অন্য মতবাদও বোঝেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর জগতের ভেতরেও আছেন বাইরেও আছেন, কিন্তু জীবের বেলায় তিনি শুধু বাইরেই আছেন, ভেতরে নেই। আমরা এখন এসব মতবাদের গুণাগুণ বিচার করব।

বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ (Deism)

বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ অনুসারে অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর একা ছিলেন। তারপর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি অসৎ (nothing) থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। সৎ বা জগৎ সৃষ্টি করে তিনি কতকগুলো শক্তিও সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তিগুলো (forces) জগৎ সৃষ্টির পর জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই শক্তিগুলোকে জগতের গৌণ কারণ (secondary causes) বলা যেতে পারে। জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎকে গৌণ কারণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ জগতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যখন জাগতিক ব্যাপারে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করে জগতে স্বাভাবিক অবস্থা এনে দেন। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে সৃষ্টির আগে ঈশ্বর জগৎ ছাড়াই ছিলেন, সৃষ্টির পরেও তিনি নিজেকে জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপেই জীব ও জগতের বাইরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে জীব ও জগতের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্কই নেই।

সমালোচনা ঃ বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ সৃষ্টিতত্ত্বে (The Theory of Creation) বিশ্বাসী। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

(১) ঈশ্বর কি করে অসৎ থেকে সতের সৃষ্টি করতে পারেন, তা আমরা বুঝি না। শূন্য থেকে কোন জিনিস উৎপন্ন হতে পারে না। বিশেষ করে উপাদান কারণের স্বরূপ কার্যেও দেখা যায়। অসৎ যদি সতের উপাদান কারণ হয়, তবে সৎ বা জগৎও অসৎ হবে। কিন্তু বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদীরা নিশ্চয়ই জগৎকে অসৎ বলবেন না।

(২) ঈশ্বর কোন বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, একথা যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না। প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বর কোন একটা মুহূর্তই সৃষ্টিকার্যের জন্য বেছে নিলেন কেন? জগৎ-সৃষ্টি তিনি আগে বা পরে করলেন না কেন? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

(৩) বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদীদের মতে জগৎ-সৃষ্টির পর গৌণ কারণ জগৎ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু গৌণ কারণ নিশ্চেতন। নিশ্চেতন কারণ কোন কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। নিয়ন্ত্রণকার্য চেতনকার্য। সুতরাং অচেতন গৌণ কারণ কি করে জগৎ-সৃষ্টির পর জগৎ নিয়ন্ত্রিত করে, তা বোঝা যায় না।

(৪) বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদীরা জাগতিক ব্যাপারের চরম বিপর্যয় কালে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঈশ্বর সাধারণ যন্ত্রীর মত সৃষ্ট যন্ত্র বিকল হলে তা সারাই করবেন, একথা ভাবা যায় না। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাধারণ যন্ত্রী নন। সুতরাং জাগতিক কার্যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কথা বিশ্বাস করা যায় না।

(৫) বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগতের বাইরে থাকেন। একথা সত্যি হলে ঈশ্বর জগতের দ্বারা সীমিত হবেন। সুতরাং ঈশ্বরকে অসীম ও অনন্ত বলা যাবে না। কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত। সুতরাং বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদীদের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(৬) বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ স্বীকার করলে জীবের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হয়। কারণ, এ মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জীবের বাইরে থাকেন এবং জীবের কোন কার্যই তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন না। কিন্তু অপূর্ণ জীবের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায় না।

(৭) ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে থাকেন, তবে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। ধার্মিক ও ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে জীবের বাইরে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে

কোন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনই সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদে ধর্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি।

সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)

বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সর্বেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জীব ও জগতের অতীত (transcendent) বা বাইরে থাকেন। সর্বেশ্বরবাদীরা মনে করেন ঈশ্বর জীব ও জগৎ-গত (immanent) বা জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজাকে সর্বেশ্বরবাদের সমর্থক বলে মনে করা হয়।

সর্বশ্বরবাদীদের মতে, ঈশ্বরই সব, আর সবই ঈশ্বর। বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের অনন্ত সত্তায় বিধৃত হয়ে আছে। বিশ্বচরাচরের সত্তা ঈশ্বরেরই সত্তা। সুতরাং ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন সত্তাই নেই। বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সত্য। বহু এই একের প্রকাশ মাত্র। বহুত্বের কোন আত্যন্তিক সত্যতা নেই। ঈশ্বর নির্গুণ, এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের কোন বর্ণনা দেওয়াই সম্ভব নয়। তিনি সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্‌মানসগোচর।

সমালোচনা ঃ সর্বেশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও অবাঙ্‌মানসগোচর। এই ঈশ্বরের সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করাই সম্ভব নয়। যে ঈশ্বর আমাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার, সে ঈশ্বর আমাদের ধর্মজীবনের আকূতি তৃপ্ত করতে পারেন না। আমরা ধর্মজীবনে ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার আত্মীয় রূপে পেতে চাই। কিন্তু নির্গুণ ও অবাঙ্‌মানসগোচর ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্থাপনই সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদ আমাদের ধর্মজীবনের আকূতি তৃপ্ত করতে পারে না।

সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে। একথা যদি সত্য হয় তবে জগৎকে সত্য বলা যায় না। প্রতীয়মান জগৎ সত্য নয়—একথা বললেই আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। জগৎ কি অর্থে সত্য নয়, জগতের প্রতীয়মানতা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় প্রভৃতিও জানা দরকার।

সর্বেশ্বরবাদ এককে স্বীকার করে, কিন্তু বহুকে প্রত্যাখ্যান করে। জগতে আমরা যেমন ঐক্য দেখি, তেমনি বৈচিত্র্যও দেখি। সুতরাং বৈচিত্র্যের একটা ব্যাখ্যা দরকার। বৈচিত্র্য-প্রত্যাখ্যান বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যা নয়।

সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকেই সব আর সবকেই ঈশ্বর বলে। জগতের অনেক

নিশ্চেতন জড় পদার্থই দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর কি করে নিশ্চেতন জড় হতে পারে, তার ব্যাখ্যা দরকার।

ঈশ্বর যদি জীবের অন্তর্ব্যাপী হয় তবে জীবের কোন স্বাধীনতাই থাকে না। জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকলে দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ধর্মের কোন মূল্যই থাকে না। যে অপরের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তার দায়িত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যার দায়িত্বের কোন বালাই নেই, তার কর্তব্যাকর্তব্য বলেও কিছু থাকতে পারে না। যার কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নেই তার নীতিবোধও নেই। ভক্ত ও ভগবান স্বতন্ত্র না হলে উপাসনা ও সাধন-পদ্ধতির কোন অর্থ থাকে না। ভগবানের উপাসনা করতে হলে ভক্ত থেকে ভগবানকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে হয়। সর্বেশ্বরবাদে জীব আর ঈশ্বর একান্তভাবেই অভিন্ন। সুতরাং এই মতবাদে ধর্মোপাসনার কোন স্থান নেই।

সর্বেশ্বরবাদের এত দোষ সত্ত্বেও সর্বেশ্বরবাদের একটি গুণ অস্বীকার করা যায় না। সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদের মত কালিক সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে না। কালিক সৃষ্টিতত্ত্ব যে বহু দোষে দুষ্ট, তা আমরা একাদশ অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। সুতরাং এই দিক থেকে সর্বেশ্বরবাদের কিঞ্চিৎ সারস্য বা সরসতা অস্বীকার করা যায় না।

সর্বধরেশ্বরবাদ (Pan-entheism)

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদের যুক্তিমত ঈশ্বর জীব ও জগতের সম্পূর্ণ অতীত হতে পারেন না, আবার সর্বেশ্বরবাদের যুক্তিমত তিনি জীব ও জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী বা অন্তর্গতও হতে পারেন না। সর্বধরেশ্বরবাদ বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের চরমতা দূর করে তাদের সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। জার্মান দার্শনিক হেগেল সর্বধরেশ্বরবাদের সমর্থক। তাঁর মতে ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত দুইই।

হেগেলের মতে অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর সসীম ও সান্ত জীব-জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। তিনি এক হয়েও বৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধান করেন। তিনি সকলের মধ্য দিয়েই নিজের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা খুঁজে পান। এই এক বহুকে পরিত্যাগ করেন না, বরং বহুর মধ্যে নিজের ঐক্যের মাধুর্য উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর সবকিছুই ধারণ করে আছেন। তাই

তিনি সর্বধরেশ্বর। অপূর্ণ ও সান্ত যে যাই হোক না কেন কেউই পূর্ণ ও অনন্ত ঈশ্বরের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন না।

আমাদের বিবেচনায়, ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক-নির্ণয়-প্রসঙ্গে সর্বধরেশ্বরবাদের বক্তব্যই সবচেয়ে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা আমরা আগেই দেখেছি। সর্বধরেশ্বরবাদে বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের কোন দোষ-ত্রুটিই নেই।

সর্বধরেশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জীবের ভেতরেই শুধু নেই, তিনি বাইরেও আছেন। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ধর্ম অর্থহীন হতে পারে না। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন বলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে না। সুতরাং তার একটা দায়িত্ববোধ থাকে। মানুষের মধ্যে দেবত্ব থাকায় এই দেবত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করাই মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্তব্য-বোধই নীতি-বোধ জাগ্রত করে। ঈশ্বর জীবের সম্পূর্ণ বাইরে নন বলে সহজেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়। সুতরাং ভক্তের আকুতি সর্বধরেশ্বরবাদে তৃপ্ত হয়। সর্বধরেশ্বরবাদে ঈশ্বর অনন্ত হয়েও সান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন না, অসীম হয়েও সসীমকে তুচ্ছ বলেন না। সান্ত ও সসীমের মধ্যেই অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর আপনার বিচিত্র লীলা চালিয়ে যান। সুতরাং এই মতবাদে জীব ও জগৎ মিথ্যা নয়। তাদের প্রত্যেকেরই অনন্ত সত্তায় যথাযোগ্য স্থান আছে। বিশ্বের উদ্দেশ্যমুখীনতাও সহজেই এই মতবাদে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেহেতু ঈশ্বর আপনার উদ্দেশ্য এই জগতের মধ্য দিয়ে সফল করে নিচ্ছেন, সেজন্যই জগৎ যান্ত্রিকভাবে চলে না। এসব নানা দিক থেকেই সর্বধরেশ্বরবাদ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ঈশ্বরবাদ (Theism) ঃ

হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদকে ঈশ্বরবাদও বলা হয়। কিন্তু মার্টিনিউ[১] ঈশ্বরবাদ বলতে সর্বধরেশ্বরবাদ বোঝেন না। তাঁর ঈশ্বরবাদ হেগেলের ঈশ্বর-বাদ বা সর্বধরেশ্বরবাদ থেকে একটু স্বতন্ত্র। আমরা এখন মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের প্রকৃতি আলোচনা করব।

মার্টিনিউ হেগেলের মতই জগতের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী দুইই বলেন, অর্থাৎ মার্টিনিউ সাহেবের মতে ঈশ্বর জগতের মধ্যেও আছেন

১। Martineau: Study of Religion, Vol. II দ্রষ্টব্য।

আবার বাইরেও আছেন। এই দিক থেকে হেগেলের ঈশ্বরবাদের সঙ্গে মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের কোন পার্থক্যই নেই। কিন্তু জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক-ব্যাপারে মার্টিনিউ ও হেগেল একই মতবাদ গ্রহণ করেন না। হেগেলের মতে জগতের মত জীবের বেলাতেও ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী। কিন্তু মার্টিনিউ মনে করেন, ঈশ্বর জীবের সম্পূর্ণ অতিবর্তী। অর্থাৎ ঈশ্বর একেবারেই জীবের বাইরে থাকেন ; জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিবিড় সম্পর্কই নেই।

আমাদের মনে হয়, মার্টিনিউ সাহেবের কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর যদি জীবের সম্পূর্ণ অতীত হন, তবে তাঁর সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্ত ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতা যাচ্ঞা করেন। সুতরাং মার্টিনিউ সাহেবের কথা স্বীকার করলে ধর্মজীবনের আকৃতি ও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

অন্যদিক থেকেও মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের অসুবিধে আছে। মার্টিনিউ জীবকে ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। একথা যদি সত্য হয় তবে জীব পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হবে। কিন্তু পূর্ণস্বাতন্ত্র্য আর উচ্ছৃঙ্খলতা একই কথা। জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। তারপর জীবের যদি পূর্ণস্বাতন্ত্র্য থাকে তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে যখন জীবের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দেখা দেবে তখন জীব তার ইচ্ছামতই কাজ করবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে আর সর্বশক্তিমান বলা যাবে কি? সুতরাং ঈশ্বরকে জীবের সম্পূর্ণ অতীত বা অতিবর্তী বলা যায় না।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক নিয়ে ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদ বা ঈশ্বরবাদই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদ কোন না কোন দোষে দুষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে হেগেল যা বলেছেন, তাই গ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি জীব ও জগতের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী দুইই। অসীম ও অনন্ত পুরুষ ঈশ্বর জীব ও জগতের সীমা ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজের অসীমতা ও মুক্তি উপলব্ধি করেন। সীমার মধ্যে অসীমের সুর বাজে। সান্তের মধ্যে অনন্তের গান শোনা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ঃ

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক আলোচনা করা হল। এখানে প্রশ্ন ওঠে—যে ঈশ্বর নিয়ে এত আলোচনা, তিনি যে আছেন, তার প্রমাণ কি? ভক্তেরা বলবেন—বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর। তাঁদের মতে ঈশ্বর প্রমাণের অতীত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ এখানে নিষ্ফল। কিন্তু তার্কিক ও দার্শনিক একথায় খুশী হন না। তাঁরা সবকিছুই প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে চান। সব বিষয়েই প্রমাণ খোঁজা তাঁদের স্বভাব বলে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও প্রমাণ খোঁজেন। বিভিন্ন দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ বের করেছেন। কিন্তু তাঁদের কোন প্রমাণই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে কোন প্রমাণই যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ না করতে পারে তবে ঈশ্বরের এসব প্রমাণের তাৎপর্য কি? লোট্জা (Lotze)[১] বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিশ্বাসের পক্ষে কতকগুলো ওজর (pleas) মাত্র। যদি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে এসব প্রমাণ আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস-নিরপেক্ষভাবে এসব প্রমাণ কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বে স্বাভাবিক বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণের তাৎপর্য। আমাদের মনে হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলোর আর একটা তাৎপর্যও আছে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। সেজন্যই সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যুক্তি খোঁজে। হয়ত তার এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ সফল হয় না। কিন্তু তা হলেও তার অনুসন্ধানের নিষ্ঠাকে ত আর অস্বীকার করা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক এই অনুসন্ধান-নিষ্ঠার নিশ্চয়ই একটা দাম আছে। সফলতাই বড় কথা নয়, প্রচেষ্টার নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের সাধুতাই বড় কথা। এদিক থেকে বিচারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলো মানুষের যুক্তি খোঁজার প্রচেষ্টার নিষ্ঠা সূচনা করে বলে তারা কখনই তাৎপর্যহীন হতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আমরা এখন সেগুলো বিচার করে দেখব।

১। **Lotze: The Philosophy of Religion**

(১) বিশ্বতত্ত্ব বা কার্য-কারণতত্ত্বভিত্তিক যুক্তি (The Cosmological or Causal Argument)

বিশ্বতত্ত্ব বা কার্যকারণতত্ত্বভিত্তিক যুক্তি সর্বজনগৃহীত কার্যকারণতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কার্যকারণতত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে; কারণ ছাড়া কোন কার্যই হয় না। একথা যদি সত্য হয়, তবে প্রত্যেক কারণেরই আবার কারণ থাকবে। এমনি করে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এ অনবস্থা দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই আদি কারণ স্বয়ংসৃষ্ট (causa sui)। সুতরাং আদি কারণের আর কারণ নেই। এই আদি কারণের নামই ঈশ্বর।

বিশ্বতত্ত্ব বা কার্যকারণতত্ত্বভিত্তিক যুক্তিটিকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রত্যেক সাংশ বস্তুই কার্য। জগৎ বহু সাংশ বস্তুর সমষ্টি। সুতরাং জগৎও কার্য। প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে বলে জগতেরও কোন না কোন কারণ থাকবে। জগতের কারণ কোন সসীম বস্তুই হতে পারে না। জগতের কারণ সসীম হলে তারও আবার একটা কারণ খুঁজতে হবে। সুতরাং জগতের কারণ অসীমই হবে। এই অসীম কারণের নামই ঈশ্বর।

সমালোচনা ঃ ঈশ্বরকে জগতের আদি কারণ বলে স্বীকার করলে জগতের অতীত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। ঈশ্বর বিশেষ সময়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাও মানতে হয়। এক কথায় বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস-স্থাপন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমরা বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, এই মতবাদের দোষ-ত্রুটির অন্ত নেই। সুতরাং ঈশ্বরকে আদি কারণ বলা যায় না।

কার্যকারণতত্ত্বভিত্তিক যুক্তি কার্যকারণতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে। কিন্তু স্বয়ংসৃষ্ট কোন কারণে বিশ্বাস এই তত্ত্ব প্রমাণিত করতে পারে না। এ তত্ত্বানুসারে প্রত্যেক কারণেরই আবার কারণ থাকবে। সুতরাং কার্যকারণতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে স্বয়ংসৃষ্ট আদি কারণ বলা যায় না।

আর একটা কথাও ভাবার আছে। সাধারণতঃ আমরা সসীম বস্তুর কারণ সসীম বস্তু বলেই মনে করি। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্বভিত্তিক যুক্তিতে অসীম ঈশ্বরকে সসীম জগতের কারণ বলে মনে করা হয়েছে। সসীম কার্য থেকে অসীম কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় কি ?

জগৎকে কার্য বলে ধরে নিলেও এর কারণ রূপে অসীম ও অনন্ত ঈশ্বরকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমরা ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এই বিশ্বাস নিশ্ছিদ্র যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

(২) জগতের পরিকল্পনা-ভিত্তিক যুক্তি (Teleological Argument)

এই জগতের আমরা একটি সুন্দর পরিকল্পনা লক্ষ্য করি। মনে হয় যেন একটি পরিকল্পনা করেই এই জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জগতের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া কি ভাবে সম্ভব? আরও মনে করা হয় যে, এই পরিকল্পনার একজন পরিকল্পক নিশ্চয়ই আছেন। এই পরিকল্পক কোন সাধারণ মানুষ হতে পারে না। কারণ, এই বিরাট জগতের বিরাট পরিকল্পনা করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। ঈশ্বরই এই জগতের পরিকল্পনা করেছেন।

সমালোচনা ঃ জগতের পরিকল্পনাভিত্তিক যুক্তি কিছু গুরুত্ব বহন করে। চরম সংশয়বাদী দার্শনিক হিউমও এই যুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।[১] বার্ট্রাণ্ড রাসেল জগতের পরিকল্পনার কথা যে একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না, তা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু জগতের পরিকল্পনাভিত্তিক যুক্তি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না, একথা স্বীকার করতেই হবে।

জগতের পরিকল্পনাভিত্তিক যুক্তি আসলে একটি উপমার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সাধারণতঃ যে কোন সুন্দর সুশৃঙ্খল বস্তুই কোন না কোন শিল্পীর সৃষ্টি বলে মনে করি। জগৎ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বলে এর স্রষ্টা রূপে আমরা অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরকে স্বীকার করি। আমাদের মনে হয়, এ উপমা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সাধারণ শিল্পী দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার করে শিল্পবস্তু তৈরি করেন। কিন্তু ঈশ্বর চিন্ময় হওয়ায় তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে জগতের শিল্পী বলতে গেলে তাঁকে দেহী বলতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত বলে দেহী হ'তে পারেন না। কারণ, যে কোন দেহই বিশেষ স্থান ও কাল জুড়ে থাকে। সুতরাং যে কোন দেহীই অসীম ও অনন্ত হ'তে পারে না। তা ছাড়া সাধারণতঃ আমরা সসীম শিল্প-বস্তুর স্রষ্টাকে সসীম শিল্পী বলেই দেখতে পাই। সুতরাং এ উপমা থেকে সসীম জগতের শিল্পীকে সসীমই বলা যেতে পারে। কিন্তু জগতের পরিকল্পনাভিত্তিক যুক্তিতে জগতের যে শিল্পীর কথা বলা হয়েছে,

১। উৎসাহী পাঠক হিউমের মতবাদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার জন্য হিউমের 'Dialogues concerning Natural Religion' গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

তিনি অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর। সুতরাং জগতের পরিকল্পনাভিত্তিক যুক্তিও দোষমুক্ত নয়।

(৩) ঈশ্বরের ধারণা-ভিত্তিক যুক্তি (The Ontological Argument)

ঈশ্বরের ধারণা-ভিত্তিক যুক্তি ঈশ্বরের ধারণার তাত্ত্বিক বিচার থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। মধ্য যুগে সেন্ট আন্‌সেলম্ এ যুক্তির প্রথম অবতারণা করেন। পরবর্তীকালে ডেকার্টে, হেগেল প্রভৃতি অনেক দার্শনিকই বিভিন্ন ভাবে এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

সেন্ট আন্‌সেলম্ বলেন, আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার ধারণা আছে। এ পূর্ণ সত্তা নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল হবে। কারণ অস্তিত্বশীলতা পূর্ণতার অন্তর্গত। অর্থাৎ, যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। সুতরাং পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরকে অস্তিত্বশীল বলতে হয়।

ডেকার্টে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আন্‌সেল্‌মের যুক্তিই একটু ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এক অসীম সত্তার ধারণা আছে। কোন সসীম মানুষই এ অসীম সত্তার ধারণার সৃষ্টি করতে পারে না। সসীম মানুষ সসীম বস্তুর ধারণাই করতে পারে। সুতরাং অসীম সত্তার ধারণার স্রষ্টা হিসেবে অসীম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। এ অসীম সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বরের ধারণা-ভিত্তিক যুক্তির বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় আপত্তি এই যে, অস্তিত্ব কোন গুণ নয় এবং সেজন্যই পূর্ণতার কোন উপাদান নয়। 'গোলাপ লাল' এবং 'গোলাপ অস্তিত্ববান' এই দু'টি বচন তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত পৃথক। প্রথম বচনে গোলাপ সম্বন্ধে একটি গুণ যুক্ত করা হয়েছে। এই গুণ গোলাপের অস্তিত্বের অতিরিক্ত। কিন্তু, দ্বিতীয় বচনে গোলাপ সম্বন্ধে কোন নূতন গুণ যুক্ত করা হয়নি, শুধু গোলাপ নামক ধারণার বাস্তবতা স্বীকৃত হয়েছে। ব্যাকরণের দিক থেকে আলোচ্য দু'টি বচনের আকার একই রকম বলে এদের তাৎপর্যও একই প্রকার এমন ভুল আমরা করে থাকি। গোলাপ অস্তিত্ববান বললে গোলাপের অতিরিক্ত কিছু বলা হয় না, কিন্তু গোলাপ লাল বললে গোলাপের অতিরিক্ত একটি গুণের কথা বলা হয়। অস্তিত্ব জ্ঞান বা শক্তির মত কোন গুণ নয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর পূর্ণতার কোন উপাদান হ'তে পারে না।

ঈশ্বরের ধারণাভিত্তিক যুক্তি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ধারণাই বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। আমার একশ ডলারের ধারণা নিশ্চয়ই আমার পকেটে একশ ডলারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। পূর্ণ ও অসীম সত্তার ধারণা থেকে অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বের ধারণা ও আসল অস্তিত্ব এক কথা নয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

হেগেল ও হেগেলপন্থীরা কান্টের এ যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর এমন এক চৈতন্য সত্তা যাকে স্বীকার না করলে ধারণা ও বিষয় কোনটিই বোধগম্য হয় না। ধারণা ও বিষয়ের বোধগম্যতার জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।[১]

মন্তব্য ঃ আমাদের মনে হয়, হেগেল ও হেগেলপন্থীদের কথা সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

কান্ট নিজে নীতির আদর্শের তাৎপর্য রক্ষা বা নৈতিকতার বোধগম্যতার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে শ্বিবাস করেছেন। তিনি বলেন, ধর্ম পুরস্কৃত হবে ও ধার্মিক সুখী হবে—এ আমাদের নৈতিক জীবনের দাবী। এ না হ'লে নৈতিকতার অর্থ থাকে না। কিন্তু এ জগতে প্রায়ই আমরা ধার্মিককে সুখী হতে দেখি না। সুতরাং এমন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয় যিনি পরজন্মে হলেও ধার্মিককে সুখী করবেন।

হেগেল ও হেগেলপন্থীরাও ধারণা ও বিষয়ের বোধগম্যতা বা তাৎপর্য-বিধানের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কান্টের যুক্তি যদি গ্রহণ-যোগ্য হয় তবে হেগেল ও হেগেলপন্থীদের যুক্তিও গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে কান্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন সেই কান্ট, হেগেল ও হেগেলপন্থীরা ঈশ্বরের ধারণা-ভিত্তিক যুক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা উপেক্ষা করতে পারেন না।

(৪) নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument)

নৈতিক যুক্তির মূল কথা হচ্ছে এই যে, নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কান্ট ও মার্টিনিউ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুক্তি সমর্থন করেছেন।

১। এই প্রসঙ্গের আলোচনা John Caird রচিত An Introduction to the Philosophy of Religion গ্রন্থের Proofs for the existence of God অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

কান্ট বলেন, ধার্মিক সুখী হবে—এই আমাদের নৈতিক জীবনের দাবী। কিন্তু সাধারণতঃ এ পৃথিবীতে ধার্মিকদের অসুখীই হতে দেখি। সুতরাং পরজন্মে হ'লেও ধার্মিকের সুখ-বিধানের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। অপূর্ণ মানুষ ভুল করতে পারে। কিন্তু পূর্ণ ঈশ্বর কখনই ভুল করতে পারেন না। সুতরাং ধার্মিককে পুরস্কৃত ও পাপীকে তিরস্কৃত করতে তাঁর কখনই ভুল হবে না। তা ছাড়া তিনি সর্বক্ষম বলে ধার্মিককে পুরস্কৃত এবং পাপীকে তিরস্কৃত করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। ধার্মিকের পুরস্কার আর পাপীর তিরস্কারের জন্য আমরা একমাত্র ঈশ্বরের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। এই যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

মার্টিনিউ বলেন, নৈতিক দায়িত্ব (moral obligation) ও নৈতিক আদর্শ (moral ideal) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সূচনা করে। দায়িত্ব বলতে একজনের কাছে আর একজনের দায়িত্বই বোঝায়। নৈতিক দায়িত্ব সসীম অপূর্ণ মানুষেরই থাকতে পারে। কিন্তু সসীম মানুষ সসীম মানুষের কাছেই দায়ী হতে পারে না। সুতরাং সসীম মানুষ পূর্ণ ও অসীম ঈশ্বরের কাছেই দায়ী হবে। কাজেই নৈতিক দায়িত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই। মার্টিনিউ আরও বলেন, নৈতিক আদর্শও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। পরিপূর্ণতাই আমাদের নৈতিক আদর্শ। এ আদর্শ অবাস্তব ও মিথ্যা হতে পারে না। এই আদর্শের বাস্তব রূপ একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ। সুতরাং নৈতিক আদর্শের বাস্তবতার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

সমালোচনা ঃ কান্টের নৈতিক যুক্তির সমালোচকেরা বলেন, ধার্মিক সুখী হবেই—এই বিশ্বাসকে উপাত্তরূপে গ্রহণ করে এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করেছে। কিন্তু, কেউ যদি উপাত্তটি অর্থাৎ, কান্টের বিশ্বাস সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলে তবে সন্দিগ্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হবে তাও হবে সন্দিগ্ধ। সুতরাং এই যুক্তিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না।

মার্টিনিউ নৈতিক দায়িত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ অন্যভাবেও নৈতিক দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, মানুষ সমাজের কাছেই দায়ী। আবার কেউ বা বলেন, মানুষ নিজ বিবেকের কাছেই দায়ী। বিবেক আর ঈশ্বর এক নয়।

যাঁরা নৈতিক দায়িত্বের এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের মার্টিনিউ সাহেবের নৈতিক যুক্তি বোঝান মুশকিল।

পরিপূর্ণতাই নৈতিক আদর্শ একথা মেনে নিলে মার্টিনিউ সাহেব নৈতিক আদর্শ থেকে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, তা বোঝা যাবে। কিন্তু যাঁরা পরিপূর্ণতাকেই নৈতিক আদর্শ বলেন না, তাঁদের কাছে মার্টিনিউ সাহেবের যুক্তির কোন দাম নেই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী না হলে নৈতিক যুক্তি যুক্তি বলেই মনে হবে না।[১]

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম (God and The Absolute)

অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে চরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেন। এই ব্রহ্ম, অসীম, অনাদি, অনন্ত এবং পূর্ণ। এই ব্রহ্ম বিশ্বের ভিত্তিস্বরূপ। জগৎ ও জীবন এই তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। এই ব্রহ্ম পুরুষ কি-না, এই বিষয়ে অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে ব্রহ্ম পরমপুরুষ, কিন্তু স্পিনোজা, শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং তাকে পুরুষ বলা যায় না। স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিকেরা ব্রহ্মকে যে পুরুষ বলেন না তার কারণ, যে কোন পুরুষই সীমিত এবং ব্রহ্ম সীমিত নন। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, ব্রহ্মকে পরমপুরুষ বললে তাঁর অসীমত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম আত্মসচেতন, এই অর্থে ব্রহ্ম পুরুষ। ব্রহ্মের মধ্যেই মন এবং প্রকৃতির অবস্থান। মন এবং প্রকৃতির মধ্যে সাধারণতঃ যে বিরোধ কল্পনা করা হয় ব্রহ্মের মধ্যে তা সমন্বিত। ব্রহ্মের অসীমতা মন এবং প্রকৃতির সীমাকে বাদ দিয়ে নয়, সীমাকে গ্রহণ করে এবং সীমাকে অতিক্রম করে। এজন্যই ব্রহ্মকে পুরুষ বললে কোন দোষ হয় না।

ধার্মিক নির্গুণ ব্রহ্ম নিয়ে সুখী হন না। তিনি সগুণ ঈশ্বরের ভক্ত। এই ঈশ্বর পুরুষোত্তম, ন্যায়বান, করুণাময় ও প্রেমময়। এককথায় তিনি প্রেমের ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। ধার্মিক এই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী এবং এই প্রয়াসের নামই সাধনা। ধার্মিক মনে করেন, তাঁর ঈশ্বর নিশ্চয়ই চরমতত্ত্ব হবেন, কারণ, তিনি ন্যূন হলে ভক্ত

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি A. C. Ewing রচিত—The Fundamental Questions of Philosophy গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে যেভাবে আলোচিত হয়েছে তা উৎসাহীদের কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

তাঁর পূজারী হতে পারেন না। আবার তিনি নিশ্চয়ই হবেন ক্ষমাসুন্দর, কৃপাময় পুরুষ। পাপীতাপীর দুর্বলতায় তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিপাত করবেন এবং কৃপা করে তাদের শান্তি, স্বস্তি ও তৃপ্তি দেবেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে—অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের ব্রহ্ম ও ধার্মিকের ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ কি? ঈশ্বর ও ব্রহ্ম কি এক? না ঈশ্বর ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন? আমরা এখন এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

আমরা পূর্বেই বলেছি, অধ্যাত্মবাদী অনেক দার্শনিক চরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেছেন। এই ব্রহ্ম পুরুষ কি-না, এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। ধার্মিকের ঈশ্বর নিশ্চয়ই চরমতত্ত্ব, কিন্তু তিনি অবশ্যই পুরুষোত্তম। সুতরাং ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে মূল সমস্যা হচ্ছে ব্রহ্মকে পুরুষ বলা যায় কি-না, যদি যায় তবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন হবেন। যদি না যায় তবে ঈশ্বর ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হবেন এবং তাতে তিনি আর চরমতত্ত্ব থাকবেন না। ধার্মিক চরমতত্ত্ব নয়, এমন ঈশ্বর নিয়ে তৃপ্ত হবেন না। তা হ'লে সমস্যাটা হ'ল—ব্রহ্ম কি পুরুষ?

ভারতীয় দর্শনে রামানুজ ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বাসুদেব বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলেছেন। তাঁর মতে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের কখনই কোন নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হয় না, আমাদের জ্ঞানের বিষয় বিশিষ্ট বস্তু। সুতরাং একমাত্র বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সম্ভব। ব্রহ্মের পুরুষত্ব প্রসঙ্গে যে সমস্যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে রামানুজ সে সমস্যার মধ্যে প্রবেশ না করে ব্রহ্মকে পুরুষ এবং ঈশ্বর দুইই বলেছেন।

স্পিনোজা এবং ব্র্যাডলি ব্রহ্মের পুরুষত্ব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, ব্রহ্ম পুরুষ নন। স্পিনোজা ব্রহ্মকে পুরুষ না বলার কারণস্বরূপ বলেছেন, ব্রহ্ম পুরুষ হলে তিনি সীমিত হবেন। ব্রহ্ম সীমিত নন বলে তিনি পুরুষ নন। তবে স্পিনোজা ব্রহ্মকে ঈশ্বর নামেও অভিহিত করেছেন। স্পিনোজার ঈশ্বর অবশ্য সাধারণতঃ ধার্মিকেরা যে ঈশ্বরের কথা স্বীকার করেন সেই ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর নামে ঈশ্বর হলেও আসলে ব্রহ্ম। রামানুজ ব্রহ্ম বলতে ঈশ্বর বুঝেছেন, আর স্পিনোজা ঈশ্বর বলতে ব্রহ্ম বুঝেছেন। রামানুজের ব্রহ্ম দার্শনিকের সমস্যার (ঈশ্বরের পুরুষত্ব কিভাবে সম্ভব?) সমাধান দেয় না, স্পিনোজার ঈশ্বর ধার্মিকের দাবী মেটায় না।

ব্র্যাড্‌লি ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, ব্রহ্ম ধার্মিকের ঈশ্বর হতে পারেন না, আবার ধার্মিকের ঈশ্বর ব্রহ্ম না হলে যথার্থতঃ ঈশ্বরও হতে পারেন না।[১] ব্রহ্মই চরমতত্ত্ব, ঈশ্বর তার আভাস। ঈশ্বর আভাসরূপে চরমতত্ত্বেই বর্তমান, তবে ঈশ্বর চরমতত্ত্ব নয়।

আভাসরূপী ঈশ্বর ধার্মিককে তৃপ্তি দেয় না। ধার্মিক তাঁর ঈশ্বরকে চরমতত্ত্বই বলে থাকেন। সুতরাং ব্র্যাড্‌লির মত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সমস্যার সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে পারেনি।

দার্শনিকের ব্রহ্ম এবং ধার্মিকের ঈশ্বর যে ভিন্ন হ'তে পারেন না, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ, ভিন্ন হলে তাঁরা দুইই সীমিত হবেন এবং তাতে দার্শনিক বা ধার্মিক কারও তুষ্টি হবে না। দার্শনিক ও ধার্মিক দুইই শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদী, দুয়েরই মতে চরমতত্ত্ব সীমিত নয়। দুয়েরই স্বীকৃত অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ এক। তবে দার্শনিক তাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝেন, জ্ঞান দিয়ে জানেন, ধার্মিক তাকে অনুভব করেন, ভক্তিতে পান। দার্শনিকের দৃষ্টি বিচারমূলক, ধার্মিকের দৃষ্টি প্রেম ও বিশ্বাসনিষ্ঠ। দার্শনিকের দৃষ্টিতে চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম এবং ধার্মিকের দৃষ্টিতে তা ঈশ্বর। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ভিন্ন নয়। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে হেগেল একথা বলেন। ভারতীয় দর্শনে শঙ্কর ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে এই ব্রহ্মই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ব্যবহারিক দৃষ্টি অপেক্ষা উন্নত দৃষ্টি পারমার্থিক দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, শুধু ব্রহ্মই আছেন। যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁরা যে ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলেন, একথা শঙ্কর বলেছেন। তবে তাঁর মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগু´ণ এবং তাঁকে সগুণ ঈশ্বর বলা যায় না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উন্নত সাধক একথা উপলব্ধি করেন।

শঙ্করাচার্য পারমার্থিক দৃষ্টির যে কথা বলেছেন তা সাধারণের দৃষ্টি নয়। সাধারণের দৃষ্টি ব্যবহারিক দৃষ্টি এবং এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই দৃষ্টিতে হেগেলের কথা গ্রহণযোগ্য। হেগেলের সঙ্গে শঙ্করের এই প্রসঙ্গে পার্থক্য

১। 'If you identify the Absolute with God, that is not the God of Religion. If you separate them God becomes a finite factor in the whole. Short of the Absolute, God cannot rest, and having reached that goal, he is lost and religion with him. We may say that God is not God till He has become all in all, and that a God which is all in all, is not the God of Religion'—Bradley : Appearance and Reality.

এই যে, হেগেলের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই সত্তা, দার্শনিকের দৃষ্টিতে যা ব্রহ্ম, ধার্মিকের দৃষ্টিতে তা-ই ঈশ্বর। দুই দৃষ্টিই সমান সত্য, ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরও সমান সত্য। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ; ঈশ্বর মিথ্যা। পারমার্থিক দৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত সত্য, ব্যবহারিক দৃষ্টি তা নয়। সুতরাং ব্রহ্মই শেষ পর্যন্ত সত্য, ঈশ্বর মিথ্যা।

হেগেল ব্রহ্মকে যে ঈশ্বর বলা যায় এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ব্রহ্ম পুরুষ হলেও যে সীমিত হন না, তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন।[১] আমরা ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ আলোচনার প্রারম্ভেই হেগেলের বক্তব্য পরিবেশন করেছি। ব্রহ্মের পুরুষত্ব সমস্যাই যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর-সম্পর্কিত সমস্যার মূল তা আমরা আগেই বলেছি। হেগেল ব্রহ্মের পুরুষত্ব সিদ্ধ করে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের মূল সমস্যার সমাধান করেছেন।

১। G. Galloway রচিত The Philosophy of Religion গ্রন্থে 'God as person' প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মান বা মূল্য (Values)

মান বা মূল্য কি ?

বর্ণনা ও গুণাবধারণের (Description and Appreciation) পার্থক্য সুস্পষ্ট। বর্ণনার সময় বস্তু যেমন আছে আমরা তাকে ঠিক তেমনি বলে থাকি। কিন্তু গুণাবধারণের ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর প্রশংসা করি। বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুই বস্তুর বর্ণনা নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু প্রশংসার বেলায় বস্তুর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও মানুষের মনের অবদান অস্বীকার করা যায় না। বস্তুর প্রশংসা নিশ্চয়ই তার প্রশংসিত হওয়ার মত গুণের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রশংসিত হওয়ার মত এ গুণ দেখবার চোখ ও ত চাই। সমঝদার লোক না হলে এ গুণ ত চোখে পড়ে না। বস্তুতে প্রশংসিত হওয়ার মত গুণ দেখে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বস্তু সম্বন্ধে যা বলি তাই বস্তুর মান বা মূল্য সূচনা করে। মূল্য (value) আর তথ্য (fact) এক নয়। যা আছে, ঘটে বা থাকে তাকেই তথ্য বলা হয়। কিন্তু মূল্য সে ভাবে আছে, ঘটে বা থাকে তা বলা যায় না। আমরা আগেই বলেছি, মূল্য খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং মূল্য খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তি-নির্ভর। কিন্তু তথ্য একেবারেই ব্যক্তি-নির্ভর নয়। তথ্য সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত। তথ্যবিষয়ক বচন ও মূল্যবিষয়ক বচনের পার্থক্য আলোচনা করলে তথ্য ও মূল্যের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তথ্যবিষয়ক বচন ও মূল্য-বিষয়ক বচনের পার্থক্য আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে এটুকু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, তথ্যবিষয়ক বচন বর্ণনাত্মক (descriptive) আর মূল্যবিষয়ক বচন গুণাবধারণাত্মক (appreciative)। বর্ণনা আর গুণাবধারণের পার্থক্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর একটা কথাও লক্ষ্য করার আছে। মূল্যবিষয়ক বচনে মূল্যের একটা আদর্শের (ideal) ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু তথ্যবিষয়ক বচনে কোন আদর্শের প্রশ্ন নেই। বক্তব্য উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। 'এটি একটি ফুল'—তথ্যবিষয়ক বচন। এখানে যা দেখেছি, তারই বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে আদর্শ বলে কিছু নেই। কিন্তু যখন বলি

'এ ফুলটি খুব সুন্দর' তখন এখানে বর্ণনা নেই, প্রশংসা আছে। আমাদের মনে যে সৌন্দর্যের আদর্শ আছে, তার সঙ্গে ফুলটির সঙ্গতি লক্ষ্য করেই বলছি, 'এ ফুলটি খুব সুন্দর'। সুতরাং এই মূল্যবিষয়ক বচনের ক্ষেত্রে একটি আদর্শের রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। সেজন্যই মূল্যবিষয়ক বচনকে আদর্শাত্মক (normative) বলা হয়। আমরা মূল্যের আদর্শগুলোরই চরম মূল্য দিয়ে থাকি। অন্য বস্তু যতটুকু পরিমাণে এ আদর্শ রূপায়িত করতে পারে, ততটুকুই তার মূল্য। সত্য, শিব ও সুন্দরকে (Truth, Goodness and Beauty) মূল্যের চরম আদর্শ বলে মনে করা হয়। বুদ্ধির আদর্শ সত্য, কর্মের আদর্শ শিব ও অনুভূতির আদর্শ সুন্দর। মানুষের আদর্শ-জীবন এই তিনি আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ডতা, ছিন্নতা ও প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মানুষের যে ভাব-জীবন তারই নাম আদর্শ-জীবন। মানুষের মনুষ্যত্ব এই আদর্শ-জীবনের ওপরই নির্ভর করে।

মূল্য বিষয়ীগত না বিষয়গত ? (Is Value Subjective or Objective ?)

মূল্য বিষয়ীগত না বিষয়গত—এ প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। **কেউ কেউ মনে করেন, মূল্য সম্পূর্ণরূপেই বিষয়ীগত বা ব্যক্তিগত ব্যাপার।** যার কাছে যখন বস্তুর যে মূল্য ধরা দেয়, তাই বস্তুর মূল্য। সর্বজনগৃহীত কোন মূল্য কোন বস্তুরই নেই। রুচির বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের মূল্যবোধও ভিন্ন হয়। সুতরাং একজনের কাছে যা সুন্দর, আর একজনের কাছে তা কুৎসিতও হ'তে পারে। একজন যা ভাল বলে মনে করেন, আর একজনের কাছে তাই খারাপ ব'লে মনে হয়। কিন্তু একই সঙ্গে একই বস্তু সুন্দর ও কুৎসিত, ভাল ও মন্দ হতে পারে না। সুতরাং সৌন্দর্য প্রভৃতি মূল্য বস্তুগত বা বিষয়গত হতে পারে না ; মূল্য একান্তভাবেই ব্যক্তি-নির্ভর।

কখনও কখনও একই লোকের কাছে বিভিন্ন সময়ে বস্তুর মূল্য বা মান বিভিন্ন বলে মনে হয়।[১] শোকের সময় যে গান ভাল লাগে, আনন্দের সময়

১। উইলিয়ম জেমস তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই বক্তব্য প্রকাশ করতে বলেছেন—'Often we are ourselves struck at the strange differences in our successive viewes of the same thing. The friends we used to care the world for are shrunken to shadows, the women once so divine, the stars, the woods, and the waters, how so dull and common !'

সে গান তৃপ্তি দেয় না। আবার আনন্দের গান শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। বিশেষ সময়ে যা ভাল, অন্য সময়ে তাই খারাপ বলে মনে হয়। সুতরাং ভাল মন্দ প্রভৃতি কখনই বিষয়গত গুণ হতে পারে না। ভাল-মন্দ প্রভৃতি মূল্য বা মানকে ব্যক্তিগত বা বিষয়ীগতই বলতে হয়।

লোট্জা (Lotze) বলেন, মূল্য পরিতৃপ্তির অনুভূতির[১] সঙ্গে জড়িত। যা কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে তাই মূল্যবান। যা সত্য বা শিব বা সুন্দর তা আমাদের আনন্দ দেয়। আনন্দদানের ক্ষমতা দেখেই আমরা বস্তুর মূল্য নিরূপণ করি। পরিতৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। একজন যাতে পরিতৃপ্ত হয় বা আনন্দ পায়, আর একজন তাতে পরিতৃপ্তি বা আনন্দ পায় না। সুতরাং পরিতৃপ্তি ও ব্যক্তি-আনন্দের সঙ্গে জড়িত মূল্যও ব্যক্তিগত ব্যাপার।

স্পিনোজা বলেন,[২] আমরা কোন জিনিস ভাল বলে মনে করে তাকে পেতে চেষ্টা করি না, যে জিনিস পেতে চেষ্টা করি তাকেই ভাল বলে মনে করি। অর্থাৎ, একটি জিনিস পেতে চেষ্টা করলেই তা ভাল হয় বা একটি জিনিসের ভালো তাকে পাওয়ার চেষ্টার ওপরই নির্ভর করে। পাওয়ার চেষ্টা বিষয়ী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে বস্তুর ভালো বা মূল্যও বিষয়ী বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদী বা লজিক্যাল পজিটিভিস্টরাও মূল্যকে বিষয়ীগত বলেন। তাঁদের মতে মূল্যবিষয়ক বচন বিবৃতিমূলক নয় এবং তা সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। অর্থাৎ, মূল্যবিষয়ক বচনে কোন বিবৃতি (assertion) থাকে না। কোন বিবৃতিই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। মূল্যবিষয়ক বচন কোন বিবৃতি নয় বলে তা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। এই জাতীয় বচন আবেগ প্রকাশ করে। লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের মতে 'গোলাপ সুন্দর' এই মূল্য-বিষয়ক বচন বক্তার মনের আবেগ প্রকাশ করে এবং এই বচন 'ওহো কি সুন্দর গোলাপ' এই ভাবে প্রকাশ করলেই যথার্থ হয়। তাঁদের মতে মূল্যবিষয়ক

১। পরিতৃপ্তির অনুভূতি—Feeling of satisfaction ('What we mean by value in the world lies wholly in the feeling of satisfaction or pleasure which we experience from it'—Lotze.)

২। 'In no case do we strive for, wish for, long for or desire anything because we deem it to be good, but on the other hand we deem a thing to be good because we strive for it, wish for it or desire it.'—Spinoza.

বচন আসলে কোন বচনই নয়, কারণ এই বচনের বিধেয়াংশ কোন বাস্তব জিনিস বোঝায় না, বক্তার আবেগ বোঝায়। 'গোলাপ সুন্দর' এই মূল্য-বিষয়ক বচনের বিধেয় 'সুন্দর' গোলাপের কোন বাস্তব গুণ বোঝায় না, গোলাপ সম্বন্ধে বক্তার আবেগ প্রকাশ করে। মূল্য সম্বন্ধে এই মতকে আবেগবাদ (The Emotive theory of value) বলা হয়।

যাঁরা মূল্য বা মানকে বিষয়ীগত বলেন, তাঁদের মতে মূল্য বা মান ব্যক্তি, দেশ ও কালভেদে ভিন্ন হয়। এ যুগের সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণা অন্য যুগে বদলে যাবে। আবার এক দেশের সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণা অন্য দেশে গৃহীত হয় না। সমস্ত ব্যক্তিও সত্য, শিব ও সুন্দর সম্বন্ধে একই ধারণা পোষণ করে না।

অন্য আর একদলের দার্শনিক মনে করেন, মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত ব্যাপার; মূল্য একেবারেই ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভর করে না। তাঁরা বলেন, মূল্য-বোধের জন্য শিক্ষা দরকার। মূল্য যদি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়, তবে মূল্যাবধারণের জন্য কোন শিক্ষারই প্রয়োজন হয় না। মূল্যের সর্বজন-গৃহীত একটা ধারণা প্রচলিত আছে বলেই সে সম্বন্ধে শিক্ষা সম্ভব। মূল্যবোধের শিক্ষা না পেলে মূল্যাবধারণ সম্ভব নয়। সকলেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের মাধুর্য ও বড়ে গোলাম আলি খাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বোঝে না। তা বুঝতে হলে রসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দরকার। সুতরাং মূল্য ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না।

মূল্য যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'ত তবে মহৎ শিল্প, মহৎ সাহিত্য ও মহৎ সঙ্গীত সকলের কাছেই মহৎ বলে মনে হ'ত না। কিন্তু কালিদাস-সেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, রাফেল-পিকাসো-অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও বিটোভেন-পল রবসন-ফয়েজ খাঁর সঙ্গীত নিশ্চয়ই সমস্ত সহৃদয় সমঝদার লোকের কাছেই চিরকাল মহৎ বলে মনে হবে। সুতরাং মূল্য ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

যা ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে তাই মূল্যবান। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা মানুষ সৃষ্টি করে না, তা বস্তুতেই থাকে। যে বস্তুতে সে ক্ষমতা থাকে, তা মূল্যবান বলে মনে হয়; আর যাতে তা থাকে না কারো কাছেই তার কোন মূল্য থাকতে পারে না। সুতরাং মূল্য বিষয়ীগত নয়, বিষয়গত বা বস্তুগতই বটে।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক জি. ই. মূর 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' গ্রন্থে মূল্য-

বিষয়গত (intrinsic), এই মত প্রচার করেছেন। তাঁর মতে মূল্য বিষয়গত হলেও তা বাহ্যবস্তুগত গুণ থেকে ভিন্ন। বাহ্যবস্তুগত গুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; কিন্তু, মূল্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। বাহ্যবস্তুগত গুণ নৈসর্গিক (natural) গুণ, কিন্তু মূল্য বস্তুর কোন নৈসর্গিক গুণ নয়। মূল্য সম্বন্ধে এর বেশী কিছু বলা যায় না। গোলাপের লালিমা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়, কিন্তু গোলাপের সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়বেদ্য নয়। গোলাপের লালিমা যেমন নৈসর্গিক, সৌন্দর্যকে তেমনভাবে নৈসর্গিক বলা যায় না। কোন সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্য উপভোগ করার কেউ না থাকলেও জিনিসটির সৌন্দর্য ঠিকই থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি ইংরেজী কবিতা মনে আসে—

Full many a gem, of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of the ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

দার্শনিক লেয়ার্ড মূল্যবিষয়গত, এই মতের সমর্থকরূপে বলেন, বস্তু অন্যান্য গুণ যেমন ধারণ করে, মূল্যও তেমনি ধারণ করে এবং মূল্য ও বস্তুর গুণের মতই যে কোন সংবেদশীল ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় ('Things possess their value as they possess their other qualities and it is equally evident to any properly sensitized mind'.)

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, যাঁরা মূল্যকে বিষয়ীগত বলেন তাঁদের পক্ষে যেমন অনেক যুক্তি দেওয়া হয়, যাঁরা তাঁদের বিরোধী কথা বলেন তাঁদের পক্ষেও তেমনি অনেক যুক্তি দেওয়া হয়। **তা হলে প্রশ্ন ওঠে—কাদের কথা গ্রহণ করব ? মূল্যকে বিষয়ীগত বলব না বিষয়গত বলব ?** আমাদের মনে হয়, মূল্য বিষয়ীগতও বটে আবার বিষয়গতও বটে। কেন, তা আলোচনা করা দরকার।

লোট্জা বলেছেন, মূল্য পরিতৃপ্তির অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ; যা কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে তা-ই মূল্যবান। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা যদি বস্তুতে না থাকে তবে বস্তু কি ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে ?

যে জিনিস আমরা পেতে চেষ্টা করি স্পিনোজা তাকেই ভাল বলেছেন। কিন্তু আমরা যে একটি জিনিস পেতে চেষ্টা করি এবং অন্য জিনিস পেতে চাই

না তার কারণ কি? কারণ কি একান্তভাবেই আমাদের খেয়াল খুশি? মনে হয় না। যদি তা-ই হতো তবে যে জিনিস পেতে চেষ্টা করি তা পেতে চেষ্টা নাও করতে পারি। তা কি হয়? এতেই বোঝা যায় মুখে যা-ই বলি না কেন, আসলে যা পেতে চাই তার মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য তা পেতে চাই এবং তার নামই মূল্য।

লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা মূল্যবিষয়ক বচন কোন বচনই নয়, আবেগের প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, তাঁরা মূল্যবিষয়ক বচন ও যে তথ্য-বিষয়ক বচনের মতই সর্বজনের সমর্থন দাবী করে, এদিকটি উপেক্ষা করেছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের আবেগ সর্বজনের সমর্থন দাবী করে, একথা বলার কোন অর্থ হয় না। কোন ব্যক্তি যখন গোলাপকে সুন্দর বলে তখন সকলেই একথা স্বীকার করবে, এমন দাবীও সে করে। সে মনে করে, গোলাপ লাল, একথা বললে যেমন সকলের সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় গোলাপ সুন্দর বললেও তেমনি আশা করা যায়।

ওপরের এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মূল্য একান্তভাবেই বিষয়ীগত এমন বলা যায় না। তবে মূল্যের ক্ষেত্রে বিষয়ীর কোন অবদানই নেই, এমন নয়। মূল্যায়ন করার জন্য কোন ব্যক্তি না থাকলে মূল্য নিরর্থক হয়। তবে বস্তুতে যদি মূল্য না থাকে তবে মূল্যায়নও সম্ভব নয়।

লেয়ার্ডে'র মত যাঁরা মূল্যকে একান্তভাবে বিষয়গত বলেন তাঁরা মূল্যের ক্ষেত্রে বিষয়ীর অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এ মতও গ্রহণ করা যায় না। যখন একটি কাজকে ভাল বলি তখন কাজটির মধ্যে 'এমন কিছু' আছে যার জন্য তাকে ভাল বলি। কিন্তু, এই যে 'এমন কিছু' তা বুঝবার বা জানবার ক্ষমতা যে ব্যক্তির নেই সে কাজটিকে ভাল বলতে পারে না। মূল্যের জন্য যেমন বিষয়গত চমৎকারিত্ব থাকা চাই, তেমনি তা বুঝবার ব্যক্তি-গত ক্ষমতাও থাকা চাই। আকাশে নিশ্চয়ই এমন চমৎকারিত্ব আছে যার জন্য তা সুন্দর, কিন্তু যে ব্যক্তির তা দেখবার চোখ নেই, বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তাকে সুন্দর দেখে না, সুন্দর বলে বোঝেও না। আসলে মূল্য বিষয়-গত এবং বিষয়ীগত উভয়ই। অর্থাৎ, মূল্যের যেমন একটা বিষয়গত দিক আছে, তেমনি আবার একটা বিষয়ীগত দিক আছে। মূল্যের একটা বিষয়-গত দিক আছে বলেই মূল্যবিষয়ে শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। আবার একটা বিষয়ীগত দিক আছে বলে সর্বত্রই শিক্ষা সার্থক হয় না। যে ব্যক্তির

অন্তরে সুর নেই তাকে যতই সুর শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, সুরবোধ তার কখনই দোষমুক্ত হয় না। মূল্যের একটা বিষয়ীগত দিক আছে বলেই বিষয়ীর রুচি, প্রকৃতি ও মানসিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকমের মূল্যায়ন হয় এবং ফলে ব্যক্তিভেদে মূল্য ভিন্ন, এমন মনে হয়।

মূল্য যে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত তা অন্যভাবেও বোঝা যায়। মানুষের রুচির ওপর বস্তুর মূল্য নির্ভর করে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষের রুচির একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আছে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত রুচিকে সেই সর্বজনগ্রাহ্য রুচির স্তরে উন্নীত করা যায়। আর তা করা যায় বলেই সার্থক শিল্পী ও সাহিত্যিকের আবেদন কোন দেশে ও কোন কালেই ব্যর্থ হয় না। যদি মূল্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'ত, তবে দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কোন মূল্যের কথাই ভাবা যেত না। কিন্তু সাহিত্যে ও সঙ্গীতে দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ মূল্যের কথা সকলেই স্বীকার করে। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে, মূল্য ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভরশীল হলেও সর্বজনগ্রাহ্য। যা সর্বজনগ্রাহ্য তাকেই বিষয়গত বলা যায়। সুতরাং মূল্য ব্যক্তিগত হলেও বিষয়গত। কথাটা অন্যভাবেও বোঝান যেতে পারে। কোন সার্থক শিল্পী বা সাহিত্যিক আপনার ব্যক্তিগত রুচিবোধ দিয়ে পরিচালিত হয়ে যে শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তা সকলকেই তৃপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসব কবিতার মূল সুরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের সুরেরও মিল আছে, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আমরা আনন্দিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হই। সুতরাং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনগ্রাহ্য। যেহেতু এ অনুভূতি সর্বজনগ্রাহ্য, সেজন্য তাকে বিষয়গতও বলা যেতে পারে। মূল্যও অনুরূপভাবে ব্যক্তিমনের ওপর নির্ভরশীল হলেও সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিষয়গত। সেজন্যই সাহিত্যিক ও শিল্পী যে মূল্য সৃষ্টি করেন, তা সকলের কাছেই সহজ স্বীকৃতি পায়।

দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার মূল্যকে একই সঙ্গে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মূল্যেরই দুটি দিক—বিষয়ীগত এবং বিষয়গত, মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তি এবং মূল্যযুক্ত বস্তু (In every value, there are two sides, the subject of valuation and the object of value, and the value resides in the relation between the two, and does not exist apart from them, the object has

value as possessed by the subject and the subject has value as possessing the object'—Space, Time and Deity, Vol II, p 302)

মান বা মূল্যের শ্রেণীবিভাগ
(Different Types of Values)

স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Intrinsic and Extrinsic Values)

সাধারণতঃ বস্তুর মূল্য দুরকম ভাবে বোঝা যায়। কতকগুলো জিনিসের নিজস্ব মূল্য আছে, আর কতকগুলো জিনিসের নিজস্ব মূল্য না থাকলেও অন্য মূল্যলাভের সহায়ক বলে তাদের মূল্যবান মনে করা হয়। টাকা পয়সার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্ভব বলেই আমরা এদের মূল্য স্বীকার করি। যাদের নিজস্ব কোন মূল্য নেই কিন্তু যারা অন্য মূল্যের সহায়ক বলে মূল্যবান রূপে পরিগণিত হয়, তাদের মূল্যকে পরতঃমূল্য বলে।

বিদ্যা কিন্তু টাকা পয়সার মত নয়। পাকিস্তানের টাকা হিন্দুস্থানে চলে না। কিন্তু যে কোন দেশের বিদ্বান ব্যক্তি অন্য যে কোন দেশে সম্মানিত হন। সুতরাং বিদ্যার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এ-মূল্য অন্য কোন মূল্যের ওপর নির্ভর করে না। বিদ্যার মত যাদের নিজস্ব মূল্য আছে, তাদের মূল্যকে স্বতঃমূল্য বলা হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরকে স্বতঃমূল্যবান বলে সবাই স্বীকার করেন। সত্য, শিব বা সুন্দর দিয়ে কোন কিছু না পাওয়া গেলেও তাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সত্য সত্য বলেই মূল্যবান, শিব শিব বলেই এবং সুন্দর সুন্দর হওয়ার জন্যই।

বিভিন্ন বিষয়ক মূল্য

(১) **দৈহিক মূল্য** (Physical Values) :

আমাদের দেহের একটা মূল্য আছে। কালিদাস বলেছেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। এখানে প্রশ্ন ওঠে—দেহের মূল্য কি? স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা প্রভৃতিই দেহের মূল্য। সেজন্যই অনেকে দৈহিক নির্যাতনকে পাপ বলে মনে করেন। দেহের ওপর নির্যাতন করলে দেহের মূল্য অস্বীকার করা হয়। সুতরাং দৈহিক নির্যাতন কোন নৈতিক আদর্শ হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, আত্মিক পরিপূর্ণতা উপলব্ধির জন্য দেহের মূল্য স্বীকার করতে হয়। দেহধারী দেহের বন্ধনের মধ্য দিয়েই মহানন্দময়

আত্মিক পরিপূর্ণতার মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। বৈরাগ্য সাধনায় যে মুক্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে মুক্তির পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় না। দেহের বন্ধনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাতেই মুক্তির পূর্ণস্বাদ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং এদিক থেকেও দেহের মূল্য আছে।

(২) অর্থনৈতিক মূল্য (Economic Value) ঃ

বস্তুর অর্থনৈতিক মূল্য সামাজিক জীবনে পারস্পরিক লেনদেনের ওপর নির্ভর করে। কোন বস্তু দিয়ে অন্য যতটা বস্তু পাওয়া যায় তাই প্রথম বস্তুর অর্থনৈতিক মূল্য। আজকের দিনে অবশ্য বিশেষভাবে অর্থেরই অর্থ-নৈতিক মূল্য স্বীকার করা হয়। কারণ অর্থের বিনিময়ে আমরা অনেক জিনিসই পেতে পারি। তবে যারই বিনিময় মূল্য আছে তারই অর্থনৈতিক মূল্য আছে। অর্থনৈতিক মূল্য বস্তুর স্বতঃমূল্য নয়; কারণ অন্য বস্তুর বিনিময়ের ওপরই তার মূল্য নির্ভর করে। অর্থনৈতিক মূল্যকে পরতঃমূল্য বলা হয়।

(৩) মানসিক মূল্য (Psychical Value) ঃ

সাধারণতঃ মনের তিনটি বৃত্তি স্বীকার করা হয়। চিন্তা, অনুভূতি ও কৃতি (thinking, feeling and willing)—মনের এই তিন বৃত্তি। মানব-মনের এ তিন বৃত্তির আদর্শ রূপে আমরা যথাক্রমে সত্য, সুন্দর ও শিবকে পাই। এজন্যই সত্য (Truth), শিব (Goodness) ও সুন্দরকে (Beauty) মানসিক মূল্য বলা হয়। চিন্তার আদর্শ-মূল্যের নাম সত্য, অনুভূতির আদর্শ-মূল্যকে বলে সুন্দর, আর কৃতির বা কর্মের আদর্শ-মূল্যের নাম শিব। সত্য, শিব ও সুন্দরের নিজস্ব মূল্য আছে। সত্যকে সত্য বলেই আমরা শ্রদ্ধা করি, শিবের প্রতিষ্ঠা শিব বলেই। সুন্দরের সার্থকতা অর্থোৎপাদনে নয়, নিজের মধ্যেই। সে জন্যই সত্য, শিব ও সুন্দরকে স্বতঃমূল্য বলা হয়।

(ক) চিন্তার মূল্য (Intellectual Value) :

চিন্তার আদর্শকে সত্য বলা হয়। চিন্তার সত্যতার ওপরই চিন্তার মূল্য নির্ভর করে। যে চিন্তা সত্য, সে চিন্তাই মূল্যবান, আর যে চিন্তার সত্যতা নেই, সে চিন্তার কোন মূল্যও নেই। এখানে প্রশ্ন ওঠে, চিন্তার সত্যতা বলতে আমরা কি বুঝি? অষ্টম অধ্যায়ে আমরা সত্যতার প্রকৃতি ও পরীক্ষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে,

বিষয়ানুরূপতাই বস্তুর সত্যতা ; সম্বাদ, অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও আত্মার ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রমাণ সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

(খ) কৃতির বা কর্মের মূল্য (Volitional Value) :

শিবকে (Goodness) কৃতি বা কর্মের আদর্শ রূপে গণ্য করা হয়। যে কর্মে যতটুকু পরিমাণে শিবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সে কাজ ততটুকু মূল্যবান। অর্থাৎ কর্মের মূল্য কর্মের মধ্যে শিবের প্রকাশের মাত্রার ওপরই নির্ভর করে। শিবের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, দৈহিক সুখই শিব (Pleasure is good)। অন্য কারও কারও মতে, দেহের দাবী অস্বীকার করে আত্মার নির্দেশে চলাই শিব-প্রাপ্তির একমাত্র পথ। তৃতীয় দলের লোক দেহ ও আত্মার পরিপূর্ণ সঙ্গতিকেই শিব বলেন। আত্মা যখন দেহের বন্ধনের মধ্য দিয়ে আপনার মুক্তি খুঁজে পায়, তখনই সত্যিকারের শিব-প্রাপ্তি ঘটে। সাধারণতঃ শিবের এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা হয়।[১]

(গ) অনুভূতির মূল্য (Emotional Value) :

সুন্দরকে অনুভূতির আদর্শ বলা হয়। সুন্দরই অনুভূতির লক্ষ্য। যে অনুভূতি যতটুকু পরিমাণে সুন্দরকে প্রকাশিত করতে পারে, তার ততটুকুই মূল্য। এখানে প্রশ্ন ওঠে—জগতে সুন্দর বলে কিছু আছে কি? না মানুষ আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সুন্দরকে সৃষ্টি করে? অর্থাৎ সুন্দর কি কোন বস্তুগত ব্যাপার, না তা সম্পূর্ণরূপেই মানুষের মনের সৃষ্টি? এসব প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্য জগতেই আছে, মানুষ তা উপলব্ধি করে মাত্র। আবার কারও কারও মতে, সৌন্দর্য জগতে নেই, আছে মানুষের মনে আর চোখে। এ দু' দলের বক্তব্যই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

যাঁরা বলেন সৌন্দর্য বস্তুগত, ব্যক্তিগত নয়, তাঁদের কথা আগে অনুধাবন করা যাক। তাঁরা বলেন, আকাশের নীলিমায়, ভোরের অরুণ আলোতে, সদ্য-ফোটা শিউলি ফুলের শুভ্রতায় যে সৌন্দর্য আছে, তা কোন মানুষ সৃষ্টি করেনি। কোন মানুষের মনের ওপরও এ সৌন্দর্য নির্ভর করে না। সুন্দর আছে, তাই তাকে দেখি। জগৎ জুড়ে সুন্দরের খেলা।

১। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার জন্য J. Seth রচিত A study of Ethical Principles নামক গ্রন্থ থেকে Moral standardsগুলো পাঠ করা দরকার।

দেখতে জানলেই তাকে দেখা যায়। দেখার আগেও সুন্দর থাকে, দেখার পরও সুন্দর থাকবে। আমার সুন্দরের জ্ঞান আমার দেখার ওপরই নির্ভর করে, কিন্তু সুন্দরের অস্তিত্ব দেখার ওপর নির্ভর করে না। আমি যা জানি না, আমি যা কখনও দেখিনি তাও অনায়সে সুন্দর হতে পারে।

তাঁরা আরও বলেন, সুন্দর যদি আমার ওপর নির্ভর করত তবে মহৎ শিল্পের সৌন্দর্য ত সবাই উপলব্ধি করতে পারত না। সুন্দর বস্তুগত বলেই বিভিন্ন লোকের কাছে একই বস্তুর সৌন্দর্য ধরা দেয়। অজন্তা ইলোরার চিত্রসম্ভার আজ পর্যন্ত কারও কাছে অসুন্দর বলে ত মনে হয়নি। সুতরাং অজন্তা ইলোরার চিত্রের মধ্যেই সৌন্দর্য আছে, একথা মানতেই হবে। মানুষ তা দেখে সুন্দর বলছে বলেই তা সুন্দর নয়। মানুষ যদি তা না দেখত তবুও তা সুন্দরই থাকত।

আমাদের মনে হয়, এ মতবাদ খানিকটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। জাতিতে জাতিতে, নবীনে প্রবীণে, একালে সেকালে সৌন্দর্য যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। কালী মায়ের কালোরূপের আলো দেখে ভক্ত যখন মুগ্ধ হন, কোন বিদেশী হয়ত তখন তাকে বীভৎস বলে অবজ্ঞা করে। উড়িষ্যায় মন্দিরগাত্রের খোদিত মূর্তি দেখে কেউ কেউ তৃপ্ত হন, আবার পশ্চিমের কোন কোন লোক তাদের চরম অসুন্দর বলে সমালোচনা করেন। সুতরাং সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিষয়গত, তা বলা যায় না।

কিন্তু তা বলে যাঁরা সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করেন, তাঁদের কথাও সত্যি নয়। তাঁদের মতে বস্তুতে সৌন্দর্য বলে কিছু নেই, মানুষ যাকে সুন্দর বলে তাই সুন্দর, আর মানুষ যাকে অসুন্দর বলে তাই অসুন্দর। মানুষই নিজের মনের মাধুর্য দিয়ে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।

যাঁরা বলেন, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁদের কথা এর চেয়ে সুন্দর করে আর প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, এ মতবাদও খানিকটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। সৌন্দর্য খানিকটা মানুষের মনের রঙে রঙিন হয়, তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সুন্দর সম্পূর্ণরূপেই মানুষের মনের সৃষ্টি, তাও মানা যায় না। আমি আকাশের দিকে চোখ মেললুম বলেই আলো জ্বলে উঠল, আর গোপালকে সুন্দর বললুম বলেই তা সুন্দর হল—একথা মানা মুশকিল। আমরা বলতে পারি, আকাশে আলো ছিল, আমার মনের আলো লেগে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু যেখানে একেবারেই আলো নেই, সেখানে শুধু মনের আলো কোন আলোই সৃষ্টি করতে পারে না। গোলাপ স্বভাবতঃই সুন্দর, মানুষের রঙিন মনের পরশ পেয়ে তার সৌন্দর্য আরও একটু মধুর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অসুন্দর গোলাপ কখনই মানুষের মনের স্পর্শ পেয়ে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং সুন্দরকে খানিকটা পরিমাণে বস্তুগত আর খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তিগতই বলতে হয়। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বস্তু ও ব্যক্তি উভয়েরই অবদান আছে। নির্মেঘ নীল আকাশে যে সন্ধ্যাতারা নিঃসঙ্গ একাকী জ্বলছে, তার নিঃসঙ্গতার এমনিতেই একটা সৌন্দর্য আছে। কবি-মনের ছোঁয়া লেগে তা আরও সুন্দর, আরও সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। গায়কের কণ্ঠে যে সুরের মূর্ছনা দেখা দেয়, তা শ্রোতার অন্তর-রসে রসসিক্ত হয়ে পরিপূর্ণ রূপ নেয়। বস্তুর সৌন্দর্য যেন অন্ধ। মানুষ যেন তার কল্পনার শলাকা দিয়ে এ অন্ধতা ঘুচিয়ে দেয়। অন্ধ না থাকলে ত আর তার দৃষ্টি দেওয়া যায় না। আবার দৃষ্টি দিতে গেলে শিল্পীর শলাকাও দরকার। সুতরাং সৌন্দর্যের চক্ষুষ্মান্ রূপের জন্য বস্তু ও মনের কল্পনা উভয়ই দরকার। সাধারণতঃ বলা হয়, বস্তুর গঠন-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য, উপাদানের ঐক্য ও গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে উপাদানের সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের বস্তুগত ভিত্তি। এ ভিত্তিতে যখন রসিক মনের পরশ লাগে তখনই সৌন্দর্যের ইমারৎ দাঁড়িয়ে যায়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা উদ্ধার করেই আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। তিনি বলেন, "সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণি-দর্পণ তার যোগাযোগ

অবিচ্ছেদ্য হ'ল ; তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিস, চশমার কাঁচে আঁচড় পড়ল চোখ রইল পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি পড়ল চশমা রইল ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।"

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের চিন্তার আদর্শ সত্য, কৃতি বা কর্মের আদর্শ শিব আর অনুভূতির আদর্শ সুন্দর। লক্ষণীয় এই যে, মানুষের জীবনের এই তিনটি আদর্শ নিয়ে তিনটি আদর্শ বিজ্ঞান (Normative Science) গড়ে উঠেছে। যে আদর্শ-বিজ্ঞান সত্য নিয়ে আলোচনা করে তার নাম ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কবিজ্ঞান। যে আদর্শ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শিব, তার নাম নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিজ্ঞান। আর যে আদর্শ-বিজ্ঞান সুন্দরকে নিয়ে আলোচনা করে তার নাম কান্তিবিদ্যা বা রসশাস্ত্র (Aesthetics)। আমরা এখন তত্ত্বের সঙ্গে মানব-জীবনের এই তিনটি আদর্শের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

মূল্য ও তত্ত্ব (Value and Reality)

মান বা মূল্যের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক কি, তা আলোচনা করা দরকার। বিভিন্ন দার্শনিক এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন।

(১) কারও কারও মতে মান বা মূল্য তত্ত্বের চেয়ে উচ্চস্তরের ; আদর্শ বাস্তবের চেয়ে মহত্তর ও উন্নততর। প্লেটোকে এ মতবাদের সমর্থক বলা যায়। প্লেটোর দর্শনে ধারণাই তত্ত্ব। বস্তু ধারণার ছায়া মাত্র। ধারণাগুলোর মধ্যে শিবের ধারণা (The Idea of Good) সব চেয়ে উচ্চস্তরের। সুতরাং শিব সাধারণ তত্ত্বের চেয়ে বড়। শিব যে এক মূল্য বা আদর্শ তা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং প্লেটোর দর্শনে আদর্শকে তত্ত্বের চেয়ে বড়ই বলা হয়েছে। আধুনিক কালে রিকার্ড (Rickard)-ও তত্ত্বের চেয়ে মান বা মূল্যকে বড় বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন, মূল্য আদর্শ হিসেবে তত্ত্বের চেয়ে উচ্চতর, মহত্তর ও উন্নততর।

আমাদের ধারণা, মূল্য বা মান মানুষের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই সার্থকতা লাভ করে। মানুষের আদর্শকে তত্ত্বের চেয়ে বড় বলার মধ্যে মানুষের অহমিকা প্রকাশ পায়। দুনিয়ায় মানুষের আদর্শকেই সবচেয়ে বড় বলার বিশেষ কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তত্ত্ব মানুষের আদর্শ দিয়ে

নিয়ন্ত্রিত হবে, এ ত মানুষের ঐকান্তিক বাসনামাত্র। মানুষের বাসনা অনুসারেই বস্তু রূপ নেবে, এমন কথা ভাবার পেছনে কোন সঙ্গত যুক্তি আছে কি ?

(২) পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ব্র্যাড্‌লি বলেছেন, মান বা মূল্যের ধারণার মধ্যে স্ব-বিরোধ (self-contradiction) আছে। যা স্ব-বিরোধযুক্ত তাকে তত্ত্ব বলা যায় না। যা স্ববিরোমুক্ত তা-ই তত্ত্ব। সুতরাং মান বা মূল্যের কোন তাত্ত্বিক সত্তা নেই। মান বা মূল্য আভাস মাত্র (appearance)। অবশ্য ব্র্যাড্‌লি বলেন, সব আভাসই চরম তত্ত্বে একটু পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মূল্যের ধারণার মধ্যে স্ব-বিরোধ দেখাতে গিয়ে ব্র্যাড্‌লি বলেছেন, মূল্য কল্পনামাত্র নয়, সুতরাং তাকে অস্তিত্বহীন বলা যায় না। আবার টেবিল চেয়ারের মত মূল্য দেশ-কাল জুড়ে আছে, এমন কথাও বলা যায় না। সুতরাং মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন হতে পারে না। কাজেই মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন ও অস্তিত্বসম্পন্ন নয়—এমন অদ্ভুত স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সুতরাং মূল্যের তাত্ত্বিক সত্তা স্বীকার করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, মূল্যের ধারণার মধ্যে কোন স্ববিরোধই নেই। 'মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন আর অস্তিত্বহীন' এই কথার মধ্যে 'অস্তিত্ব' শব্দটি দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যদি তারা একই অর্থে ব্যবহৃত হত, তবে চিন্তা-বিরোধ দেখা দিত। কিন্তু যেহেতু 'অস্তিত্বসম্পন্ন' শব্দে 'অস্তিত্ব' বলতে যুক্তিগ্রাহ্যতা ও 'অস্তিত্বহীন' শব্দে 'অস্তিত্ব' বলতে দেশে কালে স্থিতি বুঝিয়েছে, সুতরাং এখানে কোন চিন্তা-বিরোধ দেখা দেয়নি। কাজেই মূল্যকে এ যুক্তিতে আভাসমাত্র বলা যায় না। আর তর্কের খাতিরে স্ব-বিরোধযুক্ত মূল্যকে আভাস বলে ধরে নিলেও তা কি করে স্ব-বিরোধমুক্ত তত্ত্বে থাকে তা আমরা বুঝি না। যা স্ব-বিরোধযুক্ত তা কি করে স্ব-বিরোধমুক্ত তত্ত্বে থাকতে পারে ? সুতরাং এদিক থেকেও ব্র্যাড্‌লির বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(৩) হেগেলের বক্তব্য অনুসরণ করে রয়েস্ বলেছেন, চরমতত্ত্বেই মানুষের সব মূল্য ও আদর্শ পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। মানুষ সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ কখনও জীবনে সম্পূর্ণ রূপায়িত করতে পারে না। তাদের সীমিত ক্ষমতাই না পারার কারণ। আবার এই আদর্শগুলো কোথায়ও বাস্তবায়িত না হলে এদের তাৎপর্য এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। সেজন্য মানুষ চিন্তা করে যে সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম ঈশ্বরের মধ্যে এই আদর্শগুলো বাস্তবরূপে

থাকে।[১] ঈশ্বরই চরমতত্ত্ব বলে চরমতত্ত্বে এই সমস্ত আদর্শ বা মূল্য সার্থক হয়, এমন কথা বলা যায়। ঈশ্বর সত্য, শিব ও সুন্দরের জাগ্রত প্রতিমূর্তি।

ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমের জীবনে মানুষের আদর্শ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, একথা স্বীকার না করলে মানবিক আদর্শ যে নিছক কল্পনা নয়, তাৎপর্যপূর্ণ, তা প্রদর্শন করা অসম্ভব। ঈশ্বরের মধ্যে আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আদর্শ যে কল্পনামাত্র নয় তা-ই নির্দেশ করে। আরও কথা, আমরা মূল্য বা আদর্শ বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উভয়ই বলে উল্লেখ করেছি। হেগেল, রয়েস্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা চরমতত্ত্বকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ই চরমতত্ত্বের প্রকাশ বলে স্বীকৃত হয় এবং চরমতত্ত্ব বিষয় ও বিষয়ীগত হয়েও তাদের অতীতও হয়। এই দিক থেকেও বিষয়গত এবং বিষয়ীগত মূল্য বিষয় ও বিষয়ীর মতই তত্ত্বের মধ্যেই বর্তমান, একথা বলা যায়। এই তত্ত্বই ঈশ্বর। অবশ্য ঈশ্বরতত্ত্বই চরমতত্ত্ব কি-না এবং ঈশ্বরতত্ত্বকে অতিক্রম করে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্ভব কি-না এবং তা-ই চরমতত্ত্ব কি-না, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ব্র্যাড্‌লি ব্রহ্মকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেননি। তাঁর মতে ব্রহ্মই চরমতত্ত্ব এবং ঈশ্বর ব্রহ্মের আভাসমাত্র। মূল্য সম্বন্ধে ব্র্যাড্‌লির বক্তব্য আমরা পূর্বেই খণ্ডন করেছি। ভারতীয় দর্শনে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলে ঈশ্বরকেও মিথ্যা বলেছেন। তাঁর মতে সাধক সাধনার মধ্য দিয়ে এমন এক স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং এমন এক পারমার্থিক দৃষ্টি লাভ করতে পারেন যাতে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং অন্য সমস্ত মিথ্যা বলে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বর, মূল্য, জগৎ সবই মিথ্যা হয়ে যায়। এই অবস্থায় চরম সত্তায় মূল্যের স্থান আছে, একথা বলার কোন অর্থ হয় না। তবে আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে জানি। এই ঈশ্বরকে সত্য, শিব ও সুন্দর বলেই গ্রহণ করা হয়।

১। হেগেলপন্থী কেয়ার্ড বলেন, 'There is ever a boundless beyond, which though a possible, is never for us an actual possession. The perfect unity of ideal and the actual is never reached by us. But we are progressively becoming that which is possible for us to be—we never enter into full possession of what is as spiritual beings our rightful inheritance. But in the very fact that we know and cherish the ideals is to us the revelation of the infinite.

সাধারণ লোক ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই দেখে। পারমার্থিক দৃষ্টি সহজলভ্য নয়। সুতরাং সাধারণভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে চরমতত্ত্ব ঈশ্বর এবং তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর বললে এমন কিছু দোষের হয় না। আমরা পারমার্থিক দৃষ্টির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত রেখেই এই বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।[১]

১। শঙ্করাচার্যের মতের জন্য বর্তমান লেখকের 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থটি পাঠের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তত্ত্ব-সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ—বহুতত্ত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

(The Different Theories of Reality—Pluralism, Dualism and Monism)

তত্ত্বের প্রকৃতি (The Nature of Reality) :

জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাদান ও মূল্যাবধারণ দার্শনিকের কাজ। কোন না কোন নিয়ম বা তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেজন্যই দার্শনিক-ব্যাখ্যা তত্ত্ব ভিন্ন হ'তে পারে না।[১] তত্ত্বের প্রকৃতি কি এবং সংখ্যা কত তা নির্ণয়

১। তত্ত্বকে সত্তাও বলা যায়। তত্ত্ব বা সত্তাকে সত্যও বলা হয়। দার্শনিকেরা তত্ত্ব বা সত্তা বা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁদের এই চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়, আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি বা জানি তা-ই তত্ত্ব বা সত্তা বা সত্য নয়। যদি তা হ'ত তবে তা আবার নির্ণয় বা উদ্ঘাটনের প্রশ্ন উঠতো না। আমরা সাধারণত: বলি যা কিছু চকচক্ করে তা-ই সোনা নয়, অর্থাৎ বস্তুর প্রতিভাতরূপ (Appearance) এবং আসলরূপ (Reality)-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। একথা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সকলেই স্বীকার করেন। দার্শনিকেরা যখন তত্ত্ব-নির্ণয় বা সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন তখন তাঁরা এই আসলরূপকে প্রতিভাতরূপ থেকে আলাদা করে বুঝতে চান। সেজন্যই দেখা যায় যে, দার্শনিকদের কাছে **তত্ত্ব ও তার প্রকাশ বা বস্তুর আসলরূপ এবং তার প্রতিভাতরূপ (Appearance and Reality)** গভীর আলোচনার বিষয়। দার্শনিকেরা প্রতিভাতরূপ ও আসলরূপের প্রকৃতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনেকে প্রতিভাতরূপকে তত্ত্বের প্রকাশ এবং সত্যপ্রকাশ বলে গ্রহণ করেন (হেগেল প্রভৃতি), অনেকে আবার প্রতিভাতরূপকে স্ব-বিরোধযুক্ত এবং মিথ্যা মনে করেও তত্ত্বের মধ্যেই অবস্থিত বলে মনে করেন (ব্র্যাড্‌লি), অনেকে প্রতিভাতরূপকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বর্জন করেন এবং তত্ত্বে তার কোন স্থান নেই বলে মত প্রকাশ করেন (শঙ্করাচার্য) আবার অনেকে প্রতিভাতরূপের সমাহারকেই তত্ত্ব বলেন (রাসেল তাঁর জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে)। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা রাসেলের **Problems of Philosophy, Our Knowledge of the External World,** টেলরের **Elements of Metaphysics,** ব্র্যাড্‌লির **Appearance and Reality,** ডি. এম. দত্তের **The Chief Currents of Contemporary Philosophy** প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে তৃপ্তি পাবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। আমরা বলেছি, তত্ত্বকে সত্যও বলা হয়। এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি, হেগেল ও হেগেলপন্থীরা সত্যের মাত্রাভেদ (Degrees of Truth) স্বীকার করেন। যাঁরা সত্যের মাত্রাভেদ মানেন তাঁরা **তত্ত্বের বা সত্তারও মাত্রাভেদ (Degrees of Reality)** মানেন। তাঁদের মূলকথা এই যে, বিভিন্ন সসীম বস্তু অসীমতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ, তবে সব সসীম বস্তুতে তত্ত্বের প্রকাশ সমান নয়, সুতরাং অসীমতত্ত্বের প্রকাশের তারতম্য অনুসারে তত্ত্বের মাত্রাভেদ স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার জন্য উৎসাহীরা টেলরের **Elements of Metaphysics,** ডি. এম. দত্তের **The Chief Currents of Contemporary Philosophy** বা ব্র্যাড্‌লির **Appearance and Reality** পাঠ করবেন।

করা দার্শনিকদের কাজ। তত্ত্বের প্রকৃতি-প্রসঙ্গে তিনটি মতবাদ প্রচলিত। একটির নাম জড়বাদ (Materialism), দ্বিতীয়টি অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) এবং তৃতীয়টি মধ্যমতত্ত্ববাদ (Neutral Theory)। জড়বাদীদের মতে জগৎ ও জীবনের চরমতত্ত্ব জড়। অধ্যাত্মবাদীদের মতে চৈতন্য বা অধ্যাত্মতত্ত্বই চরমতত্ত্ব। মধ্যমতত্ত্ববাদ অনুসারে বিশ্বের চরমতত্ত্ব জড়ও নয়, চেতনও নয়, মধ্যমপ্রকার (Neutral)। অধ্যাত্মবাদীদের কথা আমরা ভাববাদ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করেছি। জড়বাদও আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মধ্যম-তত্ত্ববাদ আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

তত্ত্বের সংখ্যা কত ? (How many reals are there ?)

তত্ত্বসম্পর্কিত আর একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন—তত্ত্বের সংখ্যা কত? দর্শনিকেরা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন সমাধানে এসে পৌঁছেছেন। কোন কোন দার্শনিক বলেন, তত্ত্ব অনেক। এঁদের বহুতত্ত্ববাদী (Pluralists) বলা হয় এবং এঁদের মতবাদ বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism) নামে পরিচিত। বহুতত্ত্ববাদ-এর দুই রূপ—জড়াত্মক (Materialistic) এবং অধ্যাত্মমূলক (Spiritual)। পরমাণুবাদীরা (Atomists) জড়াত্মক বহুতত্ত্ববাদী। লাইব্‌নিজ অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদী। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকেও অধ্যাত্ম-মূলক বহুতত্ত্ববাদী বলা যায়। অনেকেশ্বরবাদীরাও (Polytheists) অধ্যাত্ম-মূলক বহুতত্ত্ববাদী।

আমরা নবম অধ্যায়ে জড় ও জড়বাদ প্রসঙ্গে জড়াত্মক বহুতত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে ভাববাদ আলোচনাকালে লাইব্‌নিজ ও প্লেটোর অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদ বিশ্লেষণ করেছি। অনেকেশ্বরবাদও যোড়শ অধ্যায়ে ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আমরা এ অধ্যায়ে শুধু দার্শনিক জেমসের বহুতত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করবো। ভারতীয় দর্শনে ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকেরা বহুতত্ত্ববাদী। আমরা তাঁদের কথা আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

অনেক দার্শনিকের মতে তত্ত্বের সংখ্যা বহু নয়, দুই। এঁদের দ্বৈতবাদী (Dualists) বলা হয়। দ্বৈতবাদীদের মত দ্বৈতবাদ (Dualism) নামে খ্যাত। গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস-এর চিন্তায়, দার্শনিক ডেকার্টের মতে এবং ভারতীয় সাংখ্য দর্শনে দ্বৈতবাদ প্রচারিত। এঁদের সকলের মতেই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে একটি অধ্যাত্মমূলক (Spiritual) এবং অন্যটি জড়াত্মক

(Material)। দ্বীশ্বরবাদীরাও (Ditheists) দ্বৈতবাদী। এঁদের মতে দুইটি তত্ত্বই ঈশ্বর বলে চৈতন্যস্বভাব (Spiritual)। আমরা ষোড়শ অধ্যায়ে এঁদের কথা আলোচনা করেছি। সাংখ্যদর্শনের বক্তব্য পাওয়া যাবে আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে। আমরা এ অধ্যায়ে অ্যানাক্সাগোরাস ও ডেকার্টের দ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বহু দার্শনিকের মতে তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। এঁদের অদ্বৈতবাদী (Monists) বলা হয়। অদ্বৈতবাদীদের মত অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। অদ্বৈতবাদের তিনটি রূপ—জড়বাদী (Materialistic), অধ্যাত্মবাদী (Spiritualistic) এবং মধ্যপন্থী (Neutral)। আমরা পূর্বেই জড়বাদ আলোচনা করেছি।

অধ্যাত্মমূলক অদ্বৈতবাদ দ্বিবিধ—কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। আচার্য শঙ্কর ভারতীয় দর্শনে অনেকটা এ মতই প্রচার করেছেন, তবে স্পিনোজার সঙ্গে শঙ্করের পার্থক্যও সুস্পষ্ট। স্পিনোজার মতে জগৎ সত্য না মিথ্যা, এ নিয়ে মতভেদ আছে। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা এবং এ নিয়ে কোন মতভেদের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হেগেল, কেয়ার্ড, রয়েস্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা এবং ভারতীয় দর্শনে রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। আমরা এ অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-এর আলোচনা আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

রাসেল জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে এবং কোন কোন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (Neo-realists) তত্ত্ব জড়াত্মকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয়, মধ্যমপ্রকার (Neutral), এ মত প্রচার করেছেন। এই মতই মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) নামে খ্যাত। আমরা এঁদের মতও এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism)

বহুতত্ত্ববাদীদের মতে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা এক বা দুই তত্ত্ব দিয়ে সঙ্গতভাবে করা যায় না, সঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য বহুতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করতে

হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, জড় পরমাণুবাদ, চিৎপরমাণুবাদ, প্লেটোবাদ, অনেকেশ্বরবাদ এবং জেমসের বহুত্ববাদ বহুতত্ত্ববাদের বিভিন্ন রূপ। জেমসের বহুত্ববাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বহুতত্ত্ববাদই আমরা এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা এখানে শুধু জেমসের বহুতত্ত্ববাদ নিয়েই আলোচনা করবো।

জেমসের বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism as advocated by William James)

আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রয়োগবাদ-এর প্রবক্তা ও প্রচারক। তাঁর মত মুখ্যতঃ 'Pragmatism' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থে হেগেলের পরব্রহ্মবাদ-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন: হেগেলের মতে এই বিশ্বসংসার এক পরমব্রহ্মের প্রকাশ এবং বিশ্বের বস্তুনিচয় পরস্পর একান্ত বিচ্ছিন্ন নয়, এক আঙ্গিক ঐক্যে (organic unity) আবদ্ধ।

জেম্‌স্ হেগেলের জগৎকে স্বাধীনতাহীন, বৈচিত্র্যহীন এক বদ্ধজগৎ (Block Universe) বলে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর মতে জগৎ এক অদ্বৈত পরব্রহ্মের প্রকাশ হ'লে জগতের বৈচিত্র্য ও গতিশীলতার কোন ব্যাখ্যা হয় না। জগতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বস্তু বর্তমান, এদের মধ্যে কোন আঙ্গিক ঐক্য নেই। এই বিচিত্র জগতের ব্যাখ্যা একমাত্র বহুতত্ত্ব দিয়েই করা সম্ভব, কোন একটি তত্ত্বই এই বিচিত্রের নিহিতার্থ বিধান করতে পারে না। জেম্‌স্ বৈচিত্র্যের জয়গান করেছেন, ঐক্যের তিনি ভক্ত নন।

সমালোচনা : জগতে বৈচিত্র্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বৈচিত্র্য-এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়। জগতে বিচিত্র বস্তুরাজি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাতে প্রচ্ছন্ন ঐক্য বর্তমান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আছে বলেই এ জগৎ এমন সুন্দর। নইলে জগৎ হ'ত বিশৃঙ্খল ও অসুন্দর। আমরা অভিব্যক্তি আলোচনা কালে জগতের রচনা-পারিপাট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং সিদ্ধান্ত করেছি যে, জগতে বিশৃঙ্খলা নেই, ঐক্যই আছে। সুতরাং জেমসের বৈচিত্র্যবাদ বা বহুত্ববাদ আমাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। শুধু জেম্‌স্ কেন, সমস্ত বহুত্ববাদীরাই বৈচিত্র্যবাদী। তাঁরা কেউই জগতের ঐক্যের, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্যের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পর্ক আলোচনাকালে আমরা বলেছি, অনেককে একের অধীনে আনাই ব্যাখ্যার কাজ। দার্শনিক জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক

ব্যাখ্যাদানের প্রয়াসী। তিনি জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা দেবেন তখনই যখন মাত্র একটি তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এদিক থেকে বহুতত্ত্ববাদী দার্শনিকেরা যে জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, তা মানতে হবে। তা ছাড়া লাঘব নিয়ম অনুসারে একটি তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা সম্ভব হ'লে একাধিক তত্ত্ব স্বীকার অযৌক্তিক। আমরা এই গ্রন্থেই এক চৈতন্যসত্তা দিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা যে সম্ভব, তা উল্লেখ করেছি। এই অবস্থায় বহুতত্ত্ব স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না।

বহুতত্ত্ব স্বীকারের আর একটি অসুবিধা এই যে, এই তত্ত্বগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

একেশ্বরবাদ এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধের নিশ্চয়তা স্বীকার করলে বহুতত্ত্ব-বাদ গ্রহণ করা যায় না। একেশ্বরবাদ অনুসারে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র তত্ত্ব, সুতরাং বহুতত্ত্বের প্রশ্ন নেই। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক হলে বিশ্বের ঘটনাবলীর আন্তর সম্বন্ধ এবং আন্তর ঐক্য স্বীকার করতে হয়। আমরা একথা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা এই গ্রন্থে একেশ্বরবাদ এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধের নিশ্চয়তা যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বহুতত্ত্ববাদ যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না।

দ্বৈতবাদ (Dualism)

দ্বৈতবাদে তত্ত্বের সংখ্যা দুই, বহু নয়। দ্বৈতবাদীদের মতে জড় ও চৈতন্য (Matter and Mind), এই দুইটি তত্ত্বই বিশ্বের মূল তত্ত্ব। এই দুইটি তত্ত্ব দিয়েই বিশ্বের ব্যাখ্যা-দান সম্ভব। দ্বৈতবাদীরা আরও বলেন, জড় ও চৈতন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি সত্তা, একটিকে কখনই আর একটিতে পরিণত করা যায় না।

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এবং আধুনিককালে দ্বৈতবাদ বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের মনে হয়, গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস একদিক থেকে পরমাণুবাদী বলে যেমন বহুতত্ত্ববাদী ছিলেন তেমনি আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে দ্বৈতবাদীও ছিলেন। অ্যানাক্সা-গোরাস যেমন জড়পরমাণুতে বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি আবার তাদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য Nous নামে একটি চৈতন্য সত্তাও স্বীকার করেছেন। সুতরাং অ্যানাক্সাগোরাস-এর মতে জড় ও চৈতন্য দুটি সত্তা, একথাও বলা যেতে পারে। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্যকার কপিল পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে দ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্যস্বভাব এবং

প্রকৃতি জড়, এঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এঁদের সংযোগে বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়।

মধ্যযুগে অধিকাংশ দার্শনিকই দেহ ও আত্মার পার্থক্য স্বীকার করে একপ্রকার দ্বৈতবাদই প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে দেহ জড়াত্মক এবং আত্মা একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য (Spiritual substance)।

আধুনিক কালে দার্শনিক ডেকার্টে দ্বৈতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। তাঁর মতে দেহ ও আত্মা দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। দেহ বিস্তৃতিসম্পন্ন ও অচেতন, কিন্তু আত্মা বিস্তৃতিহীন ও চেতন। অর্থাৎ দেহ ও আত্মা একান্ত বিরুদ্ধস্বভাব। কিন্তু, এরা বিরুদ্ধস্বভাব হ'লেও ডেকার্টে এদের মধ্যে একপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interactionism) স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন কিছু জানি তখন দেহ মনের ওপর ক্রিয়া করে, আর যখন কোন কাজ করি তখন মন দেহের ওপর ক্রিয়া করে। আমরা এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ মতের বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সমালোচনা—দ্বৈতবাদীরা সকলেই জড় ও চৈতন্যকে বিজাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করেন। ফলে তাঁরা কেউই এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। জড় ও চৈতন্য যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব হয়, তবে তাদের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে বিশ্বের অভিব্যক্তি হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, বিরুদ্ধস্বভাব পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন কি ভাবে হবে সে বিষয়ে কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সেজন্যই যোগদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ-বিধানের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।[১]

ডেকার্টে জড় ও চৈতন্যকে বিরুদ্ধস্বভাব বলেও তাদের মধ্যে একপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু, জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধস্বভাব হ'লে তাদের মধ্যে কি করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে, তা আমরা বুঝি না।

দ্বৈতবাদ মানলে মানুষের জ্ঞানের কোন সদ্ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জ্ঞান জ্ঞাতা বা মন-এর সঙ্গে জ্ঞেয় বা বিষয়ের সম্বন্ধ বোঝায়। মন ও বিষয় যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয় তবে তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হ'তে পারে না এবং ফলে জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যা মেলে না।

১। সাংখ্যদর্শনের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থটি পাঠ করা যেতে পারে।

দার্শনিক ডেকার্টে যে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন তার ফলে আধুনিক দর্শনে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে সেজন্যই আধুনিক দর্শনের সমস্ত অশান্তির জনক বলা হয় (He is the father of all evils in modern philosophy)। দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলে ডেকার্টে এদের সম্বন্ধ বিষয়ে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালের বহু দার্শনিক এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন। জ্ঞান জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্পর্ক রূপে স্বীকৃত। মন ও বিষয় যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব হয় তবে জ্ঞান কীভাবে সম্ভব, তা নির্ণয় করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। একদিকে দেহই একমাত্র সত্য এই মত বা জড়বাদ এবং অন্যদিকে একমাত্র আত্মার অস্তিত্ববাদ (Solipsism) ডেকার্টের দেহ ও মনের আত্যন্তিক বিরোধ থেকে অনুসৃত হয়। ডেকার্টেই দেহ ও মনের বিরুদ্ধস্বভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতিতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করেছেন। আসলে ডেকার্টের দ্বৈতবাদ কোন সমস্যার সমাধান না করে নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভব করেছে। সেজন্যই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নানা অশান্তি ও উপদ্রবের উৎস দ্বৈতবাদ পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

আমরা অনেকবার বলেছি, একটি তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিতে পারলেই চরম ও পরম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। এদিক থেকে দ্বৈতবাদ বিশ্বের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না বলেই স্বীকার করা আবশ্যক। লাঘব নিয়ম অনুসারে (According to the Law of Parsimony) দ্বৈতবাদ বহুতত্ত্ববাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু অদ্বৈতবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট।

অদ্বৈতবাদ (Monism)

অদ্বৈতবাদ অনুসারে এক অদ্বৈত তত্ত্বই জগৎ ও জীবনের মূলতত্ত্ব এবং এই তত্ত্ব দিয়েই জীবন ও ভুবনের সঙ্গত ব্যাখ্যা-দান সম্ভব। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জগতের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও গঠন-পারিপাট্য একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব দিয়েই যথার্থভাবে বোঝা যায়। লাঘব নিয়ম অনুসারে অদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য।

অদ্বৈতবাদ ত্রিবিধ—জড়বাদী, অধ্যাত্মবাদী ও মধ্যপন্থী (Neutral)। জড়বাদ অনুসারে একমাত্র জড় (Matter)—তত্ত্ব দিয়েই বিশ্বভুবনের ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এ মতবাদ এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করে খণ্ডন করেছি। এখানে এ মতের পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism)

অদ্বৈততত্ত্ব যদি জড়াত্মক (Material) না হয়, তবে তা আধ্যাত্মিক (Spiritual) হবে, সাধারণভাবে একথাই মনে হয়। কিন্তু, আধুনিক কালে রাসেল (জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে) প্রভৃতি দার্শনিকেরা তৃতীয় একপ্রকার অদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন। এই অদ্বৈতবাদ মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) নামে পরিচিত। রাসেল তাঁর 'The Anlysis of Mind' গ্রন্থে আমেরিকার বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক অধ্যাপক পেরি ও হোল্টের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন, জড়াত্মকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয় এমন কতকগুলো মধ্যমপ্রকার উপাদান (Neutral Particulars) বর্তমান। এই উপাদানই জড় ও মন-এর কারণ। রাসেল আরও বলেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান পদার্থকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনকে দেহের ব্যবহারে পর্যবসিত করে এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। মধ্যমপ্রকার উপাদান এক বিশেষ সংগঠনে জড় এবং অন্যরূপ সংগঠনে মন সৃষ্টি করে। মধ্যমপ্রকার উপাদান সাধারণ বস্তুর মত দেশে কালে থাকে না, তবে স্থিতিসম্পন্ন (Subsistent) ; অর্থাৎ মধ্যপন্থী উপাদান দেশে কালে না থাকলেও মনের ধারণা বা কল্পনার বিষয় নয়। এই মতবাদে জড় ও মনের দ্বৈতধারণা মধ্যমপ্রকার উপাদানের অদ্বৈত ধারণায় সমন্বিত হয়েছে, সুতরাং একেও একপ্রকার অদ্বৈতবাদই বলতে হয়।

সমালোচনা ঃ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেশে কালে থাকে না অথচ কাল্পনিক নয় এমন কোন স্থিতিসম্পন্ন উপাদান (Subsistent entity)-এর পরিচয় পাই না। যে কোন উপাদানই হয় জড়াত্মক, নয়ত আধ্যাত্মিক হবে, কিন্তু, জড়াত্মকও নয় আধ্যাত্মিকও নয় এমন উপাদান অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ নয়। আমরা যখন কোন প্রকল্প রচনা করি তখন তার প্রামাণ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নির্ণয় করি। মধ্যমপ্রকার উপাদান রূপ প্রকল্পের প্রামাণ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধ হয় না বলে এই প্রকল্প গ্রহণযোগ্য নয়।

অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ (Spiritual Monism)

অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ অনুসারে অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক (spiritual)। অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ দ্বিবিধ—কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং হেগেল, রয়েস্ প্রভৃতি

দার্শনিকরা প্রচার করেছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ভারতীয় দর্শনে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের প্রচারক। এই অদ্বৈতবাদ স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে শঙ্কর ও রামানুজ-মতের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। আমরা এই গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কথাই আলোচনা করবো।

কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism)

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক স্পিনোজার **মতে** যা স্বনির্ভর অর্থাৎ অন্যনির্ভর নয়, তাই দ্রব্য (Substance is that which exists in and is conceived through itself)। এই অর্থে একমাত্র ঈশ্বরই দ্রব্য। এই ঈশ্বরই বিশ্বের চরম সত্য ও সত্তা। ঈশ্বর নিগু'ণ, নিষ্কল ও অনির্দেশ্য। এই কথা সত্য হ'লে জগৎকে মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু, স্পিনোজা একথা বলেছেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি যেমন দ্রব্য বা ঈশ্বরকে স্বনির্ভর বা স্বয়ম্ভু বলছেন, তেমনি আবার তাকেই জগতের কারণ (Natura Naturans) এবং জাগতিক সমস্ত বস্তুর সমাহার (Natura Naturata) বলেও উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরই যদি জাগতিক সমস্ত বস্তুর সমাহার হন তবে জগৎ মিথ্যা হ'তে পারে না। এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-ও বলা হয়। এই মতে সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই।

সমালোচনা ঃ আমাদের মনে হয়, দ্রব্য বা ঈশ্বরকে একই সঙ্গে নিগু'ণ, নিষ্কল ও অনির্দেশ্য আবার জগতের কারণ এবং জাগতিক দ্রব্যের সমাহার বলা যায় না। দ্রব্য যদি নিগু'ণ হয় তবে তা আবার জগতের কারণ হবে কি করে? আর যা কারণ তা কি অনির্দেশ্য হ'তে পারে?

স্পিনোজার মতে দ্রব্য ও ঈশ্বর সমার্থক। ঈশ্বর স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক (Spiritual)। এই আধ্যাত্মিক দ্রব্য কি ভাবে জগতের বিভিন্ন জড় বস্তুর সমাহার হ'তে পারে, তা আমরা বুঝি না।

অনেকেই বলেন, স্পিনোজা অদ্বৈততত্ত্ব বা ঈশ্বরের আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করে বিশ্বের বৈচিত্র্য অস্বীকার করেছেন। হেগেল বিদ্রূপ করে স্পিনোজার ব্রহ্মকে 'সিংহের গহ্বর' (Lion's den) বলে উল্লেখ করেছেন। হেগেলের বক্তব্যের নিহিতার্থ এই, সিংহের গহ্বরে গেলে সমস্ত প্রাণীই যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তেমনি বিশ্ব-বৈচিত্র্য স্পিনোজার ব্রহ্মে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

জগতে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি বৈচিত্র্যও আছে। ঐক্য স্বীকার করে বৈচিত্র্য অস্বীকার করলে একদেশদর্শিতার দোষ হয়।

স্পিনোজার মতানুসারে ঈশ্বরই যদি সব হন, তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির স্বাধীনতা না থাকলে তার কাজের নৈতিক বিচার হয় না। অর্থাৎ নীতি তাৎপর্য হারায়। সেজন্যও স্পিনোজার মত গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে এই বিশ্বভুবনের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক অদ্বৈততত্ত্ব বর্তমান। এই তত্ত্ব বিশ্বের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে এবং বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই মতে জগতের ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুই-ই সত্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের অদ্বৈততত্ত্ব শুধুমাত্র ঐক্য-তত্ত্ব (কেবলাদ্বৈত) নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত, সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ ঐক্য-তত্ত্ব (বিশিষ্টাদ্বৈত)। এই বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বকে ব্রহ্ম বা Absolute নামে অভিহিত করা হয়। জড় জগৎ ও জীবাত্মা দুইই ব্রহ্মের প্রকাশ, সুতরাং দুইই সত্য। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হেগেল, রয়েস্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক।

হেগেল বলেন, ব্রহ্ম (The Absolute) জড় জগৎ ও জীবাত্মার মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি অসীম ও অনন্ত হলেও সীমার মধ্যে ধরা দেন। এই তাঁর লীলা। এই মত সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism) নামেও পরিচিত। আমরা এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে সর্বধরেশ্বরবাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ভারতীয় দর্শনে রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। তাঁর মতে চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ এই দুই অংশ বিশিষ্ট ; জগৎ অচিৎ-অংশের পরিণতি এবং জীবাত্মা চিৎ-অংশের প্রকাশ। সুতরাং জড় জগৎ ও জীবাত্মা দুইই সত্য।

সমালোচনা ঃ চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদই সাধারণতঃ সন্তোষজনক মতবাদরূপে স্বীকৃত হয়। অনেকেরই ধারণা এই মতবাদে জীব ও জগতের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবং জগতের বৈচিত্র্য এই মতবাদে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় জগৎ দুইই ব্রহ্মের প্রকাশ, একথা বলে এই মতবাদ সহজেই

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর সম্বন্ধ বা জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে। এই মতে ব্রহ্ম জীবের মধ্যেও আছে আবার বাইরেও আছে বলে জীবের পক্ষে এই ব্রহ্মলাভের ব্যাকুলতা বা ধর্ম এবং ব্রহ্মের পূর্ণতা-প্রাপ্তির চেষ্টা বা নীতি (Ethics) স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন। আমরা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা কি ভাবে এই মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তা আলোচনা করেছি। এই সব কথা বিবেচনা করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায়।[১]

আমরা পূর্বেই বলেছি, বহুতত্ত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের চেয়ে অদ্বৈতবাদ যুক্তি-যুক্ত। আবার অদ্বৈতবাদের মধ্যে জড়বাদী ও মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই বিশ্ব-সংসারের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিরাজিত এবং এই তত্ত্বই আত্যন্তিক সত্য। একথা যদি মানতে হয়, তবে অধ্যাত্মতত্ত্ব-ভিন্ন এই জড় জগৎ সত্য-ভিন্ন মিথ্যা বা মায়াই হ'তে পারে, একথাও বলতে হয়। অনেকে সাহস করে এমন কথা বলতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা একথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলতে পারেননি। ব্র্যাড্‌লি জগৎকে সত্য নয়, আভাস মাত্র (Appearance) বলেও আবার এই আভাস একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব (Reality) ব্রহ্মে এক বিশেষ প্রকারে বর্তমান, এমন অদ্ভুত কথা বলেছেন। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র শঙ্করই সাহস করে যা যুক্তিতে পাওয়া যায় তা যতই লোকের অপ্রিয় হোক বলতে পেরেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, সাধনার শেষ অবস্থায় শুধু চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক সত্তা বা ব্রহ্মই থাকে, জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সত্য ধরা পড়ে। এই দৃষ্টি-লাভ সাধনাসাপেক্ষ এবং সহজ নয়। আমাদের মতে শঙ্করের দর্শনই অদ্বৈতবাদের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে জাগতিক দৃষ্টিতে এবং লোক-ব্যবহারের দিক থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের চেয়েও গভীরতর ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত মতবাদ ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে

১। এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, যদিও সাধারণভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তবুও আমরা যদি চিন্তার জগতে আরও উচ্চগ্রামে উন্নীত হই, অনুভূতির আরও গভীরে প্রবেশ করি তবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বলে মনে হবে। যুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মানুষের মহত্তম ও গভীরতম চিন্তার প্রকাশ বলে মনে করি। তবে চিন্তার এই সুউচ্চ মিনারে সকলের পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই ব্রহ্ম সমস্ত প্রকার ভেদ-রহিত, গুণাতীত এবং অনুভূতিরূপ। এই অনুভূতি সমস্ত কিছু পরিহারের ভিত্তিতে নিষ্কম্প ও অনির্বচনীয়। এই অবস্থায় উপনীত হ'লে কোন কথা বলা যায় না।

সাধারণভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে বিচারমল্ল অসাধারণ লোক এবং মাকমার্গের একনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈত-বাদই বেশী আদরণীয়, একথা বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ করি।[১]

১। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কেন, এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'The Advaita Concept of Falsity—A critical study' গ্রন্থটির 'Necessity of Falsity' অধ্যায়টি পাঠ করা যেতে পারে।

উনবিংশ অধ্যায়

ন্যায়ভিত্তিক বা ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদ

(Logical Positivism)

ন্যায়ভিত্তিক প্রত্যক্ষবাদ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের একটি বিশিষ্ট মত। এই মতবাদে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ[১], কোঁতে এবং ম্যাকের প্রত্যক্ষবাদ[২] এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর, রাসেল, হ্বুইৎগেনস্টাইন, হোয়াইটহেড্ এবং কন্টিটেন্টে ফ্রিজ প্রভৃতি দার্শনিকদের দ্বারা অনুসৃত ন্যায়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতির[৩] এক অদ্ভুত সংযোগ ঘটেছে। এই মতাবলম্বীরা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় মিলিত হয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন। এই গোষ্ঠী ভিয়েনা গোষ্ঠী[৪] নামে খ্যাত। মরিচ শিলিক, ওটো নিউরথ এবং রুডলফ্ কারন্যাপ এই গোষ্ঠীর প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। এই আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে এবং প্র্যাগ, হ্বারস প্রভৃতি এই আন্দোলনের সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। হ্বানস রেইচেনব্যাক বার্লিনেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। অক্সফোর্ডে এ. যে. এয়ার এই আন্দোলন সমর্থন করেন। আমেরিকাতে ই. ন্যাগেল এবং সি. ডাব্লুউ মরিসের মত ব্যক্তিরাও এই মতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পরবর্তীকালে ওটো নিউরথ এবং রুডলফ্ কারন্যাপ তাঁদের কর্মস্থল কন্টিনেন্ট থেকে আমেরিকায় স্থানান্তরিত করেন। সেখানে তাঁরা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল নিয়ে সম্মিলিত বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ (International Encyclopedia of Unified Science) রচনায় অগ্রসর হন। এই বিশ্বকোষের কয়েকটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে।

ভিয়েনা গোষ্ঠীর দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন এবং (২) অধিবিদ্যা বা পরাবিজ্ঞানের অর্থহীনতা প্রমাণ।[৫] এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভাষার নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ। এই পদ্ধতিই মুখ্যতঃ এই মতকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদ এবং

১। Hume's empiricism.

২। Positivism of Comte and Mach.

৩। Logical analysis of the type initiated at Cambridge by Moore, Russell, Wittgenstein and Whitehead and on the continent by Frege and others.

৪। Viennese circle.

৫। To demonstrate the meaninglessness of metaphysics.

প্রত্যক্ষবাদ থেকে স্বতন্ত্র করেছে। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ থেকে এই মতের পার্থক্য এই যে, হিউম অভিজ্ঞতার মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করেছিলেন, আর এই নব্যপন্থীরা নৈয়ায়িক বা ন্যায়সম্মত বিশ্লেষণ করেছিলেন। এয়ার বলেন, ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীদের বিশ্লেষণ ব্যাপার যে কি, তা রাসেলের নির্দিষ্ট বর্ণনার মতবাদ (the theory of definite description) অনুধাবন করলে বোঝা যায়। আসলে বিশ্লেষণ একপ্রকার অনুবাদ। এতে বক্তব্য পরিষ্কার হয়। 'ওয়েভারলির লেখক একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী' এই বাক্যকে 'একজন ব্যক্তি এবং একজন ব্যক্তিই ওয়েভারলি লিখেছেন এবং সেই ব্যক্তি স্কটল্যাণ্ডবাসী' এই ভাবে অনুবাদ করা যায়। এই অনুবাদে বাক্যের অর্থ আমাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য এয়ার-রচিত 'Language, Truth and Logic' গ্রন্থের 'The nature of Philosophical analysis' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য। পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষবাদীরা পরাবিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন এই জন্য যে, পরাবিজ্ঞান আলোচনা করে কোন লাভ হয় না এবং পরাবিজ্ঞানে কোন সত্য প্রমাণও করা যায় না। নব্যপ্রত্যক্ষবাদীরা পরাবিজ্ঞানের বিরোধী, কারণ পরাবিজ্ঞানের ভাষার ন্যায়সম্মত বিশ্লেষণ পরাবিজ্ঞানের সমস্ত বচনই অর্থহীন প্রমাণ করে বলে তাঁরা মনে করেন। ন্যায়ভিত্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পরাবিজ্ঞানের বিরোধিতা অধিকতর বিপ্লবাত্মক। তাঁরা পরাবিজ্ঞানের সমস্যাবলীকে অর্থহীন মনে করেন বলে তাঁদের সমাধানের প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম বিবেচনা করেন।[৬]

এই ক্ষেত্রে ন্যায়ভিত্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বচনের অর্থ বলতে কি বুঝতেন তা আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁদের অর্থবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন লাড্‌উইগ হ্বিট্‌গেনস্টাইন (Ludwig Wittgenstein) তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ট্র্যাকটেটাস লজিকো ফিলোসফিকাস'-এ।[৭] তাঁর মতে ভাষা বিশ্লেষণ করলে বচন পাওয়া যায় আবার বচন বিশ্লেষণ করলে এমন মৌলিক বচন

৬। ন্যায়ভিত্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা যেতে পারে।

(১) A. J. Ayer—Language, Truth and Logic.
(২) G. Weinberg—An Examination of Logical Positivism.
(৩) J. O. Urmson—Philosophical Analysis.
(৪) F. Cappleston—Contemporary Philosophy.

৭। Tractatus Logico Philosophicus ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় রচিত হয়েছিল। জার্মান ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের মূলসহ ইংরেজী অনুবাদ Kegan Paul's International Library Series-এ পাওয়া যায়।

পাওয়া যায় যাদের আর বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রতর বচন পাওয়া সম্ভব নয়। হ্ব্‌ইৎগেনস্টাইন বলেন, প্রত্যেক মৌলিক বচন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরমাণুতুল্য বাস্তবের ছবি।[১] জগৎ এইরূপ বাস্তবের দ্বারা গঠিত এবং জগৎকে বিশ্লেষণ করলে এই সমস্ত বাস্তব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।[২] বাস্তব (fact) বলতে তিনি 'ঘটনাটি যা' (what the case is) বা যা বচনকে সত্যে পরিণত করে তাকেই বুঝেছেন। বচন যেহেতু একটি সম্বন্ধ প্রকাশ করে, সেহেতু যে বাস্তব এই সম্বন্ধকে সত্যে পরিণত করে তা নিজেও জগতে অবস্থিত একটি সম্বন্ধ। 'পুস্তকটি লাল' এই বচন সত্য হয় তখনই যখন আমরা পুস্তকটিকে লাল দেখি। অভিজ্ঞতার জগতের নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ (logical analysis) জগতের মৌলিক উপাদান যে বাস্তব (fact) তা নির্ণয় করে। এই মত হিউমের মত থেকে স্বতন্ত্র। হিউম আমাদের অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, নৈয়ায়িক বা ন্যায়সম্মত বিশ্লেষণ করেননি। তাঁর মতে অভিজ্ঞতার মৌলিক উপাদান বচন নয়, মুদ্রণ (impression) এবং মুদ্রণ অসম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (যেমন নীল রঙ) প্রকাশ করে, কিন্তু সম্বদ্ধ বাস্তব (যেমন এই বস্তুটি নীলগুণযুক্ত) প্রকাশ করে না। জগৎ অসম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলীর সমাহার, সম্বদ্ধ ও অসম্বদ্ধ বাস্তবের সমাহার নয়।

যদি একথা সত্য হয় যে, সমস্ত বচন মৌলিক সরল বচনে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই সমস্ত সরল বচন জগতের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তবের ছবি, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব যে সমস্ত সরল বচনেই উদ্দিষ্ট (referent) তা স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং যে বচন কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তব প্রকাশ করে না তা বচনই হ'তে পারে না। এই রকম বচন অর্থহীন। বচনের অর্থ এবং বচনে উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব একই কথা।[৩]

হ্ব্‌ইৎগেনস্টাইনের এই অর্থবাদ ভিয়েনা গোষ্ঠীর দার্শনিক শ্লিক একটি বাক্যে সংক্ষেপে বলেছেন, 'বচনের অর্থ এবং তার প্রামাণ্য-নির্ণয়ের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন' (The sense of a proposition is the method of its

১। 'The proposition is a picture of reality'—Tractatus, ৬৩ পৃ. (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেগান পল সংস্করণ)।

২। 'The world is the totality of facts, not of things'. 'The world divides into facts'—পূর্ববৎ ৩১ পৃঃ।

৩। 'This proposition has such and such a sense'='This proposition represents such and such a state of affairs.'—পূর্ববৎ, ৬৯ পৃঃ।

verification)। যে পদ্ধতিতে আমরা বচনের প্রামাণ্য নির্ণয় করি, সেই পদ্ধতিতেই বচনের অর্থ নির্ণয় করা যায়। 'এই গোলাপটি লাল' এই বচনের প্রামাণ্য 'এই গোলাপের লাল রঙের প্রত্যক্ষ' নির্ণয় করে, আবার এই প্রত্যক্ষই বচনটির সার্থকতা প্রকাশ করে।

অর্থের এই প্রামাণ্যবাদের সাহায্যে[১] ভিয়েনা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষবাদীরা অধিবিদ্যার অর্থহীনতা (Meaninglessness of metaphysics) প্রদর্শন এবং বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বচনের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। পরবর্তী-কালে অবশ্য হ্বিট্‌গেনস্টাইন অর্থ সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। আমরা তা পরে আলোচনা করবো।

অধিবিদ্যা অপনয়ন (Elimination of Metaphysics)

অধিবিদ্যা বলতে প্রত্যক্ষবাদীরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত সত্তাবাদ বোঝেন। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষের অতীত সত্তা সম্ভব, অধিবিদ্যায় ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে স্বীকৃত।[২] কিন্তু, প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, সমস্ত অর্থপূর্ণ বচনই সরল মৌলিক বচনে[৩] বিশ্লেষণ করা যায় এবং এই সমস্ত বচনই ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য। কিন্তু, অধিবিদ্যায় যে সমস্ত তথাকথিত বচন পাওয়া যায়, এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের কতকগুলি তথাকথিত বচন ও ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য নয়। সুতরাং এরা অর্থপূর্ণও নয়। এই সমস্ত তথাকথিত বচন আসলে বচনই নয়, এইগুলি নিরর্থক বাক্য মাত্র।

অর্থহীন বাক্যের উদ্ভব মুখ্যতঃ দ্বিবিধ কারণে হয়। (১) বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থহীন হলে সামগ্রিক ভাবে বাক্যটি অর্থহীন হয় এবং (২) বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি অর্থপূর্ণ হলেও যে আনুপূর্বীতে তারা বাক্যে ব্যবহৃত তাতে সামগ্রিকভাবে তারা কোন অর্থ প্রকাশ করে না।[৪] অধিবিদ্যায় এই সমস্ত কারণে ও অর্থহীন বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১। With the help of this Verificational theory of meaning.

২। 'The fundamental postulate of metaphysics is that there is a super—(or hinter) phenomenal reality'.—Ayer : Demonstration of the impossibility of metaphysics, Mind, July, 1934.

৩। 'Protocol statements'—Carnap : The Unity of Science, ৪৫ পৃঃ।

৪। Carnap রচিত Philosophy and Logical syntax (1935) এবং Logical syntax of language (1937) গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য।

কারন্যাপ প্রভৃতি ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীদের মতে বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত বিবৃতি দেন ("the statements asserted by scientists") তাদের বিশ্লেষণই দর্শনের মুখ্য কাজ।[১] কারন্যাপ বিজ্ঞানের এই ভাষা বিশ্লেষণের নাম দিয়েছেন 'বিজ্ঞানের ন্যায়' (Logic of Science)। এর আবার দুই শাখা—লজিকেল সিনট্যাক্স (Logical syntax) এবং সিমেনটিক্স (Semantics)। প্রথমটি বিজ্ঞানের ভাষার আকার (form) নিয়ে আলোচনা করে, দ্বিতীয়টি ভাষার সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

শ্লিক 'বচনের অর্থ এবং তার প্রামাণ্য নির্ণয়ের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন' (the sense of a proposition is the method of its verification) এই বিবৃতির মাধ্যমে **অর্থের লক্ষণ** (definition) দিয়েছেন। এই বিবৃতির সাহায্যে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা অর্থের প্রকৃতি প্রকাশ করেন। কিন্তু, কোন বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ের জন্য তাঁরা যে পরীক্ষা (test or criterion) সুপারিশ করেছেন তাকে ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রামাণ্য নির্ণয়ের পদ্ধতি (Verification principle) বলা হয়।

এয়ার 'ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রুথ অ্যাণ্ড লজিক' গ্রন্থে (১৯-২০ পৃঃ) প্রামাণ্য পরীক্ষা (Criterion of Verifiability) সম্বন্ধে বলেছেন, একটি বাক্য একজন ব্যক্তির কাছে বস্তুতঃ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে যদি এবং একমাত্র যদি সে এই বাক্যে যে বচন প্রকাশ করতে চায় তার প্রামাণ্য সে নির্ণয় করতে জানে—অর্থাৎ, যদি সে জানে কোন্ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে এই বচন সত্য বলে গ্রহণ বা মিথ্যা বলে বর্জন করা যায় ('A sentence is factually significant to any given person, if, and only if, he knows how to verify the proposition which it purports to express—that is, if he knows what observations would lead him, under certain conditions to accept the proposition as being true, or reject it as being false.')

এয়ার প্রামাণ্যপরীক্ষা সম্পর্কিত এই বিবৃতিতে বাক্য (sentence), বচন (proposition) ও বস্তুতঃ তাৎপর্যপূর্ণ (factually significant), বলতে কি বুঝেছেন, তা আলোচনা করা দরকার। যা সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে

১। Carnap: Logical foundation of the Unity of Science in Int. Ency. of unified science, Vol I.

তা বচন, যে ভাষার মাধ্যমে যা সত্য বা মিথ্যা প্রকাশিত হয় তা বাক্য। তবে বাক্যে একমাত্র যা সত্য বা মিথ্যা তা-ই প্রকাশিত হয়, একথা ঠিক নয়। প্রশ্ন, অনুরোধ এবং আদেশ ও বাক্য প্রকাশ করে। এয়ারের মত ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষ-বাদীরা বলেন, একটি বাক্য তখনই কোন বচন প্রকাশ করে যখন সেই প্রস্তাবিত বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

প্রামাণ্য আবার দ্বিবিধ—বাস্তব এবং নীতিগত[১]। যে সমস্ত বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবেই প্রমাণ করতে পারি তাদের প্রামাণ্য বাস্তব। কিন্তু, এমন কিছু বচন আছে যাদের প্রামাণ্য নির্ণয় করা বর্তমানে কোন কারণে সম্ভব নয়, তবে তা একান্তই অসম্ভব, এমনও বলা যায় না, তাদের প্রামাণ্য নীতিগত। এয়ার বলেন, চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে পর্বত আছে, এই বচনের প্রামাণ্য আমরা বর্তমানে নির্ণয় করতে পারি না, কারণ এমন কোন রকেট আবিষ্কৃত হয়নি যার সাহায্যে আমরা চন্দ্রে গিয়ে তার অপর পৃষ্ঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। তবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে, এমন রকেট আবিষ্কৃত হতে পারে এবং তখন আমরা এই বচনের প্রামাণ্য নির্ণয় করতে পারবো। এই জাতীয় বচনের নীতিগত প্রামাণ্য স্বীকৃত। কোন বাক্য যদি এই দ্বিবিধ প্রামাণ্যের কোন একটি প্রামাণ্যবিশিষ্ট বচন প্রকাশ করে তবে তাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়।

এয়ার প্রামাণ্যের আরও ভাগ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, প্রামাণ্য সবল বা দুর্বল হ'তে পারে।[২] একটি বচনের প্রামাণ্য সবল হয় তখনই যখন বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বচনের প্রামাণ্য তখনই দুর্বল যখন অভিজ্ঞতায় বচনের সম্ভাব্যতা মাত্র স্থাপিত হয়। এয়ারের মতে পুনরুক্তিমূলক বচন যা হিউমের দর্শনে ধারণার সম্বন্ধাত্মক নামে পরিচিত তা ছাড়া কোন বচনই সম্ভাব্য ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না। এদের প্রামাণ্য একমাত্র দুর্বলই হ'তে পারে। এয়ারের মতে পুনরুক্তি-

১। 'Practical verifiability and verifiability in principle'—এয়ার, Language, Truth and Logic, ২০-২১ পৃঃ।

২। "A further distinction which we must make is the distinction between the 'strong' and the 'weak' sense of the term 'verifiable'. A proposition is said to be verified, in the strong sense of the term, if, and only if, its truth could be conclusively established in experience. But it is verifiable, in the weak sense, if it is possible for experince to render it probable." এয়ার, তদেব, ২২-২৩ পৃঃ।

মূলক বচন ছাড়া অন্য বচন প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণও করা যায় না, আবার অপ্রমাণও করা যায় না।[১]

এয়ার একটি বচনকে বস্তুতঃ তাৎপর্যপূর্ণ (factually sigificant) তখনই বলেন যখন তা কোন আবেগ প্রকাশ করে না আবার পুনরুক্তিমূলকও নয় এবং প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে তার সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব বা তার ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত টানা যায় যা প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণযোগ্য।

এই আলোচনার ভিত্তিতে এয়ার বলেন, অধিবিদ্যায় যে সমস্ত বাক্য ব্যবহৃত হয় তা যে সমস্ত বচন প্রকাশ করে বলে মনে করা হয় তা পুনরুক্তি-মূলক বা ধারণার সম্বন্ধাত্মক নয়, আবার তা প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্যও নয়, সুতরাং এদের অর্থহীন বলা ছাড়া উপায় নেই।[২] হিউম বহুপূর্বেই এমন ধরনের কথা বলেছিলেন।[৩]

এয়ার আরও বলেন, অধিবিদ্যার অধিকাংশই ভুলে ভরা, তবে তাতে এমন কিছু অংশও আছে যাতে সত্যিকারের মিষ্টিক অনুভূতি প্রকাশিত। এই সমস্ত অংশের নৈতিক বা নান্দনিক[৪] মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু অর্থ নেই।[৫]

হ্বুইৎগেনস্টাইন 'Philosophical Investigations' গ্রন্থে (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) 'ট্র্যাক্টেটাস' গ্রন্থে প্রচারিত মত পরিত্যাগ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি 'ট্র্যাক্টেটাস' গ্রন্থে প্রচারিত ছবি-মতবাদ (Picture theory) বর্জন করে ভাষা 'ব্যবহার বা কর্ম-পদ্ধতি'[৬], 'দাবার ঘুটির মত শব্দ নিয়ে একপ্রকার খেলা'[৭]—এই মত প্রচার করেছেন। ভাষার অসংখ্য ব্যবহার।

১। এয়ারের মত 'Language, Truth and Logic' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। অর্থবাদ (Theory of meaning) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা G. H. R. Parkinson সম্পাদিত 'The theory of Meaning' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। 'We may accordingly define a metaphysical sentence as a sentence which purports to express genuine proposition, but does, in fact, express neither a tautology nor an empirical hypothesis. And as tautologies and empirical hypotheses form the entire class of significant propositions, we are justified in concluding that all metaphysical assertions are non-sensical.' তদেব, ৩১-৩২ পৃ:।

৩। British Empirical Philosophers, এয়ার এবং উইঞ্চ সম্পাদিত, ৫১৫ পৃ:।

৪। Aesthetic

৫। এয়ার : Language, Truth and Logic, ৩৮-৩৯ পৃ:।

৬। Philosophical Investigations, ৬, ২৩ পৃ: (A way of performance and behaviour.)

৭। তদেব, ৬৫ পৃ: (A kind of game with words as tools like the pieces of chess).

বাস্তবের বিবরণ দেওয়াই শুধু ভাষার কাজ নয়। প্রশ্ন, ধন্যবাদ, অভিশাপ, অভিনন্দন, প্রার্থনা, আদেশ, পরিহাস প্রভৃতির জন্যও ভাষার ব্যবহার হয়।

হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, সাধারণতঃ আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যে অর্থে শব্দ এবং যে প্রসঙ্গে যে শব্দ ব্যবহার করি তা-ই শব্দের যথার্থ ব্যবহার। অধিবিদ্যায় শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তা তার স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। শব্দ প্রচলিত অর্থে এবং সাধারণতঃ যে প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় সে-ই প্রসঙ্গে ব্যবহার না করার জন্যই অধিবিদ্যায় সমস্যাবলীর সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করতে হবে এবং তখন দেখা যাবে যে, অধিবিদ্যার সমস্যা আসলে কোন সমস্যাই নয়।[১] দর্শনের কাজ হবে, ভাষার অযথার্থ ব্যবহারের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দূর করা, কোন মতবাদ প্রচার করা নয়। ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যাবর্তনই অলস মননজাত দার্শনিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়।

সমালোচনা ঃ হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাক্‌টেটাস' গ্রন্থে প্রত্যেক সরল বচন বাস্তবের ছবি প্রকাশ করে বলে যে মত প্রচার করেছেন তা গ্রহণ করলে প্রত্যেক বচনই সত্য হবে, মিথ্যা বচন বলে কিছু থাকবে না। কারণ প্রত্যেক বচন যদি বাস্তবের ছবি হয় তবে যা বাস্তবের ছবি নয় তা বচন নয়, আবার বাস্তবের ছবি না হলেই বচন মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু, তা একান্ত অসম্ভব বলে বচন মিথ্যা হ'তে পারে না। অথচ আমরা জানি, মিথ্যা বচনও সম্ভব। আরও কথা, এই মত গ্রহণ করলে আমরা যাকে মিথ্যা বচন বলি তাকে আর অর্থপূর্ণ বচন বলা যাবে না। অথচ আমরা সাধারণতঃ মনে করি, কোন বচন মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তাতেই সে বচনের অর্থ নেই, একথা বলা যাবে না। মিথ্যা বচনও অর্থপূর্ণ বচন হ'তে পারে।

শিলিক বচনের অর্থ প্রামাণ্য-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—বচনের যদি অর্থ আমি পূর্বে না বুঝি তা হ'লে বচনের প্রামাণ্য আমি নির্ণয় করতে পারবো কি? আমাদের মনে হয়, বচনের অর্থ প্রামাণ্য নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করে না, বচনের প্রামাণ্যই বচনের অর্থ জানার পর নির্ণয় করা যায়। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার (Putting the cart before the horse) মধ্যে যে ত্রুটি শিলিকের মতেও সে ত্রুটি বর্তমান।

১। তদেব, ১১৬পৃঃ

এয়ার বলেছেন, কোন বাক্য যে বচন প্রকাশ করে বলে মনে করা হয় যদি তা পুনরুক্তিমূলক না হয় তবে তা ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রমাণ-যোগ্য হ'লেই অর্থপূর্ণ হয়। বচন পুনরুক্তিমূলক না হলেই তা ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষে প্রমাণযোগ্য হবে, আর তা না হলে তা বচনই হবে না, একথা বিতর্ক-সাপেক্ষ। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য বচন কেন অর্থপূর্ণ হবে না, তা বোঝা যায় না। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে যা জানা যায় তা কি প্রামাণ্য নয়? এয়ার অবশ্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। কিন্তু, আমাদের কথা এই যে, বিভিন্ন দেশে বহু মিষ্টিক এই জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং তাঁদের দাবী অন্যেরা চেষ্টা করলে এই জ্ঞান লাভ করতে পারে। চেষ্টা না করেই তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত কি?

এয়ার শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষে প্রমাণযোগ্য বলতে ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষে সম্ভাব্য বলে জানা বুঝেছেন। সম্ভাবনার ওপর যদি নির্ভর করা যায় তবে যা কিছু স্ববিরোধমুক্ত (free from self-contradiction) তা-ই সম্ভাব্য বলে তা-ই নির্ভরযোগ্য এবং অর্থপূর্ণ বলতে আপত্তি কি?

হ্বিটগেনস্টাইন 'ফিলসফিকেল ইনভেস্টিগেশনস্' গ্রন্থে ব্যবহারের ভিত্তিতে শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের কথা বলেছেন। তিনি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার স্বীকার করেন, অথচ সাধারণভাবে জীবনে যে শব্দ যে অর্থে ও যে প্রসঙ্গে ব্যবহার হয় তার থেকে ভিন্ন কোন অর্থে ও প্রসঙ্গে ব্যবহার সঙ্গত বলে মনে করেন না। কিন্তু, তা কেন হবে? তাঁর যুক্তি অনুসরণ করে যদি বলা যায় সাধারণতঃ আমরা জীবনে যে অর্থে ও যে প্রসঙ্গে শব্দ ব্যবহার করি তার থেকে ভিন্ন অর্থে ও ভিন্ন প্রসঙ্গেও তার ব্যবহার হতে পারে এবং তা-ও শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং অধিবিদ্যায় শব্দের সে রকম ব্যবহার হয়, তবে দোষ কি?

আমরা যখন কোন্ কিছুর লক্ষণ দিই, তখন অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি এবং অসম্ভাবনা দোষ পরিহার করতে চেষ্টা করি। ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা 'অর্থ' শব্দের এমন লক্ষণ দিয়েছেন যাতে অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, কান্তিবিদ্যা প্রভৃতিতে এই লক্ষণ সমন্বিত হয় না। তাঁদের লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

হ্বিটগেনস্টাইন (আগে ও পরে), শিলিক, এয়ার প্রভৃতি 'অর্থ' শব্দটি বিশেষ এক প্রণালীতে ব্যাখ্যা করে অধিবিদ্যা অর্থহীন, প্রমাণ করেছেন। আমরা এইমাত্র আলোচনা করে জানলাম যে, অর্থ সম্বন্ধে এঁদের মত গ্রহণ-

যোগ্য নয়। সুতরাং এই অর্থবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত সিদ্ধান্ত 'অধিবিদ্যা অর্থহীন'ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মূল্য সম্বন্ধে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীদের আবেগবাদ (The Emotive theory of value advocated by the logical positivists)

সাধারণতঃ মূল্যবিষয়ক বিবৃতি (Statements of value) এবং তথ্য-বিষয়ক বিবৃতির (Statements of fact) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আমরা মান বা মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বে একথা বলেছি। ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[১] প্রত্যক্ষবাদী এয়ার বলেছেন, মূল্যবিষয়ক বচনের মধ্যে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ ততটা সাধারণ বিজ্ঞানের বিবৃতির মত, আর যতটা সাধারণ বিজ্ঞানের বিবৃতির মত নয় ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়, আবেগের প্রকাশমাত্র এবং সত্য বা মিথ্যা কিছুই নয়[২]। একথা বলে প্রথমতঃ তিনি নৈতিক বিবৃতির বিশ্লেষণ করেছেন।

নীতিবিজ্ঞানে যে সমস্ত বচন পাওয়া যায় তাদের চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ নীতিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ-বচন বা লক্ষণ-বচনের বিচারাত্মক বচন। দ্বিতীয়তঃ নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং তার কারণের বর্ণনাত্মক বচন। তৃতীয়তঃ নৈতিক কর্মে প্রণোদনাত্মক বচন এবং চতুর্থতঃ বাস্তবিক নৈতিক বচন। সাধারণতঃ দার্শনিকেরা এদের পার্থক্য লক্ষ্য করেন না।

এয়ার বলেন, নীতিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ-বচন বা লক্ষণ-বচনের বিচারাত্মক বচনই নীতি-দর্শন গঠন করে। নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং তার কারণের বর্ণনাত্মক বচন মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত হওয়া উচিত। ধর্মে প্রণোদনাত্মক বচন আসলে বচনই নয়, আদেশ বা আকস্মিক আহ্বান, যাতে পাঠক কর্মে প্রবৃত্ত হয়।[১] এরা দর্শন বা বিজ্ঞান কোন কিছুরই অন্তর্গত নয়। বাস্তবিক নৈতিক বচন লক্ষণ নয়, লক্ষণের ওপর মন্তব্য নয়, উদ্ধৃতিও নয়, এরা নীতি-দর্শনের অন্তর্গতই নয়। এয়ার আরও

১। এই আলোচনা এয়ার-রচিত 'Language, Truth and Logic' গ্রন্থের 'Critique of Ethics and Theology' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

২। 'We shall set ourselves to show that in so far as statements of value are significant, they are ordinary "scintific" statements; and that in so far as they are not scientific, they are not in the literal sense significant but are simply expressions of emotion which can be neither true nor false.'
—Ayer : Language, Truth and Logic, ১৪৯-১৫০ পৃঃ।

বলেন, এটা ভালো বা এটা ভালো নয়, এই জাতীয় নৈতিক বচন নীতি সম্বন্ধে কোন দার্শনিক আলোচনার অঙ্গীভূত হওয়াই উচিত নয়।

এই আলোচনার ভিত্তিতে এয়ার বলেন, নীতি-দর্শনের আলোচ্য কল্যাণ (Good), নীতিসম্মত (right) প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ এবং তাদের বিচার। তিনি আরও বলেন, এই সমস্ত শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের কোন পরীক্ষা নেই।[১] এয়ারের মতে এই সমস্ত শব্দ যে প্রত্যয় প্রকাশ করে তা যথার্থতঃ প্রত্যয়ই নয়। কোন বচনে নৈতিক প্রতীকের উপস্থিতি তথ্যের দিক থেকে কোন নূতন সংযোজন নয়। যদি বলা যায়, 'ঐ টাকা চুরি করে তুমি অন্যায় করেছ' তবে 'ঐ টাকা তুমি চুরি করেছ' একথার বেশী কিছু বলা হয়নি। এই কাজ অন্যায় একথা বলে কেউ এই কাজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কোন বিবৃতি দিচ্ছে না; কাজটি সম্বন্ধে নৈতিক অসমর্থন প্রকাশ করছে মাত্র। যদি ভীতি-উৎপাদক কণ্ঠস্বর করে উচ্চারণ করা হয় বা আবেগ-প্রকাশক কোন চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় তা হলে যা হয় এও তা-ই। এতে একমাত্র একথাই বোঝায় যে, বক্তার কিছু আবেগ এই বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত। এখানে এমন কিছু বলা হয়নি যা সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। 'টাকা চুরি করা অন্যায়' এ-বিষয়ে কেউ যদি ভিন্নমত প্রকাশ করে তবে টাকা চুরি করা সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আবেগ বর্তমান, একমাত্র একথাই বোঝা যাবে।

এয়ার আরও বলেন, নীতিবিজ্ঞানের মত কান্তিবিদ্যাতেও (Aesthetics) পারিভাষিক শব্দ যেমন 'সুন্দর' 'কুৎসিৎ' প্রভৃতি কোন তথ্য প্রকাশ করে না, বক্তার আবেগ এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মাত্র।[২]

মন্তব্য ঃ এয়ার তথা নীতিসম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা ধরে নিয়েছেন যে তথ্যবিষয়ক বিবৃতিই একমাত্র বিবৃতি, মূল্যবিষয়ক বিবৃতি তথ্যবিষয়ক বিবৃতি নয় বলে কোন বিবৃতিই নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল্যবিষয়ক বচন যে তথ্যবিষয়ক বচন নয়, তা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু, তথ্যবিষয়ক বিবৃতিই একমাত্র বিবৃতি, তা প্রমাণসাপেক্ষ। ন্যায়সম্মত

১। 'The fundamental ethical concepts are unanalysable, in as much as there is no criterion by which one can test the validity of the judgments in which they occur—তদবৎ, ১৫৮ পৃঃ।

২। 'Such aesthetic words as 'beautiful' and 'hideous' are employed, as ethical words are employed, not to make statements of fact, but simply to express certain feelings and evoke a certain response'.—তদবৎ, ১৭০ পৃঃ।

প্রত্যক্ষবাদীরা বিবৃতি কথাটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই অর্থে গ্রহণ করলে একমাত্র বিজ্ঞানের বিবৃতি বিবৃতিপদবাচ্য। কিন্তু, বিবৃতির এই লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। এই লক্ষণ নীতিবিজ্ঞান এবং কান্তিবিদ্যার বিবৃতিতে সমন্বিত হয় না বলে গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

সুন্দর, কুৎসিৎ, শুভ, অন্যায় প্রভৃতি শব্দ যে সমস্ত বচনে থাকে তাতে এই সমস্ত শব্দ আবেগ ছাড়া কিছুই প্রকাশ করে না, একথা ঠিক নয়। সুন্দর, কুৎসিৎ, শুভ, অন্যায় প্রভৃতি শব্দের লক্ষণ আমরা নির্ণয় করতে চেষ্টা করি। এইজন্য নীতিবিজ্ঞান এবং কান্তিবিদ্যার মত শাস্ত্র রয়েছে। এই বিষয়ে চর্চা সম্ভব। এসব যদি একান্তই ব্যক্তিগত আবেগের ব্যাপার হ'ত তবে তা সম্ভব হ'ত না।

তথ্যবিষয়ক বিবৃতির মতই মূল্যবিষয়ক বিবৃতিও সর্বজনের স্বীকৃতি দাবী করে। কোন ব্যক্তিগত আবেগই সর্বজনের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে না। এই দিক থেকেও মূল্যবিষয়ক বিবৃতিকে ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ মাত্র বলা যায় না।

ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা আরও বলেন, ধর্মদর্শনে (Theology) ব্যবহৃত বাক্য অধিবিদ্যায় ব্যবহৃত বাক্যের মতই ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষে প্রমাণযোগ্য কোন বচন প্রকাশ করে না বলে অর্থহীন।[২] বাহ্যপ্রত্যক্ষে প্রাপ্ত গুণাবলীর অতিরিক্ত দ্রব্য, আন্তরপ্রত্যক্ষে প্রাপ্ত মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত আত্মা এবং অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর কিছুই হিউমের মতই ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষবাদ এবং বুদ্ধিবাদ[৩], বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ভাববাদ, অদ্বৈতবাদ এবং বহুতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে দর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে যে বিবাদ লক্ষ্য করা যায় তা অবান্তর ও অর্থহীন।[৪]

আমরা অতি সংক্ষেপে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষবাদীদের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত উপস্থিত করলাম। এই বিষয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

১। Copleston রচিত Contemporary Philosophy দ্রষ্টব্য।

২। 'By the same criterion, no sentence which purports to describe the nature of a transcendent god can possess any literal significance'.

—এয়ার: Language, Truth of Logic, ১৭৪ পৃঃ।

৩। Empericism & Rationalism.

৪। তদবৎ, 'Solutions of the outstanding disputes' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

বিংশ অধ্যায়

অস্তিত্ববাদ (Existentialism)

উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য

আধুনিক কালে দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অস্তিত্ববাদ মার্ক্সবাদের মতই খুব জনপ্রিয় হয়েছে। ফরাসী লেখক যীন পল সার্ত্রে (Jean Paul Sartre, জন্ম ১৯০৫ খ্রীঃ) তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস এবং নাটকে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। অস্তিত্ববাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর অবদানই বোধহয় সব চেয়ে বেশী। তিনি মুখ্যতঃ জার্মান দার্শনিক মার্টিন হেইডিগারের (Martin Heidegger, জন্ম ১৮৮৯ খ্রীঃ) চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জার্মান ফিনোমেনোলজিস্ট হুসার্ল ছিলেন হেইডিগারের গুরু। হেইডিগার আবার দিনেমার দার্শনিক কির্কেগড়ের (Danish philosopher Kierkegaard, ১৮১৩-১৮৫৫) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। নীট্‌শের স্বাধীন মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতার ধারণাও অস্তিত্ববাদীদের প্রভাবিত করেছিল। ম্যারি ওয়ারনক বলেছেন, অস্তিত্ববাদ তার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে হুসার্লের ফিনোমেনোলজি থেকে আর স্বাধীনতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং নিঃসঙ্গতার ধারণা পেয়েছে কির্কেগড় এবং নীট্‌শের চিন্তা থেকে।[১] অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে হেইডিগার এবং সার্ত্রে নিরীশ্বরবাদী, আর জার্মান দার্শনিক কার্ল যেসপার্স (Karl Jaspers, জন্ম ১৮৮৩ খ্রীঃ) এবং ফরাসী দার্শনিক গ্যাবরিয়েল মার্সেল (Gabriel Marcel, জন্ম ১৮৮৯ খ্রীঃ) ঈশ্বর-বিশ্বাসী। যেসপার্স এবং মার্সেলকে ফিনোমেনোলজির প্রভাবের বাইরের অস্তিত্ববাদী (Non-phenomenological existentialist) বলা হয়। এঁদের ওপর হুসার্ল ও তাঁর ফিনোমেনোলজির প্রভাব বিশেষ নেই। মরিস মর্লি পন্টিও (Maurice Merleau Ponty) একজন অস্তিত্ববাদী। তিনি সার্ত্রের বন্ধু এবং হুসার্লের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

এঁরা ছাড়াও আরও অনেক অস্তিত্ববাদী আছেন। এঁরা সকলে মিলে একটি সুসম্বদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন, এমন বলা যায় না। এঁরা সকলেই

১। Mary Warnock : Existentialism, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি নির্দিষ্ট মত গ্রহণ ও প্রচার করেন, এমনও নয়। আসলে এঁদের মধ্যে যে মিল তা দৃষ্টিভঙ্গীর। এঁরা সকলেই অমূর্ত মননের (abstract thinking) বিরোধী। ব্যক্তির অস্তিত্বের অর্থ ও সমস্যাবলী তাঁদের সকলেরই আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছে। মূর্ত অস্তিত্ব[১] (concrete existence), মূর্ত জীবন (concrete life), পূর্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতিতে এঁরা সকলেই আকৃষ্ট। কতকগুলি প্রচলিত দার্শনিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ধ্যানধারণার তাঁরা তীব্র বিরোধী। এই বিরোধিতাতেই তাঁদের মিল বেশী। এই কথা মনে রেখে তাঁদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে হবে।[২]

(১) সমস্ত অস্তিত্ববাদীরাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেন। অমূর্ত চিন্তা তাঁদের নিয়ামক নয়। এজন্যই অস্তিত্ববাদে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(২) সমস্ত অস্তিত্ববাদে মুখ্য আলোচ্য ব্যক্তির অস্তিত্ব। বুদ্ধি দিয়ে এর বিশ্লেষণ করা যায় না। অস্তিত্ব মৌলিক ও মূর্ত। জাগতিক ব্যক্তি স্বীয় অভিজ্ঞতায় এর প্রকৃতি জানে। অস্তিত্ব ব্যক্তির কোন বিশেষণ বা ধর্ম নয়, ব্যক্তিই অস্তিত্ব। ব্যক্তি তা আন্তরজীবনে উপলব্ধি করে, কিন্তু কোন প্রত্যয় দিয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারে না। এটা কোন তত্ত্ব নয়। অস্তিত্ব বলতে কোন পরিনিষ্ঠিত বস্তু বোঝায় না, স্বাধীন নির্বাচনাত্মক ক্রিয়ার মাধ্যমে (In the act of free choice) তা গড়ে ওঠে। এই অস্তিত্ব যেমন একদিকে ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত, তেমনি তা অন্যদিকে জগতের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তির সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি (situation) থাকে বা বিশেষ পরিস্থিতিই ব্যক্তি। অর্থাৎ, বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ব্যক্তি থাকে না। ব্যক্তি বা অস্তিত্ব কালানুগত, কালোত্তীর্ণ বা কালের সঙ্গে অসংযুক্ত নয়।

(৩) অস্তিত্ববাদীদের মতে অস্তিত্ব স্বরূপের পূর্ববর্তী (Existence precedes essence—Sartre)। এই মত প্লেটোর মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিশেষ। প্লেটো স্বরূপ বা ধারণা বা জাতি অবিনশ্বর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই জাতিই সত্য। ব্যক্তি জাতির অনুকরণমাত্র। জাতি না থাকলে ব্যক্তি থাকতে পারে না, যেমন আসল না থাকলে নকল থাকতে

১। Existenz or Existence

২। H. J. Blackham: Six existentialist thinkers গ্রন্থটি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর পাঠ করা উচিত।

পারে না।[১] মনুষ্য জাতি না থাকলে ব্যক্তি মানুষ থাকতে পারে না। মনুষ্য জাতি আছে বলেই ব্যক্তি মানুষ সম্ভব। জাতি দ্বারাই ব্যক্তির তাৎপর্য বোঝা যায়। মানুষের স্বরূপের ধারণা না থাকলে কোন ব্যক্তিকেই মানুষ বলা যায় না। মনুষ্যজাতির ধারণা থাকলেই ব্যক্তিকে মানুষ বলে জানা যায়। সুতরাং জাতি বা স্বরূপ পূর্বে এবং ব্যক্তি বা অস্তিত্ব পরে। বুদ্ধির বিচারে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত।

অস্তিত্ববাদীরা একথা মানেন না। তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন, ব্যক্তি বা অস্তিত্বই প্রথম। আমি আমার অস্তিত্বই গভীর ও নিবিড়ভাবে আন্তর অভিজ্ঞতায় প্রথম পাই। জাতির ধারণা আমরা পরে অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে গড়ে তুলতে পারি। অস্তিত্বই জাতি বা অমূর্ত স্বরূপের পূর্ববর্তী। অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী বলে এই অভিজ্ঞতায় লব্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন, এর অতিরিক্ত স্বরূপ অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না বলে তার পূর্বগামিতা বা প্রাধান্য কোনটাই মানেন না। অস্তিত্বের পূর্বগামিতা ব্যক্তিগত আন্তর অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত। এই বিষয়ে কোন তর্ক বা বিচার অবান্তর।

(৪) বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তি, জগতে অবস্থিত মূর্ত ব্যক্তি, ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রভৃতির ওপর গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ববাদীরা ত্রাস[২] বা ব্যক্তিগত নির্বাচন (choice) এবং দায়িত্ব (responsibility) এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ[৩], ভয় প্রভৃতি ব্যক্তিগত আবেগের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। ব্যক্তির

১। An individual or a particular can not exist without the universal as a copy cannot exist without the original.

২। জার্মান ভাষায় Angst বলেছেন হেইডিগার, ইংরেজীতে Dread শব্দের দ্বারা তা অনূদিত। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা বোধই ত্রাসের কারণ। কোন বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ কারণে ভয়ের (fear) সৃষ্টি হয়।

৩। সার্ত্রে একে বলেছেন Anguish। ব্যক্তি যখন তাঁর নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন সে দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে নিঃসঙ্গ এই চেতনা তার মনে উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগের সৃষ্টি করে। সার্ত্রে বিতৃষ্ণা (nausea) নামে আর একটি আবেগ স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ, আবেগ বা কর্মের মধ্যে আমাদের সঙ্গে জগতের যে সম্বন্ধ হয় তা সব সময়ই আমাদের দেহ-চেতনার মাধ্যমে হয়। সার্ত্রের মতে এই দেহ-চেতনা ছাড়া মানুষের কোন কিছুরই চেতনা সম্ভব নয় এবং এই চেতনার আসল ধর্ম হচ্ছে বিতৃষ্ণা। যতকাল আমরা বাঁচি ততকাল আমাদের বিতৃষ্ণা থাকে। তবে অন্য আবেগ বা কর্মে নিযুক্ত থাকলে অনেক সময় আমরা তা লক্ষ্য করি না। অস্তিত্বই বিতৃষ্ণা জাগায়, এমন কথাও সার্ত্রে বলেছেন। মানুষের বিশেষ জন্ম-তারিখ, বিশেষ পিতামাতা, বিশেষ চেহারা কেন হ'ল তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যুক্তিহীনতার চেতনা সব কিছু অসার (feeling of absurdity) এই আবেগ সৃষ্টি করে।

জীবনে আবেগ (emotion) এবং স্বাধীন নির্বাচনের (free choice or will) গুরুত্ব অস্তিত্ববাদীদের মতে বুদ্ধি বা বিচারের চেয়ে অনেক বেশী। অস্তিত্ববাদীরা নৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-জীবনের স্বাধীনতার অপরিসীম মূল্য স্বীকার করেন। তাঁরা সমস্ত রকম প্রথা বা প্রভুত্ব-বিরোধী। কির্কেগড় চার্চের শাসন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বাহ্যিক আচরণ আন্তর ধর্ম জীবনের পবিত্রতার বিরোধী মনে করে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। হেইডিগার, মার্সেল এবং সার্ত্রে দুই মহাযুদ্ধেই অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। যুদ্ধ প্রভুত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভূত হয় বলে এঁরা প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

(৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে[১] অস্তিত্ববাদীরা বুদ্ধিবাদ, মননবাদ এবং বিষয়প্রাধান্যবাদ বিরোধী।[২] তর্ক, বিচার প্রভৃতির ওপর তাঁদের আস্থা নেই। তাঁদের আস্থা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অস্তিত্বের এমন একটা স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায় যা তর্ক বা বিচার ধরতে পারে না বলে তাঁদের বিশ্বাস।

(৬) অস্তিত্ববাদীরা আধিবিদ্যক চিন্তার বিরোধী। অমূর্ত প্রত্যয় বা প্রতীকের মাধ্যমে আত্যন্তিক সত্তার প্রকৃতি-নির্ণয়ের মননাত্মক প্রয়াসে তাঁদের কোন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই। মিস্টিকদের মত তাঁরা জানার চেয়ে হওয়ার ওপর, জীবনের ওপর, চর্যার ওপর বেশী গুরুত্ব দেন। এই দিক থেকে অস্তিত্ববাদ একটি জীবন-দর্শন।

বিভিন্ন অস্তিত্ববাদীর কথা আলাদাভাবে আলোচনা করতে পারলে অস্তিত্ববাদীদের বক্তব্য স্পষ্ট করে বোঝা যায়। কিন্তু, তাতে এই গ্রন্থের কলেবর এত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাবে যে তা করা সম্ভব নয়।[৩] আমরা অস্তিত্ববাদীদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। তাঁদের সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলে এই অধ্যায়ের উপসংহার করবো।

১। In epistemology

২। Existentialists are anti-rationalism, anti-intellectualism and anti-objectivism.

৩। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা অস্তিত্ববাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য Mary Warnock রচিত Existentialism ; Blackham রচিত Six existentialist thinkers, S. P. Peterfreund and T. C. Denise রচিত Contemporary Philosophy and its origins প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে পারে।

কান্ট ঈশ্বরের ধারণার ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের (Ontological proof for the existence of God) বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদান প্রসঙ্গে আসল অস্তিত্ব (real existence) এবং অস্তিত্বের ধারণার (idea of existence) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অস্তিত্ববাদীরা কান্টের 'আসল অস্তিত্ব'-এর ওপর গুরুত্ব দেন। অস্তিত্ব তাঁদের মতেও ধারণা নয়, প্রত্যয় নয়, মূর্ত ও আসল। কান্ট 'ক্রিটিক অব প্র্যাকটিকেল রিজন'-এ আমাদের নৈতিক জীবনের ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলেছেন, ঔপপত্তিক বিচার ছাড়াও অন্য বিচারের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেছেন, তার প্রতিফলন অস্তিত্ববাদে হয়েছে বলে মনে হয়। তবে কান্টের মতের সঙ্গে অস্তিত্ববাদী চিন্তার পার্থক্যও রয়েছে। কান্ট সার্বজনীন সঙ্কল্পের (Universal will) কথা বলেছেন, অস্তিত্ববাদীদের পক্ষে ব্যক্তিগত সঙ্কল্পই (Personal will) মুখ্য আলোচ্য। অবশ্য সার্ত্রে যা একজন ব্যক্তির পক্ষে ভালো (good) তা সকলের পক্ষেই ভালো, এমন কথা বলেছেন। কিন্তু কোন অস্তিত্ববাদী যুক্তিসঙ্গতভাবে একথা বলতে পারে কি ? হেগেল বুদ্ধির ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন, সত্তার প্রকৃতি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তা অস্তিত্ববাদীরা সমর্থন করেন না। কির্কেগড় কোন রকম প্রত্যয়ভিত্তিক জ্ঞান (Conceptual Knowledge) সত্য-নির্ণয়ের সহায়ক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ীতার (Subjectivity) ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। সক্রেটিসও বিষয়ীতার জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন। কির্কেগড়ের ওপর সক্রেটিসের প্রভাব সুধীসম্মত।

প্রকৃত অস্তিত্ব ও অপ্রকৃত অস্তিত্ব

অস্তিত্ববাদীরা প্রকৃত অস্তিত্ব (Authentic existence) এবং অপ্রকৃত অস্তিত্বের (Inauthentic existence) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হেইডিগার প্রথম এই পার্থক্য আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে তার একটা বিশেষ অস্তিত্ব আছে, সে অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তার নিজেরই এবং অন্য কারও নয়, তার কতকগুলো নিজস্ব সম্ভাবনা আছে, এই ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তখন তার অস্তিত্বকে প্রকৃত অস্তিত্ব বলা হয়। আর মানুষ যখন সামাজিক ব্যক্তিরূপে অন্য দশজন মানুষের মত সমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার গ্রহণ করে, সকলের জন্য লিখিত সংবাদপত্র

পাঠ করে, যে কোন লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত পূর্ব থেকে প্রস্তুত পোশাক ব্যবহার করে, সর্বসাধারণের চলাচলের যানবাহনে চলে, পার্কে যায় তখন তার অস্তিত্ব অপ্রকৃত। প্রকৃত অস্তিত্বের উপলব্ধি হলেই উদ্বেগ (Anxiety) নামক আবেগের আবির্ভাব হয়। নিঃসঙ্গতা, নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-সচেতনতাই এই আবেগের কারণ।

অহং-অযুক্ত চৈতন্যের ধারণা (Non-egological theory of consciousness)[১]

দেকার্তে অহং বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে চৈতন্য থাকতে পারে না, এই মত প্রচার করেছিলেন। কান্ট জ্ঞাতারূপ অহং ('I' as subject)-এর কথা বলেছেন। হুসার্ল চৈতন্য-অতিক্রান্ত অহং (Transcendental 'I') মেনেছেন।[২] অস্তিত্ববাদী সার্ত্রে অহং-অযুক্ত চৈতন্যের কথা বলেছেন। সার্ত্রের মতে চৈতন্য কোন দ্রব্য নয়।[৩] চৈতন্য সব সময়ই কোন না কোন বিষয়ের চৈতন্য। এর অস্তিত্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকাশিত বা এই প্রকাশের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। এই চৈতন্য মূর্ত। তিনি চৈতন্য-অতিক্রান্ত কোন অহং স্বীকারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। চৈতন্য একপ্রকার ব্যাপার বা ক্রিয়া। বিষয়ের দিকে তার গতি। এই চৈতন্য অহং-অযুক্ত (Non-egological)। অহং চৈতন্যের বিষয় হতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে নেই, চৈতন্যের অধিকারীরূপেও নেই।

শূন্যতা (Nothingness)

অস্তিত্ববাদী হেইডিগার এবং সার্ত্রে 'শূন্যতা' নামক প্রত্যয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। একজন মানুষের সঙ্গে জগতের যে ব্যবধান বা পার্থক্য (gap or separation), অর্থাৎ মানুষের চৈতন্য এবং বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা হেইডিগারের মতে এক অর্থে শূন্যতা, বলেছেন হ্বারণক।[৪]

১। J. P. Sartre: The transcendence of the Ego: An Existentialist theory of Consciousness.

২। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা সার্ত্রের The Transcendence of the Ego গ্রন্থটি পাঠ করলে উপকৃত হবে। এখানে কোন বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

৩। 'Consciousness has nothing substantial about it, it is a pure appearance in the sense that it only exists in so far as it becomes apparent.' —Being and Nothingness.

৪। Mary Warnock: Existentialism, ৯৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় অর্থে 'শূন্যতা' সমস্ত বস্তুর ধ্বংসশীলতা, বিশেষ করে, মৃত্যুতে ব্যক্তির অস্তিত্বের নিশ্চিত বিনাশ বোঝায়। এই অর্থে শূন্যতার সচেতনতার মাধ্যমেই হেইডিগারের মতে মানুষ অপ্রকৃত অস্তিত্ব থেকে প্রকৃত অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হয়। মানুষ যখন তার অনিবার্য মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন তার মৃত্যু যে একান্তভাবেই তারই মৃত্যু এবং এই ব্যাপারে সে যে নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই চেতনা জাগে। এই চেতনাই প্রকৃত অস্তিত্বের চেতনা।

সাত্রে শূন্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'নিজের জন্য অস্তিত্ব' (Being-for-itself) এবং 'নিজেরাই অস্তিত্ব' (Beings-in-themselves) এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সাত্রে'র মতে সচেতন ব্যক্তি নিজের জন্য অস্তিত্ব এবং অচেতন বস্তু নিজেরাই অস্তিত্ব। এদের মধ্যে যে পার্থক্য বা ব্যবধান তা শূন্যতা। সচেতন ব্যক্তির নিজের মধ্যেও শূন্যতা বর্তমান। বিভিন্ন কর্ম, চিন্তা এবং প্রত্যক্ষের দ্বারা এই শূন্যতা সে পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। ব্যক্তির যে সম্ভাবনা সে স্বাধীনভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করে তা-ই তার নিজের মধ্যে শূন্যতা।

মানুষ যখন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে তখন এই পার্থক্য ও শূন্যতা। এইভাবে সাত্রে শূন্যতার তিনরকম অর্থ করেছেন।

অস্তিত্ববাদ কি নৈরাশ্যবাদী ?

(Is Existentialism pessimistic ?)

অস্তিত্ববাদে নিঃসঙ্গতা, উদ্বেগ, ত্রাস, শূন্যতা প্রভৃতির গুরুত্ব স্বীকৃত বলে অনেকে অস্তিত্ববাদ নৈরাশ্যবাদী, নেতিবাচক বা দুঃখবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। অস্তিত্ববাদী সাত্রে এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।[১] তিনি বলেন, অস্তিত্ববাদ নৈরাশ্যবাদী ত নয়ই বরং আশাবাদী। ব্যক্তির নির্বাচনের স্বাধীনতা (freedom of choice) স্বীকার করে অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিকে কর্মে উৎসাহ দেয়। ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি করে, তার অস্তিত্ব তারই সৃষ্টি, অস্তিত্ববাদীদের এসব কথা মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। অস্তিত্ববাদ সাত্রে'র মতে একপ্রকার মানবতা-

১। সাত্রে'র লেখা **'Existentialism is a Humanism'** প্রবন্ধে (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) এই জবাব পাওয়া যাবে।

বাদ, কারণ, এই মতে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের প্রাধান্য ও মূল্য স্বীকৃত; প্রকৃত অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তির আন্তর অস্তিত্বই বোঝায়।[১]

মন্তব্য ঃ আমরা অতি সংক্ষেপে অস্তিত্ববাদের মূল কথা বলেছি। এই মতবাদ সম্বন্ধে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ব্যক্তি মানুষ, মানুষের ভাগ্য, ব্যক্তির জীবন ও তার মূল আবেগ এই মতবাদে প্রাধান্য পেয়েছে। যন্ত্রযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ যখন বহির্মুখী, বুদ্ধিসর্বস্ব, যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে তখন অস্তিত্ববাদ এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। ব্যক্তির আন্তর জীবন, অন্তর্মুখী প্রবণতা, বুদ্ধির চেয়েও আবেগ ও সঙ্কল্প যে মানুষের জীবনে অনেক মূল্যবান, তত্ত্বের চেয়ে জীবনই যে প্রধান, এসব কথা বলে অস্তিত্ববাদ নিঃসন্দেহে লক্ষণীয় কাজ করেছে। অমূর্ত প্রত্যয়ের চেয়ে মূর্ত অস্তিত্ব তাদের বেশী আকর্ষণ করে এবং তা নিয়েই তাদের আলোচনা। তবে এই অস্তিত্ব ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় যেভাবে লব্ধ এবং এর প্রকৃতি যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে আধিবিদ্যক (metaphysical) এবং বিচারভিত্তিক (logical) আলোচনার বিশেষ স্থান নেই। সেজন্যই অনেকে এই মতবাদকে কোন তাত্ত্বিক দর্শন বা থিওরিটিকেল ফিলসফি বলতে প্রস্তুত নন। তবে একে জীবন-দর্শন বলতে বাধা কি ?

বার্ট্রাণ্ড রাসেল[২] বলেছেন, অস্তিত্ববাদ কোন দার্শনিক সমালোচনা নয়, মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণে আবেগমূলক প্রতিবাদ মাত্র। অস্তিত্ববাদীরা যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বক্তব্য প্রকাশ করেন বলে রাসেলের এই মন্তব্য। তবে যন্ত্রযুগে আমাদের যে জীবন-যন্ত্রণা ও সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার থেকে পরিত্রাণের একটা পথনির্দেশের চেষ্টা রয়েছে অস্তিত্ববাদে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহে যেমন আতিশয্য দেখা যায় তেমনি আতিশয্য হয়ত অস্তিত্ববাদেও আছে।

হেইডিগার এবং সার্ত্রে অস্তিত্বের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে যে ফিনোমে-

---

১। সার্ত্রে শেষ জীবনে মার্কসবাদের ভক্ত হয়েছেন। তাঁর মানবতাবাদ মার্কসবাদে পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য তাতে অস্তিত্ববাদ থাকছে কি-না, সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। সার্ত্রের 'The Critique of Dialectical Reason' গ্রন্থে মার্কসবাদ-সমর্থন স্পষ্ট। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের এই বইটি পড়া উচিত।

২। Bertrand Russell: The Wisdom of the West (Existentialism অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'It does not make a philosophic criticism, so much as an emotional protest on psychological grounds' বলেছেন রাসেল।

নোলজিকেল পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার দার্শনিক মূল্য স্বীকার না করে উপায় নেই।[১] তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর বেশী গুরুত্ব দেবার ফলে অস্তিত্ববাদ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের কথা (Autobiography) হয়ে উঠেছে, এমন অভিযোগ করা যায়। কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনের কথায় সাধারণতঃ অন্যের উৎসাহ থাকে না বলে এই বিষয়ে কোন আলোচনা হতে পারে না। হেইডিগার ও সাত্রে' 'শূন্যতা' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা ভাল বোঝা যায় না। এজন্য অনেকে তাঁদের মতের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতা এবং অর্থহীনতার অভিযোগ এনেছেন।

অস্তিত্ববাদীদের দাবী এই যে তাঁরা অস্তিত্বকে কোন প্রত্যয় হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু, হেইডিগার ও সাত্রে'র আলোচনা এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে বলে মনে হয়। হেইডিগার বলেছেন, জাগতিক ব্যক্তির স্বরূপ তার অস্তিত্বের মধ্যেই বর্তমান (the essence of Dasein lies in existence)। এখানে ত অস্তিত্বকেই স্বরূপ বলা হয়েছে। এই 'অস্তিত্ব' প্রত্যয় ছাড়া আবার কি?[২] তা ছাড়া সাত্রে' ব্যক্তির অস্তিত্বের যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাতে 'অস্তিত্ব'কে একটি প্রত্যয় বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আন্তর জীবন প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দিলে সামাজিক ও নৈতিক জীবন এবং মানবতাবাদ হ'তে পারি কি?—অস্তিত্ব পূর্বে কি স্বরূপ পূর্বে বা ব্যক্তি পূর্বে, না জাতি পূর্বে, এই প্রসঙ্গে একদিকে অস্তিত্ববাদী এবং অন্যদিকে প্লেটো প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীদের যে মতভেদ তা দূর করার জন্য বলা যায় যে, অস্তিত্বের দিক দিয়ে (ratio essendi) অস্তিত্ব বা ব্যক্তিই জাতির পূর্বে, অর্থাৎ, ব্যক্তিই যথার্থতঃ থাকে, ব্যক্তির মাধ্যমেই আমরা জাতির অস্তিত্ব পেতে পারি ; কিন্তু, জ্ঞানের দিক দিয়ে (ratio cogniscendi) জাতি বা স্বরূপের ধারণার মাধ্যমেই ব্যক্তি বা অস্তিত্বের ধারণা বা জ্ঞান লাভ সম্ভব। যার কোন জাতির ধারণা নেই সে সেই জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকেই জাতির নামে অভিহিত করতে পারে না। অস্তিত্ববাদীরা অস্তিত্বের দিক দিয়ে প্রসঙ্গটির আলোচনা করেছেন, আর প্লেটো প্রভৃতিরা আলোচনা করেছেন জ্ঞানের দিক দিয়ে।

১। Bochenski লিখিত Contemporary European Philosophy গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে পাঠ করা উচিত।

২। একথা বললে 'অস্তিত্ব স্বরূপের পূর্বগামী' একথা বলা যায় কি? এখানে ত অস্তিত্বকেই স্বরূপ বলা হয়েছে।

প্রমাণপঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

Sinclair—An Introduction to Metaphysics.
Lewis—Introduction to Philosophy.
Holt and others—New Realism.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Mure—An Introduction to Hegel.
Ewing—The Fundamental Questions of Philosophy.
Ayer—Logical Positivism.
Patrick—Introduction to Philosophy.
Dr. K. D. Bhattacharyya—Alternative Standpoints in Philosophy.
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics.

দ্বিতীয় অধ্যায়

Descartes—Discourse on Method (Translation by John Veitch)
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Mure—An Introduction to Hegel.
Bergson—An Introduction to Metaphysics.
Cunningham—Problems of Philosophy.
S. C. Chatterjee—Problems of Philosophy.

তৃতীয় অধ্যায়

Creighton and Smart—An Introductory Logic.
Bosanquet—Essentials of Logic.
Stebbing—A Modern Introduction to Logic.
Keynes—Formal Logic.
Cunningham—Problems of Philosophy.
J. O. Urmson—Philosophical Analysis.

চতুর্থ অধ্যায়

Paulsen—Introduction to Philosophy.
Walsh—Reason and Experience.

Cunningham—Problems of Philosophy.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Wright—History of Modern Philosophy.
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
Mure—An Introduction to Hegel.
Hospers—An Introduction to Philosophical Analysis.

পঞ্চম অধ্যায়

Hocking—Types of Philosophy.
S. C. Chatterjee—Problems of Philosophy.
Holt and others—New Realism.
Drake and others—Critical Realism.
Morris—Locke, Berkeley, Hume.
ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী—লক, বার্কলি, হিউম
Latta—Monadology.
D. M. Dutta—The Chief Currents of Contemporary Philosophy.
Passmore—A Hundred years of Philosophy.
Mure—An Introduction to Hegel.
Alexander—Space, Time and Deity, Vol. I.

ষষ্ঠ অধ্যায়

Eddington—The Nature of the Physical World.
Russell—An Outline of Philosophy.
Eddington—Space, Time and Gravitation.
Schlik—Space and Time.
Vasiliev—Space, Time, Motion.
Taylor—Elements of Metaphysics.
Bradley—Appearance and Reality.
Alexander—Space, Time and Deity.
Latta—Monadology.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Patrick—Introduction to Philosophy.
C. E. M. Joad—Guide to Philosophy.

সপ্তম অধ্যায়

Bradley—Appearance and Reality.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.

Russell—Our Knowledge of the External World.
Russell—Problems of Philosophy.
Mure—An Introduction to Hegel.
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
Wright—History of Modern Philosophy.
Whitehead—Process and Reality.
Alexander—Space, Time and Deity.

অষ্টম অধ্যায়

Joachim—The Nature of Truth.
Laird—Knowledge, Belief and Opinion.
Rogers—What is Truth?
Russell—Problems of Philosophy.
D. M. Datta—The Chief Currents of Contemporary Philosophy.
Russell—An Enquiry into Meaning and truth.
Eric Temple Bell—The Search for Truth.
William James—Pragmatism.
Schiller—Studies in Humanism.
Dewey—Essays in Experimental Logic.
S. C. Chatterjee—Problems of Philosophy.
A. C. Das—Negative Fact, Negation and Truth.
A. C. Ewing—The Fundamental Questions of Philosophy.

নবম অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Russell—The Analysis of Matter.
Eddington—The Nature of the Physical World.
James Jeans—The New Background of Science.
Lange—History of Materialism.
Haldane—Materialism.
Hocking—Types of Philosophy.
James Ward—Naturalism and Agnosticism, Vol. I.

দশম অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Hoernle—Matter, Life, Mind and God.

Symposium on Mechanism & Vitalism in The Philosophical Review, Vol. XXVII., pp. 571 ff.
Loeb—The Organism as a whole.
Loeb—The Mechanistic Conception of Life.

একাদশ অধ্যায়

Darwin—The Descent of Man.
Newman—Evolution Yesterday and Today.
Lloyd Morgan—Emergent Evolution.
Bergson—Creative Evolution.
Boodin—Cosmic Evolution.
Alexander—Space, Time and Deity, Vol. I & II.
Sellars—Evolutionary Naturalism.
Mure—An Introduction to Hegel.
Hoernle—Matter, Life, Mind and God.
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics.

দ্বাদশ অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Morris—Six Theories of Mind.
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
John Laird—The Nature of Self.
Watson—Psychology from the standpoint of a Behaviorist.
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

Paulsen—Introduction to Philosophy.
McDougall—Body and Mind.
J. B. Pratt—Matter and Spirit.
Cunningham—Problems of Philosophy.
Descartes—Meditations.
Latta—Monadology-
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics
A. C. Ewing—The Fundamental Questions of Philosophy.

চতুর্দশ অধ্যায়

G. Galloway—The Fundamental Questions of Philosophy.
James—Human Immortality.
Myers—Human Personality and its Survival of Bodily Death.
Barrett—Psychical Research.
Royce—The Conception of Immortality.
স্বামী অভেদানন্দ—মরণের পরে।
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—বাৎস্যায়ন ভাষ্য।
নীরদবরণ চক্রবর্তী—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

পঞ্চদশ অধ্যায়

A. C. Ewing—The Fundamental Questions of Philosophy.
G. C. Bussey—Typical Recent Conceptions of Freedom.
David Hume—Essay on Liberty and Necessity.
C. D. Broad—Determinism, Indeterminism and Libertarianism.
Bergson—Time and Free Will.
Paulsen—A system of Ethics.
J. Seth—A Study of Ethical Principles.
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics.

ষোড়শ অধ্যায়

Royce—The Conception of God.
Waterhouse—Religion.
Wright - A Student's Philosophy of Religion.
James—Varieties of Religious Experience.
Bosanquet—What religion is.
Hume—Dialogues concerning Natural Religion.
D. Miall Edwards—Philosophy of Religion.
Schurman—Belief in God.
Dr. A. K. Raychoudhury—Doctrine of Maya.
,, —Self and Falsity in Advaita Vedanta.
Caird—An Introduction to the Philosophy of Religion
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
G. Galloway—The Philosophy of Religion.
A. C. Ewing—The Fundamental Questions of Philosophy.

সপ্তদশ অধ্যায়

J. Laird—The Idea of Value.
Clarke—A Study in the Logic of Value.
Perry—General Theory of Value.
Santayana—The Sense of Beauty.
C. E. M. Goad—Guide to Philosophy (The Meaning of Beauty)
Croce—Aesthetics, Part I.
Taylor—Elements of Metaphysics.
J. Seth—A Study of Ethical Principles.
Plato—The Republic, Book III.
Royce—The Conception of God.
Bradley—Appearance and Reality.
Dr. A. K. Ray Choudhury—Doctrine of Maya.
G. E. Moore—Principia Ethica.
S. Alexander—Space, Time and Value Vol II.

অষ্টাদশ অধ্যায়

পঞ্চানন শাস্ত্রী—ভাষা পরিচ্ছেদ
কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা
Descartes—Discourse on Method (Translated by John Veitch).
Descartes—Meditations.
Hocking—Types of Philosophy.
William James—Pragmatism.
Stace—An Outline of Greek Philosophy.
Latta—Monadology.
Russell—The Analysis of Matter.
Haldane—Materialism.
Wright—History of Modern Philosophy.
Falckenberg—History of Modern Philosophy.
A. E. Taylor—Elements of Metaphysics.
Mure—An Introduction to Hegel.
Bradley—Appearnce and Reality.
K. C. Bhattacharyya—Studies in Vedantism.

D. M. Datta—The Chief Currents of Contemporary Philosophy.

N. B. Chakraborty—The Concept of Falsity—A critical Study.

নীরদবরণ চক্রবর্তী—ভারতীয় দর্শন

ঊনবিংশ অধ্যায়

A. J. Ayer—Language, Truth and Logic

G. Weinberg—An Examination of Logical Positivism

J. O. Urmson—Philosophical Analysis

F. Copleston—Contemporary Philosophy

Wittgenstein—Tractatus Logico Philosophicus, Kegan Paul ed.

G. H.R. Parkinson—The theory of Meaning

বিংশ অধ্যায়

Mary Warnock—Existentialism

H. J. Blackham—Six existentialist thinkers

J. P. Sartre—The transcendence of the Ego : An existentialist theory of Conscionsness

Bochenki—Contemporary European Philosophy

S. P. Peterfreund and T. C. Denise—Contemporary Philosophy and its origins.

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন			
৩	১	করা যায় না	স্থলে	করা যায়
৩২	পাদটীকা ১০	অবরোহানুমান	স্থলে	আরোহানুমান
৪৮	পাদটীকা ৩	ষ্টেরিং	স্থলে	ষ্টেবিং
৬৩	৯	মূল বিষয়ক	স্থলে	মূল্য বিষয়ক
৯৩	পাদটীকা ১	Bradly	স্থলে	Bradley
১০৬	৮	গৌণ	পরে	গুণ পড়তে হবে
১১৮	২৮	নাম	স্থলে	না
১৪৭	১	নে	স্থলে	মনে
২১২	দশম অধ্যায়	ও	স্থলে	বা
২২৯	পাদটীকা	Evolutinists	স্থলে	Evolutionists
২৮২	৬	of	স্থলে	or
৩০৫	১	ঈশ্বরের	পূর্বে	কাণ্ট বসবে
৩০৫	১৪	শ্বিবাস	স্থলে	বিশ্বাস
৩২২	৬	গোপাল	স্থলে	গোলাপ
৩৩৭	১৬	সভ্য	স্থলে	সত্য
৩৩৮	৫	মাকমার্গ	স্থলে	জ্ঞানমার্গ
৩৫১	৩	যীন	স্থলে	জঁা

"All philosophy is systematic symbolism and symbolism necessarily admits of alternatives."

—K. C. Bhattacharyya

"Philosophy is to be studied, not for the sake of any definite answers to its questions, since no definite answers can, as a rule, be known to be true, but rather for the sake of the questions themselves; because these questions enlarge our conception of what is possible, enrich our intellectual imagination, and diminish the dogmatic assurance which closes the mind against speculation; but above all because, through the greatness of the Universe which Philosophy contemplates, the mind also is rendered great, and becomes capable of that union with the Universe which constitutes its highest good."

—Bertrand Russell